সন্দেশের সূচী

১৩২৪

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

পঞ্চম বর্ষ বৈশাখ, ১৩২৪ প্রথম সংখ্যা

গ্রীষ্মের গান*

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত)

বড় গরম! ভারি গরম! ঠাণ্ডা সর্‌বত আনো!
হাত পা কেমন্ কর্‌ছে ছন্‌ছন! জোরে পাখা টানো!

খালে বিলে নাইরে জল্ সব্ শুকিয়ে গেল!
তাতে মাটি ফাটে কাঠ, গ্রীষ্ম ঐরে এল!
নৌকা নাহি চলে আর্ হায়রে টানাটানি।
মাঝি মাল্লা বলে 'আল্লা! গাঙ্গে নাইক পানি'।

বুনো হাঁস বলে 'মোর্ মাথা গেল তেতে।
এই বেলা সেই ঠাণ্ডা দেশে পলাই উত্তরেতে।'
মহিষ্ গরু যত ছিল, গেল রোগা হয়ে,—
দেশে নাহি মিলে ঘাস্, বাঁচে কিবা খেয়ে।

ঠাণ্ডা মাটি আগুন্ হল, তেতে গেল হাওয়া;
ঘরে বসে রাখি প্রাণ, রৈ'ল পথে যাওয়া।
হাঁ করিয়া থাকে শালিক্ বসে মনোদুঃখে—
শুকায়েছে গলা তার্ কথা নাহি মুখে!

---

* ইহার স্বরলিপি এ সংখ্যার শেষে দেওয়া হইল।

গ্রীষ্মে লোকে বলে "ভাই, তুমি কেন এলে"?
গ্রীষ্ম বলে "এনু তাই আম্ খেতে পেলে!
দুটো মাস্ থাক ভাই গরমেরে সয়ে;—
ফল শস্য পাকে যদি, খাবে খুসী হয়ে।"

এক বছরের রাজা

এক ছিলেন সওদাগর—তাঁর একটী সামান্য ক্রীতদাস তাঁর একমাত্র ছেলেকে জল থেকে বাঁচায়। সওদাগর খুসী হ'য়ে তাকে মুক্তি ত দিলেনই, তা ছাড়া জাহাজ বোঝাই ক'রে নানা রকম বাণিজ্যের জিনিষ তাকে বখসিস্ দিয়ে বললেন "সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে যাও—এই সব জিনিষ বেচে যা টাকা পাবে, সবই তোমার।" ক্রীতদাস মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে চড়ে রওনা হলেন বাণিজ্য করতে।

কিন্তু বাণিজ্য আর করা হ'ল না। সমুদ্রের মাঝখানে তুফান উঠে জাহাজটিকে ভেঙ্গে চূরে লোকজন জিনিষপত্র কোথায় যে সব ভাসিয়ে নিল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ক্রীতদাসটি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেয়ে একটা দ্বীপের চড়ায় এসে ঠেকল। সেখানে ডাঙায় উঠে সে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই, তার সঙ্গের লোকজন কেউ নাই। তখন সে হতাশ হ'য়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসে পড়ল। তারপর যখন সন্ধ্যা হ'য়ে এল, তখন সে উঠে দ্বীপের ভিতর দিকে যেতে লাগল। সেখানে বড় বড় গাছের বন—তার পর প্রকাণ্ড মাঠ, আর তারই ঠিক মাঝখানে চমৎকার সহর। সহরের ফটক দিয়ে মশাল হাতে মেলাই লোক বার হচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই সেই লোকেরা চীৎকার করে বল্ল "মহারাজের শুভাগমন হোক। মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন।" তারপর সবাই তাকে খাতির ক'রে জমকালো গাড়ীতে চড়িয়ে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানের চাকরগুলো তাড়াতাড়ি রাজপোষাক এনে তাকে সাজিয়ে দিল।

সবাই বল্‌ছে 'মহারাজ মহারাজ', হুকুমমাত্র সবাই চট্‌পট্ কাজ করছে, এসব দেখে শুনে সে বেচারা একেবারে অবাক। সে ভাবলো সবই বুঝি স্বপ্ন—বুঝি তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারলো

সে জেগেই আছে আর দিব্যি জ্ঞানও রয়েছে, আর যা যা' ঘট্‌ছে সব সত্যিই। তখন সে লোকদের বল্ল "এ কিরকম হচ্ছে বল ত ? আমি ত এর কিছুই বুঝছি না। তোমরা কেনই বা আমায় 'মহারাজ' বল্‌ছ আর কেনই বা এমন সম্মান দেখাচ্ছ ?"

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ো উঠে বল্‌ল "মহারাজ আমরা কেউ মানুষ নই —আমরা সকলেই প্রেতগন্ধর্ব্ব—যদিও আমাদের চেহারা ঠিক মানুষেরই মত। অনেক দিন আগে আমরা 'মানুষ রাজা' পাবার জন্য সবাই মিলে প্রার্থনা করেছিলাম ; কারণ, মানুষের মত বুদ্ধিমান আর কে আছে ? সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের মানুষ রাজার অভাব হয়নি। প্রতি বৎসরে একটী করে মানুষ এইখানে আসে, আর আমরা তাকে এক বৎসরের জন্য রাজা করি। তার রাজত্ব শুধু ঐ এক বৎসরের জন্যই। বৎসর শেষ হলেই তাকে সব ছাড়তে হয়। তাকে জাহাজে করে সেই মরুভূমির দেশে রেখে আসা হয়, যেখানে সামান্য ফল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না—আর সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বালি না খুঁড়লে এক ঘটি জলও মেলে না। তারপর আবার নূতন রাজা আসে—এই রকমে বৎসরের পর বৎসর আমাদের চ'লে আস্‌ছে।"

তখন দাসরাজা বললেন "আচ্ছা বলত—এর আগে তোমাদের রাজারা কি রকম স্বভাবের লোক ছিলেন?" বুড়ো বল্‌ল "তারা সবাই ছিলেন অসাবধান আর খামখেয়ালি। সারাটি বছর সবাই শুধু জাঁকজমকে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাতেন—বছর শেষে কি হবে সে কথা কেউ ভাবতেন না।"

নতুন রাজা মন দিয়ে সব শুনলেন, বছরের শেষে তাঁর কি হবে এই কথা ভেবে কদিন তাঁর ঘুম হ'ল না!

তারপর সে দেশের সকলের চেয়ে জ্ঞানী আর পণ্ডিত যারা, তাদের ডেকে আনা হল, আর রাজা তাদের কাছে মিনতি করে বললেন "আপনারা আমাকে উপদেশ দিন—যাতে বছরশেষে সেই সর্ব্বনেশে দিনের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।"

তখন সবচেয়ে প্রবীণ বৃদ্ধ যে, সে বল্ল "মহারাজ শূন্য হাতে আপনি এসেছিলেন শূন্য হাতেই আবার সেই দেশে যেতে হবে—কিন্তু এই এক বছর আপনি আমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই করাতে পারেন। আমি বলি—এই বেলা রাজ্যের ওস্তাদ লোকদের সেই দেশে পাঠিয়ে সেখানে বাড়ী ক'রে বাগান ক'রে চাষবাসের ব্যবস্থা ক'রে চারিদিক সুন্দর করে রাখুন। ততদিনে ফলে ফুলে দেশ ভ'রে উঠবে, সেখানে লোকের যাতায়াত হবে। আপনার এখানকার রাজত্ব শেষ হতেই সেখানে আপনি সুখে রাজত্ব করবেন। বৎসর ত দেখতে দেখতে চলে যাবে, অথচ কাজ আপনার ঢের; কাজেই বলি, এই বেলা খেটে খুটে সব ঠিক ক'রে নিন।" রাজা তখনই হুকুম দিয়ে লোকলস্কর জিনিষপত্র গাছের চারা ফলের বীজ আর বড় বড় কলকব্জা পাঠিয়ে আগে থেকে সেই মরুভূমিকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন।

তারপর বছর যখন ফুরিয়ে এল, তখন প্রজারা তাঁর ছত্র মুকুট রাজদণ্ড সব ফিরিয়ে নিল, তাঁর রাজার পোষাক ছাড়িয়ে এক বছর আগেকার সেই সামান্য কাপড় পরিয়ে, তাঁকে জাহাজে তুলে সেই মরুভূমির দেশে রেখে এল। কিন্তু সে দেশ আর এখন মরুভূমি নাই—চারিদিকে ঘর বাড়ী, পথ ঘাট পুকুর বাগান। সে দেশ এখন লোকে লোকারণ্য। তারা সবাই এসে ফূর্ত্তি ক'রে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এক-বছরের রাজা সেখানে জন্ম ভ'রে রাজত্ব করতে লাগলেন।

অবীক্ষিত

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পুরাকালে সূর্য্যবংশে মহা পরাক্রমশালী এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম করন্ধম। রাজা করন্ধমের পুত্রের নাম ছিল অবীক্ষিত। তাঁহার মত সুন্দর, বুদ্ধিমান তেজস্বী এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ সে সময়ে অন্য কোন রাজপুত্র ছিল না।

বৈদিশ নগরের রাজা বিশাল তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবর সভা করিলেন। স্বয়ংবরে দেশ বিদেশের সমস্ত রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল—রাজকুমার অবীক্ষিতেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সভায় আসিয়া রাজকুমারী বৈশালিনী তাঁহার ইচ্ছামত একজনকে বরণ করিবেন—ইহারই নাম স্বয়ংবর। সেকালে ক্ষত্রিয় কন্যাদের স্বয়ংবর ছাড়া অন্য রকমেও বিবাহ হইত। সকলের সমক্ষে সভা হইতে কন্যাকে লইয়া পলাইতে পারিলে সেটা আরও বাহাদুরীর কাজ ছিল। যথাসময়ে রাজকুমারী সভায় আসিলে, অবীক্ষিত জোর করিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। আর বলিলেন—"আমি কন্যাকে লইযা যাইতেছি, যাহার ক্ষমতা থাকে বাধা দাও।" তখন সভাশুদ্ধ রাজারা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবর সভায় মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

রাজকুমার অবীক্ষিত একা হইলেও রাজারা কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার বাণে কাহারও হাত, কাহারও পা, কাহারও রথ আবার কাহারও সারথি কাটা গেল। বাণের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট যাহারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন তাঁহাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ! তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন—তাঁহারা একসঙ্গে অবীক্ষিতকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া কেহ তাঁহার ধনু, কেহ রথ, আর কেহবা তাঁহার সারথি কাটিবেন।

সকলে চারিদিক হইতে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া হঠাৎ একজন তাঁহার ধনু কাটিলেন। কয়েকজন মিলিয়া তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, তাঁহার রথটিকেও ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবীক্ষিত তখন তলোয়ার লইয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাও শীঘ্রই কাটা গেল। গদা লইলেন, তাহাও সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর চারিদিক হইতে সকলের বাণ আসিয়া ক্রমাগত তাঁহার গায়ে

বিঁধিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে অবীক্ষিতকে পরাজয় করিয়া, বিজয়ী রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাজকন্যার সহিত বিশাল রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে রাজা করন্ধম, এই সংবাদ পাইয়া তখনি সৈন্যসামন্ত অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিশাল রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। তখন সেখানে আবার মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমাগত তিন দিন যুদ্ধের পর বিশালরাজ বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। এদিকে তাঁহার সাহায্যকারী নিমন্ত্রিত রাজারাও করন্ধমের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। সুতরাং করন্ধমের শরণ লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না।

যুদ্ধ থামিয়া গেল; রাজা করন্ধম বিশালরাজার অতিথি হইয়া সে রাত্রি কাটাইলেন। পর দিন রাজকুমারীকে অবীক্ষিতের সহিত বিবাহ দিবার জন্য বিশালরাজ তাহাকে লইয়া করন্ধমের নিকট উপস্থিত হইলে অবীক্ষিত বলিলেন—"হে রাজন্! কন্যার সম্মুখে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না।"

রাজকুমারের কথা শুনিয়া বিশালরাজা কন্যাকে বলিলেন—"মা! তুমি শুনিলে ত? এখন অন্য কোন রাজাকেই বরণ কর।" একথায় রাজকুমারী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"বাবা! আমি রাজপুত্রের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি! অন্যায় যুদ্ধ না করিলে রাজারা কখনই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না। আমি এই রাজকুমার ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

বিশালরাজা কন্যার কথা শুনিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"রাজকুমার! আমার কন্যা ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তোমার তুল্য বীর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র কর।" রাজকুমার কিছুতেই সম্মত হইলেন না। করন্ধম নিজেও তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল, অবীক্ষিতের মত বদলাইল না।

তখন রাজকুমারী বৈশালিনী বলিলেন,—"রাজকুমার যদি আমাকে বিবাহ না করেন, তবে আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন তপস্যা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারি।" তখন মনের দুঃখে রাজা করন্ধম বিশালরাজের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। আর রাজকুমারী বৈশালিনীও বনে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

অনাহারে অনিদ্রায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে রাজকুমারীর শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িল তবুও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাহা দেখিয়া বৈশালিনী প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন দেবদূত আসিয়া তাহাকে বলিলেন—"দেবতারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তুমি আত্মহত্যা করিও না। এই বনে থাকিয়া তপস্যা করিতে থাক, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।" এই বলিয়া দেবদূত হঠাৎ শূন্যে মিশাইয়া গেলেন। রাজকুমারীর মনে আশা জাগিয়া উঠিল, প্রাণত্যাগের ইচ্ছা দূর হইয়া গেল।

এদিকে করন্ধমমহিষী বীরা একদিন তাঁহার পুত্র অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! আমি 'কিমিচ্ছক' নামে একটি কঠিন ব্রত করিব। এই ব্রতের সময়, যে যাহা চায় তাহাকে সেই জিনিষই দিতে হয়। ধন চাহিলে ধন দিতে হয়; কেহ কোন বলের সাহায্য চাহিলে, সে কাজ নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও তাহা করিতে হয়। রাজভাণ্ডারের ধন তোমার পিতার অধীন; তিনি কথা দিয়াছেন, আমার যত ধন আবশ্যক সব তিনি দিবেন। আর তুমি মহাবীর—বল বিক্রম তোমার অধীন। এখন তুমি যদি তোমার শক্তি দিয়া সাহায্য করিতে রাজি হও তবেই আমি 'কিমিচ্ছক' ব্রত শেষ করিতে পারি।" রাজকুমার মায়ের কথায় সম্মত হইলে রাণী বীরা ব্রত আরম্ভ করিলেন।

রাণীর ব্রতের সময় অবীক্ষিত ভিক্ষার্থীগণকে বলিতে লাগিলেন—"আমার মা কিমিচ্ছক ব্রত করিতেছেন, এ সময়ে আমার শরীর কিংবা বলের দ্বারা যাহার যাহা কিছু সাহায্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। তোমরা কি কি চাও, বল—আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" রাজা করন্ধম বলিলেন—"বাবা! আমি ভিক্ষার্থী—আমি যাহা চাই তাহা দান কর।" অবীক্ষিত বলিলেন—"পিতা! আপনি কি জিনিষ চান বলুন—নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও আমি তাহা দান করিব।" করন্ধম বলিলেন,—"আমাকে পৌত্রমুখ দেখাও।

অবীক্ষিত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু পিতাকেও কিমিচ্ছক দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন—সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা যায় না।

রাজা করন্ধম এইরূপ কৌশলে পুত্রকে বিবাহ সম্মত করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার কিছুদিন পর রাজকুমার এক বনে শিকার করিতে যান। শিকার করিতে করিতে হঠাৎ দূরে বনমধ্যে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেই দিন বেগে ঘোড়া

চালাইলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখেন, একটি পরমাসুন্দরী কন্যাকে একটা দুষ্ট দানব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কন্যা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “আমি মহারাজ

করন্ধমের পুত্র মহাবীর অবীক্ষিতের পত্নী। কে আছ, শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর।”

কন্যার কথা শুনিয়া অবীক্ষিত আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন,—“এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে এমন সুন্দরী কন্যা কোথা হইতে আসিল? আমার পত্নীই বা সে কিরূপে হইল? যাহা হউক, ইহাকে উদ্ধার করিয়া পরে সকল কথা জানিতে হইবে।” ইহা ভাবিয়া রাজকুমার ‘ভয় নাই, ভয় নাই’ বলিয়া কন্যাকে অশ্বাস দিয়া সেই হতভাগা দানবটাকে আক্রমণ করিলেন। দুষ্ট দানব, যোদ্ধা বড় কম ছিল না! শেল, শূল, শক্তি, জাঠা প্রভৃতি নানা রকমের অস্ত্র দিয়া সে রাজকুমারকে আঘাত করিল, অবশেষে গাছ পাথরও ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু অবীক্ষিত দানবের সমুদয় অস্ত্র কাটিয়া তারপর বেতসপত্র বাণে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর দেবতারা আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—“রাজকুমার! তুমি যে কন্যাকে এই মাত্র উদ্ধার করিলে, তাহাকে বিবাহ কর—তোমার মহা ক্ষমতাশালী পুত্র

হইবে।” এ কথায় অবীক্ষিত বলিলেন—“আমি বিশালরাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিলে সেই কন্যাও আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এখন আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত কিরূপে অন্য কন্যাকে বিবাহ করিব ?” তখন দেবতারা বলিলেন—“এই সেই বিশাল রাজার কন্যা—তোমার জন্য এতদিন এই বনে তপস্যা করিতেছিল। সুতরাং ইহাকে তুমি বিবাহ কর।”

অবীক্ষিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“রাজকুমারি ! আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা—তুমি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বল।” রাজকুমারী প্রথম হইতে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাঁহার সেই কঠোর তপস্যার কথা এবং তপস্যায় নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টার কথা, দেবদূতের নিষেধের কথা—কোন কথাই রাজকুমারী বলিতে ভুলিলেন না। তারপর তিনি পুনরায় বলিলেন,—“রাজকুমার ! কঠোর তপস্যায় আমার শরীর মলিন ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তারপর পুনরায় কিরূপে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইলাম, তাহাও বলিতেছি—শুন। সে বড় আশ্চর্য্য কথা ! পরশুদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া জলে নামিবামাত্র হঠাৎ জল হইতে প্রকাণ্ড একটা সাপ উঠিয়া আমাকে ধরিয়া একেবারে পাতালে নাগপুরীতে গিয়া উপস্থিত !

“তখন আমার কি যে ভয় হইয়াছিল তাহা বুঝিতেই পার ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—নাগপুরীতে যাইবামাত্র সেই বৃদ্ধ নাগের স্ত্রী, পুত্র পরিবার সকলে মিলিয়া আমাকে যা আদর যত্ন করিল—তেমন আদর যত্ন আমি জীবনে কখনও পাই নাই। তারপর নাগেরা হাত যোড় করিয়া বলিল—‘রাজকুমারি ! আপনার পুত্রের নিকট আমরা কোন দোষ করিলে তিনি যদি আমাদিগকে বধ করিতে চান, তবে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন—অনুগ্রহ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করুন !’ এ কথায় আমিও ‘আচ্ছা, তাহাই করিব’ এই বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহার পর সেই বৃদ্ধ নাগ আমাকে মূল্যবান অলঙ্কার এবং পোষাক পরাইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া গেল। সেই সময়ে দেখিলাম, আমার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে। তারপর কোথাকার এক দুষ্ট দানব আজ আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া তুমি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে।”

ইহা শুনিয়া অবীক্ষিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—“রাজকুমারী ! যুদ্ধে হারিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আবার শত্রুজয় করিয়া তোমাকে পাইয়াছি।”

এই সময়ে তুনয় নামে এক গন্ধর্ব্ব পরিবারবর্গ লইয়া হঠাৎ সেখানে আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন, "হে রাজপুত্র! এই কন্যা আমারই পুত্রী, ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্য মুনির শাপে আমার পুত্রী বিশালরাজার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল। আমি ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি, তুমি এই রাজকুমারীকে গ্রহণ কর।" তখন সেই বনের মধ্যেই বিবাহের আয়োজন হইল। গন্ধর্ব্ব-পুরোহিত তুম্বুরু অবীক্ষিতের সহিত রাজকুমারী বৈশালিনীর বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর অবীক্ষিত ও বৈশালিনী তুনয়ের সহিত গন্ধর্ব্বলোকে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে পরম যত্নে কিছুকাল বাস করিলেন। সেই সময়ে অবীক্ষিতের একটি পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম হইল মরুত্ত। কিছুকাল পরে রাজকুমার স্ত্রী পুত্রের সহিত রাজধানী ফিরিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন—পিতা করন্ধমের কোলে মরুত্তকে দিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন।

এতকাল পরে করন্ধম পৌত্রের মুখ দেখিলেন। তাঁহার কি যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

নুনের কথা

তোমরা সকলেই খাবার সময় নুন খাও; কিন্তু সে নুন কোথা থেকে আসে জান কি? অনেকেই হয় তো বল্‌বে, 'নুন সমুদ্রের জল থেকে হয়'; কিন্তু কি ক'রে নুন তৈরী করা হয় তা' কি জান? আমাদের দেশে যে 'সৈন্ধব' নুন পাওয়া যায়, সে এক রকমে হয়, আর জাহাজে ক'রে বিলাত থেকে যে নুন আসে, সে আরেক রকমে হয়। 'সৈন্ধব' নুন মানে সমুদ্রের নুন—ইংরাজীতে একে বলে Rock salt—'পাহাড়ের নুন'। 'সৈন্ধব নুন' যেখান থেকে কেটে আনা হয় সেখানে পাহাড়ের মত চাপ হয়ে নুন জমে থাকে;—অনেক সময় মাটির অনেক নীচেও ঐ রকম নুনের স্তূপ পাওয়া যায়।

বহুদিন আগে ঐ সব জায়গায় সমুদ্রের জল আস্‌ত। কোন কারণে—আগ্নেয়গিরির উৎপাতে কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কারণে সেই জল-ভরা জায়গাটুকু সমুদ্র থেকে আলগা হয়ে, সেখানে একটা নোনা জলের হ্রদ হয়ে ছিল। সেই হ্রদের জল আস্তে আস্তে শুখিয়ে গিয়ে, আর নুন দানা বেঁধে ওখানে নুনের স্তূপ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে জমে রয়েছে। প্রতি বৎসর বর্ষার জলে চারি দিকের জমি থেকে কত মাটি, বালি, কাদা,

ধূয়ে এসে সেই নূনের উপর পড়ে ;—সেই জন্য পাহাড়ের নূন তত পরিষ্কার দেখায় না। আমাদের দেশে রাজপুতানায় অনেক পাহাড়ে নূন পাওয়া যায়। সে সব জায়গা এখন সমুদ্র থেকে অনেক শ' মাইল দূরে, কিন্তু এক সময়ে ঐখানেই সমুদ্রের জল ছিল। সে অবশ্য অনেক দিনের কথা।

'পাহাড়ে নূন' কেবল যে খাওয়ার জন্যই ব্যবহার হয় তা' নয় ; অনেক রকম ওষুধেও ব্যবহার হয়। কোন জায়গায় সৈন্ধব নূনে গন্ধক থাকাতে তার এক রকম গুণ হয়, কোন যায়গার নূনে আর অন্য কোন জিনিষ থাকাতে তার অন্য রকম গুণ হয়। কবিরাজী শাস্ত্রে নানা রকম নূনের উল্লেখ আছে ; তার অনেকই বিভিন্ন জায়গার পাহাড়ের নূন। বিলাতে পাহাড়ে নূন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় ; কিন্তু সেখানের লোকে ঐ নূন জমিতে সার দেবার জন্য, গরুর খাবার জন্য, আর নানা রকম জিনিষ তৈরীর জন্য সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাকে।

পাহাড়ে নূন অনেক সময়ে মাটির অনেক নীচে খনিতে পাওয়া যায়। কয়লার খনি থেকে যেমন ক'রে কয়লা তোলে, সেই রকম ক'রে মাটির নীচ থেকে নূন তোলা হয়। কোন কোন সময় প্রায় ২০০ হাত নীচ থেকেও নূন তোলা হয়ে থাকে।
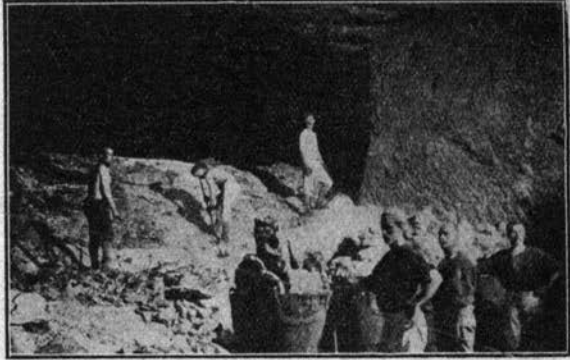
পাহাড়ে নূন ছাড়া যে দানা নূন পাওয়া যায়, সে নূন অন্য রকমে তৈরী হয়। মাটির নীচে ফাটলে অনেক সময় লোনা জল আটকা থাকে। মাটি ফুঁড়ে, সেই জল তুলে এনে, বড় বড় লোহার পাত্রে সেগুলিকে গরম ক'রে তা থেকে নূনের দানা বের করা হয়। খুব তাড়াতাড়ি জলটাকে ফুটিয়ে উড়িয়ে দিলে ছোট দানার নূন পাওয়া যায়, আর আস্তে আস্তে ফোটালে আরো বড় দানার নূন পাওয়া যায়। আরেক রকমেও দানা নূন তৈরী হয়ে থাকে। সমুদ্রের জল বড় বড় চৌবাচ্চার মত জায়গায় ধরে রেখে কিছুদিন তাকে শুকাতে দেওয়া হয়। তারপর বড় বড় লোহার পাত্রে সেই জল গরম ক'রে তা থেকে নূনের দানা বের করা হয়।

লোহার পাত্র থেকে বড় বড় কাঠের গাম্‌লা ক'রে বড় নূনের দানা উঠিয়ে নিয়ে কাঠের ছাঁচে ঢালা হয়। সেই ছাঁচ গরম ক'রে দানা-গুলিকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই নূন বস্তাবন্দি ক'রে চালান হয়।

ছাঁচে জমান নূনের 'কুল্‌পি'

বোতলে ক'রে যে বিলাতী নূন পাওয়া যায়, সেও এই রকমই তৈয়ারী; তবে জ্বাল দেবার বন্দো-বস্তটা তার অন্য রকম, আর শুকাবার সময়ও অন্য রকমে আর অনেক বেশী যত্ন করে শুকান হয় ;—তাই তার রং এত পরিষ্কার সাদা।

আমাদের দেশে মাদ্রাজে নূন তৈরী হয় ; কিন্তু সে নূন তত পরিষ্কার নয় আর তাতে বড্ড বালী থাকে। সাধারণ লোকের নূন তৈরী করার হুকুম নাই ; সব নূনই সরকারী কারখানায় তৈরী হয়ে থাকে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

গ্যালিলিও

সে সাড়ে তিন শত বৎসর আগেকার কথা। ইটালি দেশে পীসা নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। গ্যালিলিওর পিতা অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন—শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল—কিন্তু তবু সংসারে তাঁহার টাকা পয়সার অভাব লাগিয়াই ছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন পুত্রকে এমন কোন বিদ্যা শিখাইবেন, যাহাতে ঘরে দু পয়সা আসিতে পারে। স্থির হইল, গ্যালিলিও চিকিৎসা শিখিবেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই গ্যালিলিওর মনের ঝোঁক অন্য দিকে। ডাক্তারি বই পড়ার চাইতে তিনি কলকব্জা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই বেশী ভাল বাসিতেন। সকলে বলিত, "ও সব শিখিয়া লাভ কি ? যাতে পয়সা হয় তাই শিখিতে চেষ্টা কর"। উনিশ বৎসর বয়সে এক দিন ঘটনাক্রমে জ্যামিতি বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়া গ্যালিলিও সেই দিন হইতেই জ্যামিতি শিখিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহার কলেজে পড়া হইল না। তাঁহার পিতার দুরবস্থা ক্রমে বাড়িয়া শেষটায় এমন হইল যে তিনি আর পড়ার খরচ দিতে পারেন না। কলেজের কর্ত্তারাও দেখিলেন, এ ছোকরা নিজের পড়া শুনার চাইতে জ্যামিতি ও অন্যান্য 'বাজে' বইয়েতেই বেশী সময় নষ্ট করে। বুঝাইতে গেলে উল্টা তর্ক করে, আপনার জেদ ছাড়িতে চায় না। সুতরাং গ্যালিলিওর কলেজে টেকা দায় হইল। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আবার অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন। তারপর পঁচিশ বৎশর বয়সে অনেক চেষ্টার পর তিনি মাসিক ষোল টাকা বেতনে সামান্য এক মাষ্টারী চাকরী লইলেন।

কিন্তু এ চাকরীও তাঁহার বেশী দিন টিকিল না। কেন টিকিল না, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল, এবং পণ্ডিতেরাও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, যে জিনিষ যত ভারি, শূন্যে ছাড়িয়া দিলে সে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। গ্যালিলিও একটা উচু চূড়া হইতে নানা রকম জিনিষ ফেলিয়া দেখাইলেন যে একথা মোটেও সত্য নয়। সব জিনিষই ঠিক সমান হিসাবে মাটিতে পড়ে। তবে, কাগজ পালক প্রভৃতি নিতান্ত হাল্কা জিনিষ যে আস্তে আস্তে পড়ে তার কারণ এই যে, হাল্কা জিনিষকে বাতাসের ধাক্কায় ঠেলিয়া রাখে। ঠিক কি রকম ভাবে জিনিষ কত সেকেণ্ডে কতখানি পড়ে, তাহারও তিনি চমৎকার হিসাব বাহির করিলেন। কিন্তু এত বড় আবিষ্কারে লোকে খুসী না হইয়া বরং সকলে গ্যালিলিওর উপর চটিয়া গেল। পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত গ্যালিলিওর হিসাব প্রমাণ কিছু না দেখিয়াই সব আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এবং তাহার ফলে ঘোর তর্ক উঠিয়া গ্যালিলিওর চাকরীটি গেল।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় গ্যালিলিও আবার আর একটি চাকরী জোগাড় করিলেন এবং কয়েক বৎসর একরূপ শান্তিতে কাটাইলেন। কিন্তু বিনা গোলমালে চুপচাপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি কোপার্ণিকাসের মত সমর্থন করিয়া তুমুল তর্ক তুলিলেন। কোপার্ণিকাসের পূর্ব্বে লোকে বলিত "পৃথিবী শূন্যে স্থির আছে—সূর্য্য গ্রহ চন্দ্র তারা সব মিলিয়া তাহার

চারিদিকে ঘুরিতেছে।" কোপার্ণিকস্ যখন বলেন যে "পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে" তখন লোকে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং গ্যালিলিও যখন আবার সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সে সময়কার পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে—কিন্তু গ্যালিলিও একাই তেজের সহিত তর্ক চালাইয়া সকলকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের আবিষ্কার করেন। হল্যাণ্ড দেশের এক চশমা-ওয়ালা কেমন করিয়া দুই খানা কাচ লইয়া আন্দাজে পরীক্ষা করিতে গিয়া দৈবাৎ একটা দূরবীক্ষণ বানাইয়া ফেলে। এই সংবাদ ক্রমে ইটালি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল; গ্যালিলিও শুনিলেন যে, একরকম যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে দূরের জিনিষ খুব নিকটে দেখা যায়। শুনিয়াই তিনি ভাবিতে বসিলেন এবং রাতারাতি জিনিষটার সঙ্কেত বাহির করিয়া নিজেই একটা দূরবীণ বানাইয়া ফেলিলেন। হল্যাণ্ডের চশমাওয়ালাটি দূরবীণ দিয়া দূরের ঘরবাড়ী দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, গ্যালিলিও তাহাকে আকাশের দিকে ফিরাইলেন।

দূরবীণে আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি যে আনন্দ হইল সে আর বলা যায় না। তিনি যে দিকে দূরবীণ ফিরান, যাহা কিছু দেখিতে যান, সবই আশ্চর্য্য দেখেন। চাঁদের উপর দূরবীণ কষিয়া দেখা গেল তার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা! কোন্ জন্মের সব আগ্নেয় পাহাড় তার সারাটি গায়ে যেন চাক বাঁধিয়া আছে। বৃহস্পতিকে দেখা গেল একটা চ্যাপ্টা গোলার মত—তার আবার চার চারটি চাঁদ! সূর্য্যের গায়ে কালো কালো দাগ! ছায়াপথের ঝাপ্‌সা আলোয় যেন হাজার হাজার তারার গুঁড়া ছড়াইয়া আছে। শুক্রগ্রহ যে ঠিক আমাদের চাঁদের মত বাড়ে কমে, দূরবীণে তাহাও ধরা পড়িল। এমনি করিয়া গ্যালিলিও কত যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ নাই। অবশ্য এ সব কথাও লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না—কোন কোন পণ্ডিত গ্যালিলিওর সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়া তাঁহার দূরবীণ দেখিয়া তবে সব বিশ্বাস করিলেন। কেহ কেহ সব দেখিয়াও বলিলেন, "ও সব কেবল দেখার ভুল—চোখে ধাঁধা লাগিয়া ঐরূপ দেখায়—আসলে আকাশে ও রকম কিছু নাই"। একজন পণ্ডিত দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির চাঁদ দেখিতে সাফ অস্বীকার করিলেন।

ক্রমে কথাটা গুরুতর হইয়া উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল, গ্যালিলিও এই রকম ভাবে যা' তা' প্রচার করিতে থাকিলে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস আর টিকিবে না। পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, এ কথাই যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তবে কিসে তাহারা বিশ্বাস

গ্যালিলিও।

করিবে ? স্বয়ং ধর্ম্মগুরু পোপ আদেশ দিলেন, "তুমি এই সকল জিনিষ লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিও না। তোমার যা বিশ্বাস, তা তোমারই থাক্। তাহা লইয়া যদি লোকের মনে নানা রকম সন্দেহ জন্মাইতে যাও, তবে ভাল হইবে না"। গ্যালিলিও বুঝিলেন যে 'ভাল হইবে না' কথাটার অর্থ বড় সহজ নয়। নিজের প্রাণটি বাঁচাইতে হইলে আর গোলমাল না করাই ভাল। কয়েক বৎসর গ্যালিলিও চুপ করিয়া রহিলেন—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের রাগ ও ক্ষোভ গেল না। কিছুদিন জোয়ার ভাঁটা ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি আবার সেই পৃথিবীর ঘোরার কথা লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে "পৃথিবী ঘোরে" একথা স্পষ্টভাবে না বলিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ দলকে নানা রকমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া সকলকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তখন পাদ্রির দল তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল যে গ্যালিলিও ধর্ম্মগুরু পোপ্‌কে অপমান করিয়াছেন। অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু পাদ্রিদের ধর্ম্মবিচার সভায় গ্যালিলিওর উপর তাঁহার সমস্ত কথা ফিরাইয়া লইবার হুকুম হইল—না লইলে প্রাণদণ্ড। গ্যালিলিওর বয়স তখন প্রায় ৭০ বৎসর। অনেক অত্যাচারের পর তিনি তাঁহার কথা ফিরাইয়া লইলেন। সভায় সকলের সম্মুখে বলিলেন "আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ভুল বলিয়া স্বীকার করিলাম।" কিন্তু মুখে একথা বলিলেও তাঁহার মন তাহা মানিল না—তিনি পাশের একটি বন্ধুকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "অস্বীকার করিলে হইবে কি ? এই পৃথিবী এখনও চলিতেছে।

এইরূপে নিজের জীবনের উপার্জ্জিত সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া তিনি মনের ক্ষোভে ভগ্নদেহে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তারপর যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহাকে আর বাহিরে কোথাও বড় দেখা যাইত না। নিজে সারাজীবন সাধনা করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা প্রাণ খুলিয়া প্রচার করিতে পারিলেন না, এই দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল। যদি গ্যালিলিও জানিতেন আজ জগতের লোকে তাঁহার শিক্ষা এমন সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তবে বোধ হয় বৃদ্ধের শেষ জীবন এত কষ্টের হইত না।

বুদ্ধির বল

(আরবদেশীয় গল্প)

লেম্‌কেন সহরের লোকেদের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। বহুদিন ধরে দেয়ালঘেরা সহরটিকে শত্রুতে ঘিরেছে; খাবার দাবার আর মিল্‌বার জো নাই; লোকে না খেতে পেয়ে মর মর! গরিব যারা, তারা তো অনেকে মারাই গেছে; বড়লোকেরাও অনাহারে শীর্ণ। হাঁসপাতাল রোগীতে ভরা। এমন ভয়ানক সময়ে মহাযোদ্ধার মনও ভেঙে পড়েছে।

শাসনকর্ত্তা নিরাশ হয়ে সহরশুদ্ধ লোককে এক মহা সভায় ডেকেছেন। সকলেই চুপচাপ, সকলেই বিমর্ষ;—আশার কথা কিম্বা সাহস দেবার মত কথা আর কেউ বলে না। শেষটায় এক বুড়ী এগিয়ে এল;—তার শরীর কুঁজো হয়ে পড়েছে, চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, সব দাঁত প'ড়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটি তার জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে।

এগিয়ে এসে সে বল্ল, "আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নাই। আমার মতে চল্লে এখনও আমরা সহরটিকে রক্ষা করতে পারি। আল্লা আমাদের সহায় হবেন; শত্রুরা পালাবে;—আর আমরাও শত্রুর হাতে পড়্‌বার অপমান থেকে রক্ষা পাব।"

বুড়ীর কথায় শাসনকর্ত্তার মনে একটু আশা দেখা দিল—তিনি বুড়ীকে বল্লেন, "তোমার মাথায় কি বুদ্ধি এসেছে একবার বল দেখি। চেঁচিয়ে ব'লো, যাতে সকলে শুনতে পায়।"

বুড়ী চীৎকার করে বল্ল, "আগে একটা বাছুর আন!"

শাসনকর্ত্তা অবাক হয়ে বল্লেন, "বাছুর! সেকি! শেষ যে বাছুরটা ছিল, সেটাও তো বহুদিন আগেই খেয়ে ফেলা হয়েছে। লাখ টাকা দিলেও যে বাছুর মিল্‌বে না।"

বুড়ী কিন্তু জিদ্ ধর্‌ল যে বাছুর আন্‌তেই হবে। কাজেই চারিদিকে বাছুরের খোঁজে লোক ছুট্‌ল। অনেক খোঁজার পর এক কৃপণের ঘরে একটা বাছুর পাওয়া গেল। সোণার দরে বিক্রী কর্‌বে ব'লে সে সেটাকে অতি যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। কৃপণ অনেক আপত্তি, অনেক দোহাই দস্তুর কর্‌ল, কিন্তু তার কথা শোনে কে?

বাছুর এলে পর বুড়ী বল্ল, "দু' মুঠো গম আন।"

অনেক খুঁজে, এ বাড়ী থেকে চারটি, ও বাড়ী থেকে চারটি, এমনি করে দু' মুঠো গম জোগাড় হ'লো। বুড়ী সেই গম ভিজিয়ে নিয়ে বাছুরটাকে খাইয়ে দিল। তা দেখেই তো সকলের চক্ষু স্থির! শাসনকর্ত্তা রেগে বল্লেন, "কি! এত বড় বেয়াকুবি!

এমন আকালের দিনে, এমন ক'রে জিনিষ নষ্ট!" বুড়ী গম্ভীর ভাবে বল্ল, "ব্যস্ত হবেন না। আমার বুদ্ধি মতে কাজ হ'লে নিশ্চয়ই শত্রু পালাবে।"

তারপর বাছুরটাকে সহরের ফটকের কাছে নিয়ে বুড়ী দারোয়ানকে ফটক খুলে দিতে বল্‌ল। দ্বারোয়ান প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় নি; কিন্তু শেষে শাসনকর্ত্তা হুকুম দিতে খুলে দিল। বাছুরটাকে ফটক দিয়ে ঠেলে সহরের বাইরে মাঠে ছেড়ে দিয়ে আবার ফটক বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

শত্রুসৈন্য বাছুরটাকে পেয়ে মহা ফূর্ত্তি ক'রে তাকে ধরে নিয়ে তাদের রাজার কাছে হাজির কর্‌ল। কিন্তু বাছুর দেখেই রাজামশায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল! তিনি বল্‌লেন, "সব মাটি! আমি মনে করছিলাম অনাহারে ওরা মারা যাচ্ছে, কিন্তু ওদের কাছে যখন এমন বাছুর আছে তখন ওদের নিশ্চয় কোন খাবার অভাব নাই। না হ'লে কি আর বাছুরটাকে এতদিনও খেতে বা কি রেখেছে?"

একথা শুনে সবাই এমনি দমে গেল যে রাজা তাদের খুসী করবার জন্য বল্‌লেন, "অনেক কাল টাট্‌কা মাংস খাওয়া হয় নি। চল এটাকে মেরে রান্না ক'রে খাওয়া যাক্।"

রাজামশায়ের কথামত বাছুরটাকে মারা হ'লো—আর তার পেটের মধ্যে পাওয়া

গেল, সেই দু' মুটো গম। তা' দেখে সবাই আরো দ'মে গেল। যাদের ঘরে এত গম, যে তারা বাছুরকেও গম খেতে দেয়—তাদের না খাইয়ে মারবার আশা করা নেহাৎ পাগ্‌লামি!

রাজামশাই এই খবর পেয়ে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি সব লোকজনদের ডেকে বল্‌লেন, "চল আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। লেম্‌কেনের লোকেরা যে এত খাবার সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, এটা তো আর আগে জান্‌তাম না,—তা হ'লে আর এতদিন ওদের কাবু করবার আশায় মিথ্যা সময় নষ্ট কর্‌তাম না।"

সেই দিনই তারা তাঁবু গুটিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে সে দেশ ছেড়ে চ'লে গেল;—আর সকালে উঠে লেম্‌কেনের লোকেরা দেখ্‌ল যে সহরের চারিদিকে কোথাও শত্রুর চিহ্ন মাত্র নাই। তখন যে তাদের আনন্দ। বুড়ীকে কাঁধে নিয়ে তারা সহরময় ঘুরে বেড়াল, আর লোকেরা তাকে চারিদিক থেকে বাহবা দিতে লাগল। শাসনকর্ত্তা বল্‌লেন, "মন্ত্রী! দেখো যেন আজ থেকে বুড়ীর খাবার পর্‌বার আর কোন অসুবিধা না থাকে।"

শ্রীসুবিনয় রায়।

পুরাতন লেখা

[৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত]

কাঁকড়া

কাঁকড়ার মত এমন সরেস জন্তু আর যে খুব বেশী আছে, একথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। সমুদ্রের ধারের বালিতে প্রথমে তাহাদের পায়ের দাগ দেখিতে পাই! একটা ছোট গোলার গায় লম্বা লম্বা কাঁটা বিঁধাইয়া সেই কাঁটাশুদ্ধ গোলাটাকে গড়াইয়া দিলে যেমন দাগ পড়িতে পারে, সেইরূপ দাগ। একটা দুটা নয়, অসংখ্য। যে দিকে চাও, খালি ঐরূপ দাগ। আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম। এরূপ অদ্ভুত চিহ্ন কিসের হইতে পারে, তাহা আমার মাথায়ই আসিল না। খানিক অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, যে এইরূপ এক সার দাগ একটা গর্ত্তের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর গর্ত্তের মালিকও দরজায় বসিয়া আছে। কিন্তু আমাকে দেখিয়া সে বেচারা এত তাড়াতাড়ি গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া গেল, যে আমি ভাল করিয়া তাহার পরিচয়ই লইতে পারিলাম না।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বুঝি মাকড়সা। আকারে একটা মাঝারি মাকড়সার চাইতে বেশী বড় হইবে না, আর রংটাও কতকটা সেই রকমের। সে যে কাঁকড়া, তাহা আমার আদবেই মনে হয় নাই, কারণ কাঁকড়া এমন ছুটিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক আমার ভ্রম দূর হইতে বেশী সময় লাগিল না। কারণ উহার আশে পাশে ঐরূপ আরো অনেক গর্ত্ত ছিল, আর অনেক গর্ত্তের দরজায় এক একটি ছোট্ট কাঁকড়াও বসিয়াছিল। উহারা যে কিরূপ বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত আমাকে দেখিতেছিল, তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। কাঁকড়ার মুখশ্রীতে বিস্ময় কৌতূহল প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নহে, একথা তোমরা বলিবার পূর্ব্বেই আমি স্বীকার করিতেছি। তথাপি ঐ সময়ে উহাদের নিতান্তই কৌতূহল হইয়াছিল, একথা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি। উহাদের অনেকেই আমাকে দেখিবার জন্য গর্ত্ত ছাড়িয়া খানিক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, আর আমি একটু নড়িলে চড়িলে, উহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল।

কাঁকড়ার চেহারা দেখিলে আমার ভারি হাসি পায়। প্রথমতঃ উহার চক্ষু দুটি। এক একটি চোখ এক একটি বোঁটার আগায় বসান। ঐরূপ দুই চক্ষু দিয়া যখন সে তোমার দিকে তাকাইবে, তখন তোমার মনে হইবে যেন তোমাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে দূরবীণ লাগাইয়াছে। ভয়, বিস্ময় বা কৌতূহল হইলে চোখ কেমন বড় হইয়া উঠে, দেখিয়াছ ? হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন চোখ দুটি একটু বাহির হইয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, এই জন্যই কাঁকড়ার চেহারায় এতটা কৌতূহলের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর উহার দুটি গোদা হাত, অর্থাৎ দাঁড়া। আমি যে কাঁকড়াগুলির কথা বলিতেছি, তাহাদের আবার একটি দাঁড়া আর একটির চাইতে ঢের বড়। কাহারও ডাইনের বড় কাহারও বামেরটি বড়। বেশী ভারি কাজ হইলে বড় দাঁড়াটি ব্যবহার করে। ছোটটি হাল্কা কাজের জন্য। কাঁকড়ার মুখ তাহার বুকের কাছে, দাঁড়ায় করিয়া তাহাতে খাবার তুলিয়া দেয়। আমরা যেমন করিয়া হাঁ করি, কাঁকড়া তাহা করে না ; তাহার ঠোঁট আলমারীর দরজার মতন পাশাপাশি খোলে।

বালির উপরে কত কাঁকড়ার গর্ত্ত যে রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কাছে গেলেই উহারা ভয় পাইয়া গর্ত্তের ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু তুমি যদি কোনরূপ গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাক, তাহা হইলে খানিক পরেই উহারা আবার বাহিরে আসিবে। গর্ত্তটিকে পরিষ্কার রাখা উহাদের এক প্রধান কাজ ! সকলের গর্ত্তের সামনেই খানিকটা

নূতন মাটি দেখিতে পাইবে। হয়ত তোমার চোখের সামনেই আবার খানিকটা মাটি আনিয়া উহার উপরে ফেলিবে। দুহাতে সাপটিয়া ধরিয়া গর্ত্তের ভিতর হইতে মাটি লইয়া আসে। দরজার বাহিরে আসিয়াই তাহা ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। কাঁকড়ার পক্ষে অনেক খানি দূরেই ফেলে বলিতে হইবে। মাকড়সার মতন বড় কাঁকড়াটি মটরের মতন বড় এক রাশ মাটি প্রায় ছয় ইঞ্চি দূরে ফেলিতে পারে। মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিবার সময় বড় দাঁড়াটিকেই বেশী ব্যবহার করে।

গর্ত্তের সামনে কোন একটি ছোট জিনিস ছুঁড়িয়া ফেলিলে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া আসে। তারপর বেশ করিয়া সে জিনিষটিকে হাত বুলাইয়া দেখে; পছন্দ হইলে তাহাকে তুলিয়া মুখে দেয়। এক দিন আমি লম্বা সূতায় রুটির টুকরা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটা কাঁকড়া আসিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিল, তারপর তাহাকে টানিয়া গর্ত্তের ভিতরে লইয়া গেল। গর্ত্তটা বেশ গভীর ছিল; প্রায় সওয়া ফুট সূতা ট্যারছা ভাবে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। তারপর আমি সূতা ধরিয়া টানিলাম। সহজ টানে কি তাহা বাহির হয়! কাঁকড়াটা বোধ হয় কিছুতেই রুটিটুকুকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না; তাই সে যতক্ষণ পারিল, প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শেষে অগত্যা রুটির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত! তখনও সে তাহা ছাড়ে নাই। ঐটুকু খাদ্যের মায়ায় সে এতটা ভুলিয়া গিয়াছিল, যে এদিকে, আমি যে তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছি, তাহা সে যেন বুঝিতেই পারে নাই। অবশেষে হঠাৎ একবার যখন রুটীর সঙ্গে সঙ্গে সে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এবারে রুটি ছাড়িয়া দিয়া যে গর্ত্তের ভিতরে ঢুকিল, শত রুটির প্রলোভনেও আর সে বাহিরে আসিল না।

ইহারা কেমন ছোটে, তাহা আগেই বলিয়াছি। ভাল মানুষের মতন সোজাসুজি সামনের দিকে যে চলে, তাহা নহে, সে চলিবে পাশাপাশি—দেখিলেই তাড়া করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাড়া করিতে গেলে দেখা যায়, যে তাহাকে ধরা কাজটি বড় সহজ নহে। তুমি খুব চট্‌পটে সেয়ানা গোছের লোক হইলে অবশ্য শেষে তাহাকে ধরিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সে তোমাকে একশ'বার ফাঁকি দিয়া হাজার ঘুর-পাক খাওয়াইয়া তবে ছাড়িবে।

এই জাতীয় কাঁকড়া যেমন ছুটিতে পারে, তেমনি আবার এমন কাঁকড়াও আছে, যে তাহারা ছুটিবে দূরে থাকুক, শুকনো মাটিতে চলিতেই পারে না। একদিন সমুদ্রের

ধারে গিয়া দেখি, যে ইঁহাদের একজন চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছেন। দেখিতে বেশ গাঁট্টা গোঁট্টা জোয়ান, কাঁঠালের মতন কাঁটাওয়ালা খোলা পরিয়া সঙ্গিন্ সিপাই সাজা হইয়াছে। কিন্তু এদিকে দুরবস্থার একশেষ। কখন কে চিৎ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তদবধি সেই ভাবেই রহিয়াছেন; সোজা হইবার শক্তিটুকু নাই। দেখিয়া আমার হাসিও পাইল, দয়াও হইল। চেহারাটি আবার অতিশয় উৎকট, গায় হাত দিতে ভরসা হয় না। সুতরাং আমি ছাতার আগা দিয়াই উল্টাইয়া দিলাম। কিন্তু খালি উল্টাইয়া দিলে কি হইবে, যদি হাঁটিবার ক্ষমতা না থাকে। নৌকার দাঁড়ের মতন কখানি পা; তাহাতে সাঁতার কাটিবার পক্ষে যতই সুবিধা হউক, ডাঙ্গায় চলার কাজ একেবারেই চলে না। দুই পা না যাইতে যাইতেই আবার ডিগ্‌বাজি খাইয়া যেই চিৎ সেই চিৎ। ইহার পরে ঐরূপ আরো অনেক কাঁকড়া জেলেদের জালে ধরা পড়িতে দেখিয়াছি, এ কাঁকড়া কেহ খায় না, সুতরাং জেলেরা এগুলিকে ফেলিয়া দেয়। যেটাকে যেখানে ফেলে, সেটা আর সেখান হইতে দূরে যাইতে পারে না। কারণ হাঁটিতে গেলেই উল্টাইয়া যায়, আর সেই ভাবেই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়।

জালে আর এক রকম কাঁকড়া ধরা পড়ে, তাহার স্বভাব একটু আশ্চর্য্য রকমের। এই কাঁকড়ার খোলা নাই, অথচ খোলা না থাকিলে কাঁকড়ার বাঁচিয়া থাকাই ভার হয়। তাই সে বিস্তর বুদ্ধি খরচ করিয়া বেশ এক ফন্দি ঠাওরাইয়াছে। সমুদ্রে শঙ্খ শামুক ইত্যাদির খালি খোলার অভাব নাই। এই কাঁকড়া এইরূপ একটা খালি খোলার ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। নরম শরীরটির সমস্তই খোলার ভিতরে; কেবল হাত পা গুলি বাহিরে থাকে, তাহাও ইচ্ছা করিলেই গুটাইয়া লইতে পারে। এইরূপে পরের খোলা পরিয়া ইহারা জীবন কাটাইয়া দেয়, চলা ফেরা সমস্তই ঐ খোলাসমেত হইয়া থাকে। যেন সেটা তার নিজেরই খোলা।
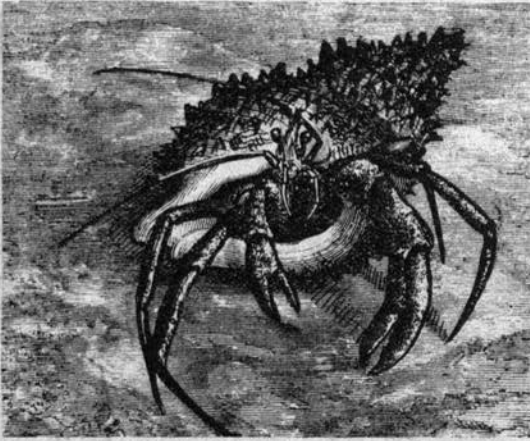
আমি এইরূপ যতগুলি কাঁকড়া দেখিয়াছি, তাহাদের সকলেই লম্বা লম্বা কাঁটাওয়ালা একরকম ছোট শঙ্খের ভিতরে ছিল। কাঁটা থাকায় অন্য কোন জন্তু আসিয়া খপ্ করিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিবার ভয় ছিল না। এই কাঁকড়ার নাম সন্ন্যাসী কাঁকড়া (Hermit crab)।

চীনে পট্‌কা

আমাদের রামপদ একদিন এক হাঁড়ি মিহিদানা লইয়া স্কুলে আসিল। টিফিনের ছুটি হওয়ামাত্র আমরা সকলেই মহা উৎসাহে সেগুলি ভাগ করিয়া খাইলাম। খাইল না কেবল "পাগলা দাশু"। "পাগলা দাশু" কে? পাগ্‌লা দাশুর কথা জান না? সেই যে যশুরে কৈ'এর মত চেহারা, রোগা ছেলেটা—যে আমাদের বোকা বানাইয়াছিল, সেই।

পাগলা দাশু যে মিহিদানা খাইতে ভালবাসে না, তা নয়। কিন্তু, রামপদকে সে একেবারেই পছন্দ করিত না—দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া চলিত। আমরা রামপদকে বলিলাম, "দাশুকে কিছু দে"। রামপদ বলিল, "কিরে দাশু, খাবি নাকি? দেখিস্, খাবার লোভ হ'য়ে থাকেত, বল্ আর আমার সঙ্গে কোনদিন লাগ্‌তে আস্‌বিনে—তাহ'লে মিহিদানা পাবি"। এমন করিয়া বলিলে ত রাগ হইবারই কথা, কিন্তু দাশু কিছু না বলিয়া গম্ভীর ভাবে হাত পাতিয়া মিহিদানা লইল, তারপর দারোয়ানের কুকুরটাকে ডাকিয়া সকলের সামনে তাহাকে সেই মিহিদানা খাওয়াইল। তারপর খানিকক্ষণ হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে স্কুলের বাহিরে চলিয়া গেল। এদিকে হাঁড়িটাকে শেষ করিয়া আমরা সকলে খেলায় মাতিয়া গেলাম—দাশুর কথা কেউ আর ভাবিবার সময় পাই নাই।

টিফিনের পর ক্লাসে আসিয়া দেখি দাশু অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট ভাবে এক কোণে বসিয়া আপন মনে অঙ্ক কষিতেছে। তখনই আমাদের কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে দাশু, কিছু ক'রেছিস্ নাকি"? দাশু নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল, "হ্যাঁ—দুটো 'জি-সি-এম্' ক'রে ফেলেছি"। আমরা বলিলাম, "দূৎ! সে কথা কে বল্‌ছে? কিছু দুষ্টুমির মৎলব করিস্ নি ত"? এ কথায় দাশু ভয়ানক চটিয়া

গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসিতেছিলেন, দাশু তাঁহার কাছে নালিশ করে আর কি ! আমরা অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিলাম।

এই পণ্ডিত মহাশয় মানুষটি মন্দ নহেন। পড়ার জন্য কোন দিনই তাড়াহুড়া করেন না। কেবল মাঝে মাঝে একটু বেশী গোল করিলে হটাৎ সাংঘাতিক রকম চটিয়া যান। সে সময়ে তাঁর মেজাজটি আশ্চর্য্য রকম ধারাল হইয়া উঠে। পণ্ডিত মশাই চেয়ারে বসিয়াই "নদী শব্দের রূপ কর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা বই খুলিয়া হড়বড় করিয়া যা'তা খানিকটা বলিয়া গেলাম—এবং তাহার উত্তরে পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের ভিতর হইতে অতি সুন্দর ঘড়্ঘড়্ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম নিদ্রা বেশ গভীর হইয়াছে। কাজেই আমরাও স্লেট লইয়া 'টুক্‌টাক্' আর 'দশ পঁচিশ' খেলা সুরু করিলাম। কেবল মাঝে মাঝে যখন ঘড়ঘড়ানি কমিয়া আসিত—তখন সবাই মিলিয়া সুর করিয়া "নদী নদ্যৌ নদ্যঃ" ইত্যাদি আওড়াইতাম। দেখিতাম, তাহাতে ঘুমপাড়ানি গানের ফল খুব আশ্চর্য্য রকম পাওয়া যায়।

সকলে খেলায় মত্ত, কেবল দাশু এক কোণায় বসিয়া কি যেন করিতেছে—সে দিকে আমাদের কোন খেয়াল নাই। একটু বাদে পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ারের তলায় তক্তার নীচ হইতে 'ফট্' করিয়া কি একটা আওয়াজ হইল। পণ্ডিত মহাশয় ঘুমের ঘোরে ভ্রূকুটি করিয়া সবেমাত্র "উঁঃ" বলিয়া কি যেন একটা ধমক দিতে যাইবেন, এমন সময় ফুট্ ফাট্ দুম্ দাম্ ধুপ্ ধাপ শব্দে তাণ্ডব কোলাহল উঠিয়া সমস্ত স্কুলটিকে একেবারে কাঁপাইয়া তুলিল। মনে হইল যেন যত রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর সবাই এক জোটে বিকট তালে ছাত পিটাইতে লাগিয়াছে—দুনিয়ার যত কাঁসারি আর লাঠিয়াল সবাই যেন পাল্লা দিয়া হাতুড়ি আর লাঠি ঠুকিতেছে। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা, যাকে পড়ার বইয়ে "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" বলে, তেমনি হইয়া হাঁ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় একবার মাত্র বিকট শব্দ করিয় তারপর হটাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া এক লাফে টেবিল ডিঙাইয়া একেবারে ক্লাশের মাঝখানে ধড়ফড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। সরকারী কলেজের নবীন পাল বরাবর "হাই জাম্পে" ফার্স্ট প্রাইজ পায়; তাহাকেও আমরা এ রকম সাংঘাতিক লাফাইতে দেখি নাই। পাশের ঘরে নীচের ক্লাশের ছেলেরা চীৎকার করিয়া "কড়াকিয়া" মুখস্থ আওড়াইতেছিল—গোলমালে তারাও হঠাৎ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্কুলময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—দারোয়ানের কুকুরটা পর্য্যন্ত যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া বিকট কেঁউ কঁউ শব্দে গোলমালের মাত্রা ভীষণ রকম বাড়াইয়া তুলিল।

পাঁচ মিনিট ধরিয়া ভয়ানক আওয়াজের পর যখন সব ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "কিসের শব্দ হইয়াছিল দেখ।" দারোয়ানজি একটা লম্বা বাঁশ

দিয়া অতি সাবধানে আস্তে আস্তে তক্তার নীচ হইতে একটা হাঁড়ি ঠেলিয়া বাহির করিল—রামপদর সেই হাঁড়িটা; তখনও তার মুখের কাছে একটুখানি মিহিদানা লাগিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ানক ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "এ হাঁড়ি কার"? রামপদ বলিল, "আজ্ঞে আমার"। আর কোথা যায়—অমনি দুই কাণে দুই পাক! "হাঁড়িতে কি রেখেছিলি"? রামপদ তখন বুঝিতে পারিল যে গোলমালের জন্য সমস্ত দোষ তাহারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে! সে বেচারা তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেল—"আজ্ঞে ওর মধ্যে ক'রে মিহিদানা এনেছিলাম, তারপর—" মুখের কথা শেষ না হইতেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তারপর মিহিদানাগুলো চীনে পট্‌কা হয়ে ফুট্‌তে লাগল—না?" বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

অন্যান্য মাষ্টারেরাও ক্লাশে আসিয়া জড় হইয়াছিলেন ; তাঁহারাও একবাক্যে হাঁ হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিলেন। আমরা দেখিলাম বেগতিক। বিনাদোষে রামপদ বেচারা মার খায় বুঝি ! এমন সময় দাশু আমার স্লেটখানা লইয়া পণ্ডিত মশাইকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন। আপনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন ওরা স্লেট নিয়ে খেলা কচ্ছিল—এই দেখুন টুকটাকের ঘর কাটা।" স্লেটের উপর আমার নাম লেখা—পণ্ডিত মশাই আমার উপর প্রচণ্ড এক চড় তুলিয়াই হঠাৎ কেমন থতমত খাইয়া গেলেন। তারপর দাশুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "চোপ্ রও, কে বলেছে আমি ঘুমুচ্ছিলাম" ? দাশু খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বলিল, "তবে যে আপনার নাক ডাকছিল ?" পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, "বটে ? ওরা সব খেলা কচ্ছিল ? আর, তুমি কি কচ্ছিলে ?" দাশু অম্লানবদনে বলিল, "আমি ত পট্‌কায় আগুন দিচ্ছিলাম।" শুনিয়াইত সকলের চক্ষুস্থির ! ছোকরা বলে কি ?

প্রায় আধমিনিট খানেক কাহারও মুখে আর কথা নাই ! তারপর পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীর গলায় হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কেন পটকায় আগুন দিচ্ছিলে ?" দাশু ভয় পাইবার ছেলেই নয়, সে রামপদকে দেখাইয়া বলিল, "ও কেন আমায় মিহিদানা দিতে চাচ্ছিল না ?" এরূপ অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া রামপদ বলিল "আমার মিহিদানা আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" দাশু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "তা হ'লে, আমার পট্‌কা, আমিও যা ইচ্ছা তাই করব।" এরূপ পাগলের সঙ্গে আর তর্ক করা চলে না ! কাজেই মাষ্টারেরা সকলেই কিছু কিছু ধমক ধামক করিয়া যে যার ক্লাসে চলিয়া গেলেন। সে 'পাগ্‌লা' বলিয়া তাহার কোন শাস্তি হইল না।

ছুটির পর আমরা সবাই মিলিয়া কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল "আমার পট্‌কা, রামপদর হাঁড়ি। যদি আমার দোষ হয়, তা হ'লে রামপদরও দোষ হয়েছে। বাস্ ! ওর মার খাওয়াই উচিত।"

এক পা, না দুই পা ?

এক ছিলেন রাজা। তিনি একদিন শিকার করতে বেরিয়েছিলেন ; বেলা দুপুর হয়ে গেল তবুও কোন শিকার জুটল না। তখন তিনি আর কি করেন; হতাশ হ'য়ে ফিরে আস্‌ছেন, এমন সময় একটী সারস পাখী দেখতে পেলেন। তিনি তখনই সেই সারসটাকে মেরে সেটাকে বাড়ীতে এনে তাঁর ওস্তাদ রাঁধুনীকে সেইটে ভাল করে রাঁধতে বল্লেন !

রাঁধুনীটা ছিল খুবই চালাক আর রাঁধতেও পারত অতি চমৎকার। সেই সারস পাখীটাকে রাঁধতে রাঁধতে এমন সুগন্ধ বেরোতে লাগ্‌ল যে তার একটু খেতে ইচ্ছে গেল। রাজার পাখী কি করে সে খায় ? বেচারী শেষে ভেবে চিন্তে একটুখানি চাটতে চাটতে তার আস্ত একটা ঠ্যাং খেয়ে ফেল্ল। তখন তার মনে ভয় হল রাজামশাই যদি টের পান !

রান্না হতেই রাজামশাই খেতে বসলেন। আর খেতে খেতে রাঁধুনীর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। রাঁধুনীর কপাল মন্দ—হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল যে পাখীর একটা ঠ্যাং নাই। তিনি রাঁধুনীকে তলব করলেন, "সারস পাখীর আর একটা পা কি হল ?" সে অমনি হাত যোড় ক'রে উত্তর দিল—"মহারাজ ! সারস পাখীর ত একটাই পা থাকে। আপনি বোধ হয় ভাল ক'রে দেখেন নি।" শুনে রাজা ত অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন "সে কি কথা ? চলত নদীর ধারে—দেখি সারসের কটা পা ?"

তারপরের দিন ভোরের বেলা রাজা ও রাঁধুনী দুজনে সারস পাখী খুঁজতে বেরুল। চলতে চলতে তারা একটি বিলের ধারে কতকগুলি সারস পাখী দেখতে পেল। তখন পাখীরা ঘুমাচ্ছিল, দেখে ঠিক মনে হ'চ্ছিল যেন তাদের একটি বই পা নেই। সারস পাখী যে অমনি করে এক ঠ্যাঙে ঘুমায় রাজামশাই তা জানতেন না। রাঁধুনী বল্লে "ওই দেখুন মহারাজ ! আমার কথা সত্য কিনা ?" রাজা তাই দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। অমনি সারস পাখীগুলো সেই শব্দ শুনে জেগে উঠে প্রাণভয়ে দুই পা নামিয়ে ডানা মেলে সোঁ করে উড়ে গেল। তা দেখে রাজা মশাই বল্লেন "এই ত এদের দুই পা দেখছি।" রাঁধুনী বল্লে "আপনিত কাল খাবার সময় এরকম হাততালি দেন নি। তা যদি করতেন তা হলে সেটারও দু পা দেখতে পেতেন"। রাজা বল্লেন "তাইত ! আচ্ছা এবার থেকে আমি হাততালি দেব।" রাঁধুনীটা অমনি বলে উঠল "কিন্তু মহারাজ সাবধান ! হাততালি শুনে যেন এই রকম করে না উড়ে যায় ; তা হ'লে শেষ কালে আপনি হয়ত খেতেই পাবেন না !"

শ্রীফনিভূষণ বসু।

ঘোড়ার জন্ম

তোমরা সকলেই জান যে এমন সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু গাছপালা কোথাও কিছু ছিল না। তখন এই পৃথিবী তপ্ত কড়ার মত গরম ছিল—বৃষ্টির জল তাহার উপর পড়িবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। তারপর যখন পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহাতে অল্পে অল্পে গাছপালা জীবজন্তু দেখা দিতে লাগিল।

জীবজন্তু আসিবার অনেক হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। আজকাল আমরা যে সকল জানোয়ার সচরাচর দেখিতে পাই—এগুলিও সব "আধুনিক" কালের—অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন কালের জানোয়ারেরা সকলেই এখন লোপ পাইয়াছে। সকলে কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই; যদি পাইত তবে এখন পৃথিবীতে এসব জীবজন্তুর কিছুই দেখিতাম না। এখনকার এই সকল জানোয়ারগুলির সকলেই প্রাচীন কালের কোন না কোন জানোয়ারের বংশধর। এই যে অতি সভ্য অতি বুদ্ধিমান মানুষ, ইহার বংশের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই তবে এমন জায়গায় গিয়া পড়িব যেখানে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার যো থাকিবে না।

এমনি ভাবে প্রত্যেক জানোয়ারের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই—প্রাচীনকালের পাহাড়ের স্তরে তাহাদের যে সকল কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়, সে সকল যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি—তবে প্রত্যেকের বেলায় এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল জানোয়ার ছিল, তাহারা সকলেই ত আর আপন আপন কঙ্কালচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—যে সকল কঙ্কাল পাহাড়ের মধ্যে আজও জমিয়া আছে, তাহারও অতি অল্পই মানুষের চোখে পড়িয়াছে। সেই জন্য সকল জন্তুর পূর্ব্বপুরুষের হিসাব এখনও ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই। দুটা একটা যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই কতকটা স্পষ্ট দেখা যায়, কতকটা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সেই যুগের এক একটা জানোয়ার এই যুগের কুকুর বেড়াল গরু হরিণে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কঙ্কাল হইতে যত জানোয়ার-বংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার ইতিহাস আমরা যেমন জানি, এমন আর কাহারও নহে। আমেরিকার 'রকি' পাহাড়ে অনেক জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিত চৌদ্দবৎসর ক্রমাগত সন্ধান করিয়া সেখানে নানা প্রাচীন যুগের প্রায় আটশত ঘোড়ার কঙ্কাল বাহির

করিয়াছেন। "ঘোড়া" বলিলাম বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলিকেই সহজে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার যো নাই।

সব চাইতে পুরাতন যেটি, তাহার নান 'ইয়োহিপ্‌পাস্‌' (Eohippus) বা "আদি অশ্ব"। দেখিতে একটি ছোট ছাগলছানার চাইতে বড় হইবে না—পায় তার চারটি করিয়া আঙ্গুল বা খুর—আর একটা পঞ্চম আঙ্গুলের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। দেখিলে কে বলিবে যে এই জন্তুই ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষ? কিন্তু সবগুলি কঙ্কাল মিলাইয়া যুগ হিসাবে পর পর সাজাইয়া দেখ, ঘোড়ার জন্মের ইতিহাস যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছাগল ছানার মত ছোট জন্তুটি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমে বড় হইল, কেমন করিয়া ক্রমে তাহার চেহারা অল্পে অল্পে বদলাইয়া আসিল, কেমন করিয়া নিত্য নূতন অবস্থার মধ্যে তাহার শরীরের নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে সেই যুগের "আদি অশ্ব" এই যুগের আধুনিক ঘোড়ায় পরিণত হইল, তাহার জীবন্ত চিত্র পাথরের গায়ে কঙ্কালের লেখায় লিখিত রহিয়াছে।
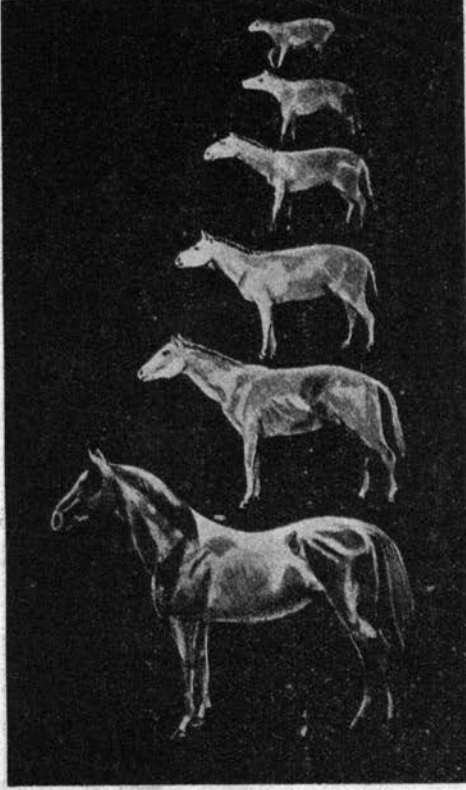
বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের গড়ন মজবুৎ হইয়া আসিয়াছে—তাহার সমস্ত শরীরটা দ্রুত দৌড়িবার উপযোগী হইয়াছে। যে দৌড়াদৌড়ি করে, যাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং দেহের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ খাদ্য চিবাইবার উপযোগী দাঁত তাহার থাকা চাই। তাহার চোয়ালের হাড়ও ক্রমে সেইরূপ মজবুৎ হওয়া দরকার। এই

সকল কঙ্কালের দাঁত ও মাথার হাড় পরীক্ষা করিলেও ঠিক এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সকলের চাইতে চমৎকার তাহার খুরের ইতিহাস। আদিকালের সেই পাঁচটি আঙ্গুল কেমন করিয়া এই যুগে একটা ভোঁতা খুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ইতিহাস অতি সুন্দর ভাবে ও স্পষ্ট ভাবে এই সকল কঙ্কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। "আদি অশ্বের" সময়েই পাঁচ আঙ্গুলের একটি প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছিল; তার পর ক্রমে আর একটি আঙ্গুলও লোপ পাইল—বাকী রহিল মাত্র তিনটি। সংখ্যায় কমিল বটে, কিন্তু ছবিতে দেখ মাঝের আঙ্গুলটি ক্রমে মোটা হইয়া কেমন করিয়া লুপ্ত আঙ্গুলগুলির অভাব দূর করিয়াছে। পাশের আঙ্গুল দুটা ক্রমেই ছোট হইয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত হাড়ের টুকরার মত পায়ের দুপাশে লাগিয়া ছিল। তারপর এখনকার ঘোড়ার পায়ে ওই একটা আঙ্গুলই সবটুকু স্থান দখল করিয়াছে—তাহাকে আর এখন আঙ্গুল বলা চলে না।

কোন্ সময় হইতে মানুষ ঘোড়াকে বশ মানিতে শিখাইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না: অতি প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ, যাহারা বনে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে বাস করিত, তাহাদের শেষ চিহ্নের আশেপাশে লোমশ গণ্ডার, অতিকায় হস্তী, খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র ও গুহা ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ঘোড়ার ঐ তিন আঙ্গুলওয়ালা পূর্ব্বপুরুষদের কেহ যে মানুষের কাজে লাগে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

পাকাপাকি

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রং, পাকা কই তাহারে ;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশী কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কীলিয়ে ?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে !
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়ীতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

সমস্যা

মোগল পাঠানে তখন বড়ই রেষারেষি। একদিন ৩ জন মোগল আর ৩ জন পাঠান এক নদীর ধারে এসে উপস্থিত—তারা পার হবে। ঘাটে একটি ছোট নৌকা, তাতে দুই জন মাত্র পার হতে পারে—তার দাঁড়ি মাঝি কেউ নাই। এখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হ'ল। মোগলেরা মনে করল যে পারাপারির সময় যদি কোনবার কোন পারে পাঠানের সংখ্যা বেশী হয়, তবে তারা হয়ত মার্‌ধর কর্‌বে। তাই ঠিক হ'লো যে এক সঙ্গে দু'জন ক'রে পার হবে আর পারাপারির কোন সময়ই কোন পারেই পাঠানের সংখ্যা বেশী থাক্‌বে না। এখন তোমরা বল তো তারা কেমন ক'রে পার হ'লো ?

স্বরলিপি।

স ধ স ঋ | ঋ ঋ স স | স গ ঋ গ | গ গ।
ব ড় গ রম্! ভা রি গ রম্! ঠা ণ্ডা সর বৎ আ নো!

প প প প | ধ ধ প প | গ গ ঋ ঋ | স স ॥
হাত পা কে মন্ কর্ ছে ছন্ ছন্! জো রে পা খা টা নো!

স ধ স ঋ | গ গ গ প | গ ঋ গ ম | গ ঋ স।
১। খা লে বি লে নাই রে জ ল সব্ শু কি য়ে গে — ল!
২। বু নো হাঁ স্ ব লে মো র্ মা থা গে ল তে — তে।
৩। ঠা ণ্ডা মা টি আ গুন্ হ ল, তে তে গে ল হা — ওয়া।
৪। গ্রী ষ্মে লো কে ব লে "ভা ই, তু মি কে ন এ — লে?

প প প প | ধ ধ প প | গ ঋ গ ম | গ ঋ স।
১। তা তে মা টি ফা টে কা ঠ, গ্রী ষ্ম ঐ রে এ — ল!
২। এই বে লা সেই ঠা ণ্ডা দে শে প লাই উ ত্ত রে — তে।'
৩। ঘ রে ব সে রা খি প্রা ণ্ রৈ ল প থে যা — ওয়া!
৪। গ্রী ষ্ম ব লে "এ স্ত তা ই আ ম্ খে তে পে — লে!

গ গ প প | প ধ প ধ | ন ন ন ধ | ধ প।
১। নৌ কা না হি চ লে আ র্ হায় রে টা না টা নি।
২। ম হিষ্ গ রু য ত ছি ল গে ল রো গা হ য়ে,—
৩। হাঁ ক রি য়া থা কে শা লিক্ ব সে ম নো দুঃ খে,—
৪। দু টো মা স্ থা ক ভা ই গ র মে রে স য়ে;—

ধ ধ ন ন | ধ ধ প প | গ গ প প | ধ প।
১। মা ঝি মা ল্লা ব লে "আ ল্লা গা ঙ্গে নাই ক পা নি।
২। দে শে না হি মি লে ঘা স্, বাঁ চে কি বা খে য়ে!
৩। শু কা য়ে ছে গ লা তা র্ ক থা না হি মু খে!
৪। ফ ল শ স্য পা কে য দি খা বে খু সী হ য়ে।"

[শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত নূতন বই "পড়া শুনা" হইতে গৃহীত]
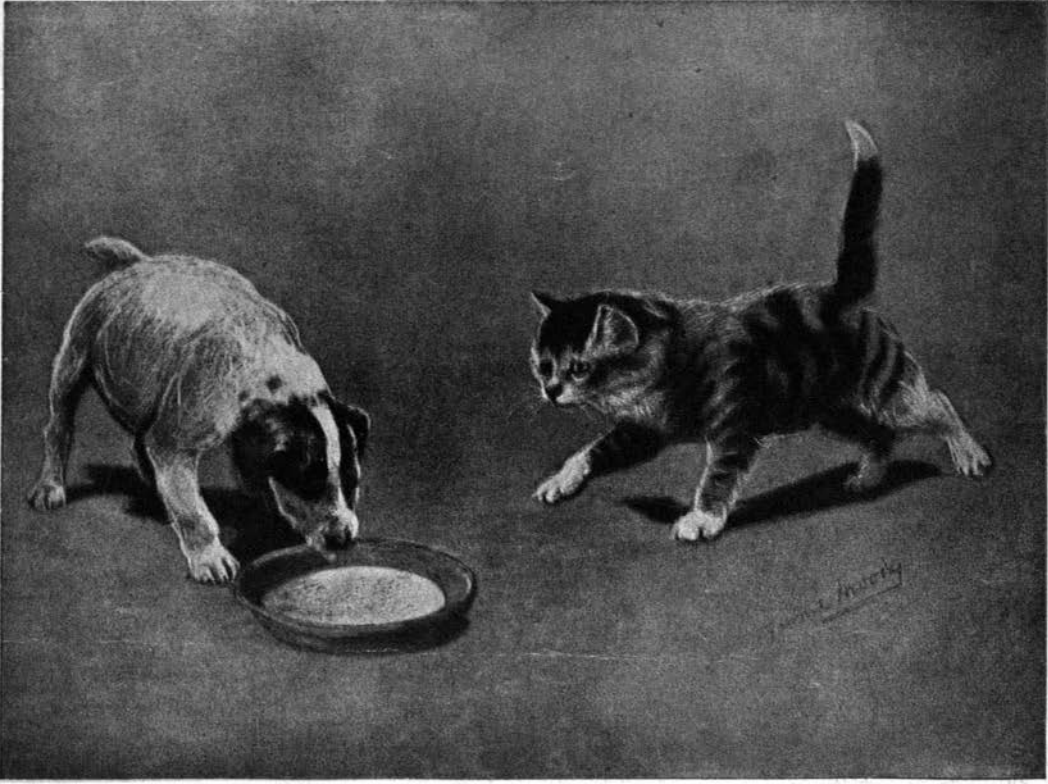
বাটিভরা দুধ ছিল,—চক্ চক্ চক্
খেয়ে গেল, খেয়ে গেল, একি ভয়ানক।

যেটুকু রয়েছে বাকী গেল বুঝি তাও—
ওঁয়াঁ! ওঁয়াঁ! ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্! মিঞাও মিঞাও।

পঞ্চম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ দ্বিতীয় সংখ্যা

খোকার কীর্ত্তি

মায়ের কোলে শুয়ে খোকা ঘুমায় দু'পর বেলা ;
ভুলে গেছে কান্না হাসি দুষ্টামি আর খেলা।
কি জানি সে কোন্ ভাষাতে, মনে কি ভাব আসে ;
ঘুমের ঘোরে মধুর হাসি ফুটছে ঠোঁটের পাশে।

এমন সময় মেনু বেড়াল ঘুড়ুর ঘুড়ুর ক'রে ;
ধীরে ধীরে পড়ল শুয়ে খোকার পাশে স'রে।
মেনুর পরশ পেয়ে খোকা ঘুম্‌টি ভেঙে উঠে,
মেনুর ল্যাজে ধর্‌তে গেল, মেনু পলায় ছুটে।

বেড়াল ছানা ধর্‌তে খোকা চলছে হামা দিয়ে ;
সাম্‌নে ছিল কাজল-লতা বস্‌ল সেটা নিয়ে।
আগে সেটায় মুখে দিয়ে দেখ্‌ল খোকা চুষি ;
তা'রপরেতে মেঝেয় ঠোকে হ'য়ে বেজায় খুসি।

ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে খুলে গেল, মাঝে কাজল-কালি ;
হাতে মুখে মাখ্‌ছে খোকা, দিতেছে হাততালি।
আহ্লাদেতে দেখ্‌ছে খোকা হাতদুখানি তা'র ;
আদর ক'রে মুখের পরে মাখিয়ে দিলে মা'র।

এমন সময় খোকার পিসি এলো দুয়ার খুলে ;
খোকার কীর্ত্তি দেখে হাসি' খোকাকে নিল কোলে।
সুমুখে তা'র আয়না ধ'রে হাস্‌ছে দিয়ে তালি ;
খোকার মুখে চুমু খেতে পিসির মুখেও কালি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মরুত্ত

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত বড় হইয়া রূপে গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে সকলের প্রিয় হইলেন। মহর্ষি ভার্গবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া তাঁহার এতদূর ক্ষমতা হইয়াছিল যে, সে সময়ে তাঁহার সমান যোদ্ধা অন্য কেহই ছিল না।

রাজা করন্ধম বৃদ্ধ হইলে পর একদিন অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন—"পুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া, বনে গিয়া তপস্যা করিব।" অবীক্ষিত পিতার কথায় সম্মত না হইয়া বলিলেন—"বাবা! স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারিয়াছিলাম—সে লজ্জা এখনও দূর হয় নাই। আমি যখন নিজকেই রক্ষা করিতে পারি না, তখন রাজ্য শাসন কি করিয়া করিব? আপনি অন্য কাহাকেও রাজা করুন, আমি বনবাসী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন কাটাইব।"

পুত্রের কথায় করন্ধমের অত্যন্ত কষ্ট হইল! তিনি নানা রকমে বুঝাইলেন কিন্তু অবীক্ষিত কিছুতেই রাজা হইতে চাহিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া করন্ধম, পৌত্র মরুত্তকেই সিংহাসনে বসাইলেন।

কিছুকাল পরে করন্ধম পত্নীর সহিত বনে গিয়া, বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া, স্বর্গে গেলেন। রাণী বীরা, মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে থাকিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মরুত্ত রাজা হইলে, তাঁহার সুশাসনের গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রজারা মহা সন্তুষ্ট হইল—তাহাদের সুখের সীমা রহিল না। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না! মরুত্তের মনেও দুঃখ আসিয়া দেখা দিল!

একদিন মরুত্ত সভায় বসিয়া আছেন—এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া বলিলেন —"মহারাজ! আমি মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম হইতে আসিয়াছি। সাপের কামড়ে

একদিনে সাতজন মুনিবালকের মৃত্যু হইয়াছে! ইহা দেখিয়া আপনার পিতামহী বীরা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'তুমি কিরূপ রাজ্যশাসন করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না! একদিনে সাপের কামড়ে সাতজন মুনিবালকের প্রাণ গেল! তোমার পিতামহের সময়ে এরূপ দুর্ঘটনাত কখনও হয় নাই!' মহারাজ! আপনার পিতামহীর সংবাদ জানাইলাম। এখন যাহা উচিত মনে করেন তাহাই করুন।"

তপস্বীর কথা শুনিয়া মরুত্ত বড় লজ্জিত হইলেন। আবার তাঁহার রাগও হইল। তখনই তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহার সঙ্গে ভার্গবের আশ্রমে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, তাঁহার পিতামহী ও মুনি ঠাকুরেরা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। নিকটেই সাতজন ঋষি কুমারের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। মরুত্ত ধীরে ধীরে, সকলের পায়ের ধূলা লইয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার পিতামহী বলিলেন—"বাছা! পিতার সিংহাসনের অপমান করিলে? তোমার রাজ্যে, নির্দ্দোষী মুনিবালকগুলিকে সাপে কামড়াইয়া মারিল? তবে তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হইবে কি করিয়া?"

মরুত্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ধনুক হাতে লইয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন —"কি! পৃথিবী বশ করিয়াছি, আর সামান্য নাগ আমার শাসন অমান্য করিল? এই মুহূর্ত্তে নাগকুল শেষ করিব।" এই বলিয়া তিনি ধনুকে দারুণ সংবর্ত্তক অস্ত্র জুড়িয়া —'পৃথিবীর সমস্ত নাগ ধ্বংস হউক' এই বলিয়া অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজে সমুদায় নাগলোক জ্বলিয়া উঠিল। মহাবলবান্ নাগেরা পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। অবশেষে বিপন্ন ও নিরুপায় নাগেরা পাতাল ছাড়িয়া মরুত্তের মাতা বৈশালিনীর নিকট আসিয়া বলিল—"হে রাজ্ঞি! পূর্ব্বে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বিপদের সময় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এখন সে প্রতিজ্ঞা পালন করুন—আপনার পুত্র মরুত্তকে শান্ত করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।"

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা বৈশালিনীর মনে পড়িল। কথা যখন দিয়াছেন তখন তাহা রাখিতেই হইবে! তিনি তখনই স্বামীকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অবীক্ষিত বলিলেন—"দুষ্ট সাপেরা, মরুত্তের শাসন অমান্য করিয়া, মুনিবালক-দিগকে বধ করিয়াছে। মরুত্ত তাহাদিগকে সাজা না দিয়া আমার কথায় যে অস্ত্র ফিরাইয়া লইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে! যাহা হউক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি নিতান্তই সে আমার কথা না শুনে, তবে আমি, অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র নিবারণ করিব।" এই বলিয়া অবীক্ষিত ধনুর্ব্বাণ লইয়া পত্নীর সহিত মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, ক্রুদ্ধ মরুত্ত ধনু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই মহা ভীষণ বাণ, মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির করিতে করিতে, চারিদিক্ উজ্জ্বল করিয়া, পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। অবীক্ষিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বৎস মরুত্ত! আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি শান্ত হও এবং অস্ত্র সংহার করিয়া আমার আশ্রিত নাগদিগকে রক্ষা কর।"

মরুত্ত বলিলেন—"পিতঃ! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। আমার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি দুষ্ট সাপেরা শাস্তি না পায়, তবে আমার ক্ষমতাকে ধিক্! সুতরাং অস্ত্র নিবারণ করিতে আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না।"

অবীক্ষিত পুনরায় বলিলেন—"বৎস! তোমার মাতা, বিপদের সময় সাপদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। আমিও তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছি। এখন তুমি অস্ত্র সংবরণ না করিলে, তোমার মায়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে—তাঁহার পাপ হইবে।"

এবারেও মরুত্ত অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"রাজা হইয়া আমি যদি দুষ্টের সাজা না দেই তবে আমাকেও নরকে যাইতে হইবে! নিজের ধর্ম্ম ছাড়িয়া, কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব?"

এইরূপে, বার বার অনুরোধ করিলেও যখন মরুত্ত পিতার কথা শুনিলেন না, তখন অবীক্ষিত ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"রে দুর্বৃত্ত! তুমি পিতা মাতার অপমান করিবে ভাবিয়াছ? অস্ত্রবিদ্যা কি শুধু তুমিই জান? আমি এখনই তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়া নাগকুল রক্ষা করিব।" এই বলিয়া অবীক্ষিত ধনুকে মহা ভয়ঙ্কর কালাস্ত্র সন্ধান করিলেন।

মরুত্তের সংবর্ত্তক অস্ত্রের আগুনেই ত্রিভুবন ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার উপর আবার অবীক্ষিতের কালাস্ত্রও যখন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সকলে মনে করিল—বুঝিবা প্রলয় কাল উপস্থিত! মরুত্তও চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"বাবা! দুষ্টকে দমন করিবার জন্যই আমি সংবর্ত্তক অস্ত্র ছাড়িয়াছি, আপনার বধের জন্য নহে! তবে আপনি কেন নিরপরাধ পুত্রের বধের জন্য, এই মহা অস্ত্র সন্ধান করিতেছেন?"

অবীক্ষিত তখন ক্রোধে উন্মত্ত। তিনি পুত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—"আশ্রিতকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। এখন হয় তুমিই আমাকে

বিনাশ করিয়া নাগকুল বধ কর, অথবা আমিই তোমাকে বধ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিব।"

পিতাপুত্রের কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমের সকলে ভয়ে অস্থির হইলেন। বাস্তবিক তখন দারুণ একটা দুর্ঘটনা হইয়াই যাইত! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভার্গব প্রভৃতি মুনি ঠাকুরেরা, হঠাৎ তাঁহাদিগের মাঝখানে আসিয়া, মরুত্তকে বলিলেন—"পিতার প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে।" অবীক্ষিতকে বলিলেন—"এমন গুণবান্ পুত্রকে বধ করা তোমারও কর্ত্তব্য নহে। আর, সাপেরাও বলিতেছে যে, এখনই ঔষধ আনিয়া ঋষি বালকদিগকে জীবিত করিবে। সুতরাং, আর বিবাদের আবশ্যক কি?"

এই সময়ে রাণী বীরা আসিয়া পুত্র অবীক্ষিতকে বলিলেন—"আমার কথাতেই তোমার পুত্র নাগকুল ধ্বংস করিতেছিল। মুনিবালকেরা যদি জীবন পায়, তবে মরুত্ত এখনই তাহার অস্ত্র থামাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার আশ্রিত নাগেরাও রক্ষা পাইবে!"

তখন পিতাপুত্রের বিবাদ দূর হইয়া গেল। নাগেরাও পাতাল হইতে ঔষধ পত্র আনিয়া মুনিবালকদিগকে জীবিত করিল। তারপর সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! মরুত্ত পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। অবীক্ষিত তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, কত আদর করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বাবা! তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হও। চিরজীবন পৃথিবীর রাজা হইয়া সুখে প্রজাপালন কর।" এই বলিয়া অবীক্ষিত পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া, পত্নীর সহিত চলিয়া গেলেন।

মরুত্ত পৃথিবীর রাজা হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশে তাঁহার মত বলবিক্রমশালী, গুণবান্, পুণ্যবান্ ও তেজস্বী রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই—কোন দিন করিবেনও না।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

তলোয়ার মাছ

গভীর সমুদ্রের তলায় নানারূপ অদ্ভুত জীব জন্তুর বাসা। কেবল অদ্ভুত নয়, তাদের এক একটা খুব ভয়ানকও বটে। হাঙ্গরের কথা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, হয়ত বা অনেকে দেখিয়াও থাকিবে। কিন্তু আজ যে তোমাদের একটা অদ্ভুত মাছের কথা বলিব, সম্ভবত তাহার খবর সকলে জান না। সমুদ্রের নানাস্থানে ইহা দেখা যায়, তবে

ভূমধ্যসাগরেই কিছু বেশী। ইহাকে তলোয়ার মাছ (Sword fish) বলে। নামটিতেই তাহার পরিচয় অনেকটা পাওয়া যায়। এই মাছের উপরকার ঠোঁটটি তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ ও লম্বা—তাহার সাহায্যে শত্রুকে সে অনায়াসে জব্দ করিতে পারে। দশ হাত লম্বা মাছটি, তাহার তলোয়ারটি প্রায় চার হাত।

চেহারাটি যেমনি ভীষণ তার মেজাজটি তেমনি উগ্র এবং তেমনি পেটুক তার স্বভাবটি। এ সকল বিষয়ে হাঙ্গর হইতে কোন অংশে সে কম নহে। স্বজাতিকে আক্রমণ করিতে ভয়ত মোটেই পায় না, এমন কি বড় বড় তিমি মাছকেও আক্রমণ
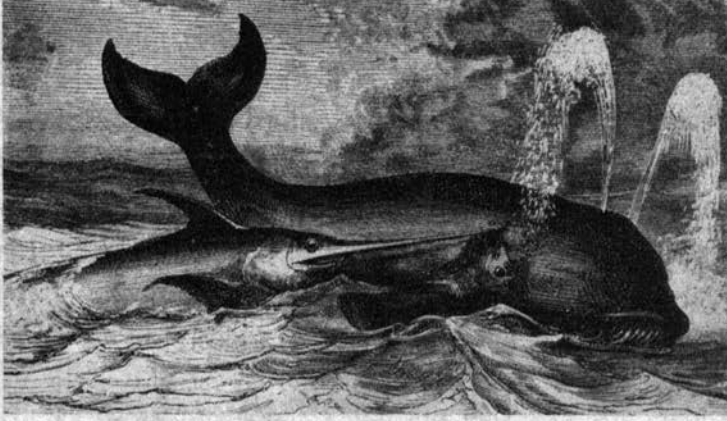
করিতে সে ছাড়ে না। ঐ ঠোঁটের একটি গুঁতা শত্রুর গায়ে বিঁধাইতে পারিলে অনেক সময়েই আর দ্বিতীয় গুঁতার প্রয়োজন হয় না। এক সময় একটা তলোয়ার মাছ একটা জাহাজকে এমন ভীষণ ভাবে আঘাত করিয়াছিল যে তাহার ঠোঁটটা পিতলের পাত মোড়ান জাহাজের তলা ও এক হাত পুরু তক্তা ভেদ করিয়া জাহাজের ভিতরে একটা তেলের টিনে গিয়া ঠেকিয়াছিল।

হাঙ্গরের মত ইহাদেরও পিঠে ডানা আছে, বুকেও আছে। গায়ের রংটি চক্‌চকে পালিশকরা লোহার মত। সাধারণত এই মাছগুলি একা থাকিতেই ভালবাসে, কোন কোন সময় চার পাঁচটিকে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া ফিরিতেও দেখা যায়।

'তলোয়ার মাছ' মানুষের অনেক কাজে লাগে। সিসিলির লোকেরা ইহা হইতে এক প্রকার তেল বাহির করে, তাহা নানারকম কাজে লাগে। ইহাদের গায়ের চামড়া

দিয়া খুব চমৎকার চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া ইহাদের মাংসও নাকি খুব সুস্বাদু। সুতরাং লোকে যে তাহাকে মারিবার জন্য নানারূপ আয়োজন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ছিপ দিয়া বা জাল ফেলিয়া এ মাছ ধরিবার যো নাই—তাহাকে রীতিমত শিকার করিয়া মারিতে হয়।

৭।৮ হাত লম্বা একটি ছোট মাস্তুল ওয়ালা নৌকায় কয়জন লোক মাছ ধরিবার সরঞ্জাম লইয়া মাছ ধরিতে যায়। তাহাদের মধ্যে একজনের কাজ হইতেছে সর্ব্বদা মাছের চলা ফিরার উপর চোখ রাখা। কাজটা কিছু কঠিন নয়, কারণ ইহারা প্রায়ই জলের উপরে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাদের পিঠের ডানা দুইটা উপর হইতেই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মাছ দেখা দিলেই নৌকার লোকেরা সবাই মিলিয়া অদ্ভুত অবোধ্য গ্রীক ভাষায় একপ্রকার গান জুড়িয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস মাছ-গুলি এইরূপ গান শুনিলে নৌকার কাছে না আসিয়াই থাকিতে পারে না। এদিকে নৌকার উপর ওস্তাদ শিকারীরা দড়িবাঁধা বল্লম হাতে লইয়া প্রস্তুত থাকে; মাছ কাছে আসিলেই বল্লম ছুঁড়িয়া তাহাকে গাঁথিয়া ফেলিবে। মাছ ধরিবার সময় শিকারীরা কখনও তাহাদের নিজেদের ভাষায় কথা কহে না। তাহাদের বিশ্বাস এ ভাষা মাছগুলি বোঝে!
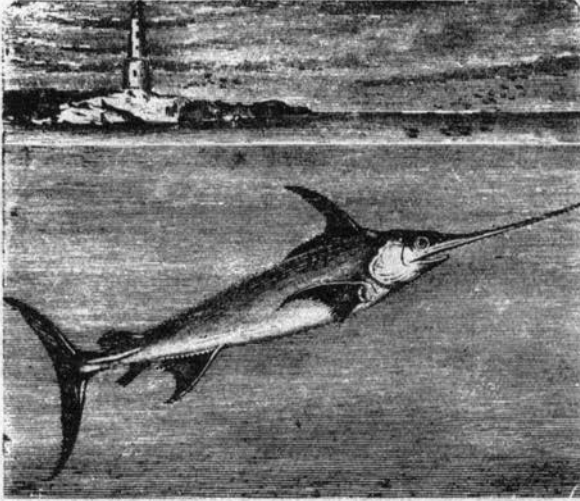
'তলোয়ার মাছ' আকারে ও স্বভাবে যতই ভীষণ হউক না কেন, মানুষ দেখিলে কিন্তু ইহারা বড় ভয় পায়। তখন তাহারা পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বেগতিক দেখিলে মানুষকেও সে এমনি তেজের সহিত আক্রমণ করিয়া বসে যে তখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। একবার তিনজন ডুবরী এক সঙ্গে সমুদ্রে নামিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত এমনি একটা মাছ তাহাদের ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে। হঠাৎ তিনটি বিকটমূর্ত্তি

দেখিয়া তলোয়ার মাছ দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া একজনকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করিয়া বসিল। তলোয়ারের গুঁতা ভাল করিয়া বসাইতে পারে নাই—কিন্তু সে একটি মাত্র ধাক্কা যে মারিয়া ছিল, তাহাতেই ডুবুরি বেচারা অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল। তখন আর দুইজন আসিয়া বহুকষ্টে মাছটাকে মারিয়া ফেলিল।

শ্রীহীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

লোহেন্‌গ্রীন্

(স্পেন দেশের গল্প)

এক পাহাড়ের উপর অতি আশ্চর্য্য এক মন্দির ছিল। একদল সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা দেশ ছেড়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে, রাতদিন তার পাহারা দিতেন। দেশ বিদেশের বিপন্ন লোকেদের সাহায্য করা, অত্যাচার অবিচারের সাজা দেওয়া—ইহাই ছিল এই দলের ব্রত। ভাল কাজে দেবতা সহায় হন, কাজেই দেবতার বলে যুদ্ধের সময় যোদ্ধা মাত্রকেই তাঁদের কাছে হার মান্‌তে হ'ত! কোথাও কোন অত্যাচার হ'লেই মন্দিরের মধ্যে 'টুং টুং' করে শূন্যে একটি ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ত আর সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হতো—'অমুক জায়গায় লোক বিপদে পড়িয়াছে, শীঘ্র গিয়া তাহাকে সাহায্য কর।' আর অমনি যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাত্রা করতেন।

দলের যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল পার্সিভাল। রাজ্যধন সব ছেড়ে, একমাত্র পুত্র লোহেন্‌গ্রীন্‌কে নিয়ে তিনি আশ্রমে এসেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন দলপতি। লোহেন্‌গ্রীন্‌ও পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিল। দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি গুণবান্ তেমনি নিপুণ যোদ্ধা। কিন্তু বয়স অল্প বলে এ সকল বীরত্বের কাজে এ পর্য্যন্ত তাঁকে পাঠান হয় নি। তিনি সর্ব্বদা উৎসুক থাকতেন, কখন সুযোগ উপস্থিত হবে।

একদিন হঠাৎ 'টুং টুং' করে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। সকলে দৌড়ে এসে দেখ্‌লেন, আগুনের মত উজ্জ্বল অক্ষরে আশ্রমের দেয়ালে লেখা হয়েছে—"ব্রাবাণ্টের রাজকুমারী এল্‌সা বিপন্ন, তাঁহার সাহায্যের জন্য এ যাত্রা লোহেন্‌গ্রীন্‌কে যাইতে হইবে।"

তখন লোহেন্‌গ্রীনের আনন্দ দেখে কে! অন্য সকলেও অবশ্য সন্তুষ্ট হলেন কিন্তু বেশী খুসী হলেন রাজা পার্সিভাল। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লেন—"বাবা!

দেবতার কাজে এই প্রথম তুমি বীরত্বের পরিচয় দিতে যাচ্ছ—ভগবান্ তোমার সহায় হউন। কিন্তু সাবধান! কখনও তোমার পরিচয় দিও না, যদি দাও তবে কিন্তু দৈবশক্তি তোমার সহায় থাকবেন না, তুমি যাঁকে সাহায্য করতে যাচ্ছ, তিনি যদি তোমাকে তাঁর যোদ্ধা বলে স্বীকার করেন, তবেই তুমি তাঁর হয়ে যুদ্ধ করবে। তিনি যদি তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তবে তুমি তা বল্‌তে বাধ্য। কিন্তু পরিচয় দিবামাত্র তোমাকে তখনি ফিরে আস্‌তে হবে।"

ইহারপর যোদ্ধারা সকলে মিলে লোহেন্‌গ্রীন্‌কে সোণার কাজকরা আশ্চর্য্য বর্ম্ম আর ধপ্‌ধপে শাদা পালকের চূড়াওয়ালা উজ্জ্বল ইস্পাতের টুপি পরিয়ে সাজিয়ে দিলেন। রাজা পার্সিভাল তাঁর নিজের তলোয়ারখানি তাঁর পাশে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর সকলে মিলে তাঁকে পাহাড়ের নীচে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন।

সেখানে যাবামাত্রই তাঁরা ভারী আশ্চর্য্য একটা ব্যাপার দেখ্‌লেন! একখানা সোণার নৌকা রয়েছে তাতে একটা প্রকাণ্ড রাজহাঁস বাঁধা। হাঁসটার গলায় একটা সোণার হাঁস্‌লি। রাজা পার্সিভাল পুত্রের হাতে তাঁর নিজের সোণার শিঙ্গাটি দিয়ে বল্‌লেন—"শিঙ্গায় তিনটি ফুঁ দিলে, আমরা জানতে পারব যে তুমি নিরাপদে পৌঁচেছ। আবার ফিরে আস্‌বার সময়ও তিনটি ফুঁ দিও—আমরাও তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হব।"

তখন পিতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে, সকলের নিকট বিদায় হয়ে লোহেন্‌গ্রীন্ নৌকায় উঠ্‌লেন। রাজহাঁসটি ধীরে ধীরে নৌকা টেনে চল্‌ল এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল।

এখন রাজকুমারীর কথা বলি। রাজকুমারী এল্‌সা তাঁর পিতার একমাত্র কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর সিংহাসনে বসে রাজ্য

শাসন করতে লাগলেন। এল্‌সা অদ্বিতীয় সুন্দরী, তার উপর আবার এতবড় সম্পত্তির কর্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করবার জন্য দেশ বিদেশের কত বড় বড় লোকেরা পাগল হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুন্দরী এল্‌সা কাকেও বিয়ে করতে রাজি হতেন না। এল্‌সা একদিন এক গভীর বনে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গীদের ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। সেখানে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে তিনি বড় একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে তাঁর মনে হলো যেন তিনি ভারী মিষ্টি গান শুনতে পাচ্ছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল বর্ম্ম পরা, পরমসুন্দর একটি যুবক যোদ্ধা, তার মাথায় শাদাপালকদেওয়া টুপি, সে যেন তাঁর চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ক্রমে সেই দৃশ্য মিলিয়ে গেল, রাজকুমারীও জেগে উঠ্‌লেন। সেই অবধি রাজকুমারী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, সেই স্বপ্নে-দেখা যোদ্ধার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন—অন্য কাকেও বিয়ে করবেন না।

বিবাহার্থীদের মধ্যে একজনকে এল্‌সা ভারী ঘৃণা করতেন এবং ভয়ও করতেন। তিনি ছিলেন কাউণ্ট্ ফ্রেডারিক—ভারী ক্ষমতাবান্ ও প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। কাউণ্ট্ যখন বিয়ের প্রস্তাব করলেন, তখন এল্‌সা এই বলে অস্বীকার করলেন যে "আমি কিছুতেই আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হব না—কারণ আমি যাকে ভালবাসি তাকেই বিয়ে করব।"

তখন কাউণ্ট্ ভয়ানক রেগে বল্‌লেন—"সে কে? তার নাম কি?"

রাজকুমারী ত নাম ধাম জানেন না! তিনি ভারী থতমত খেয়ে চুপ্ করে রইলেন!

তখন কাউণ্ট বল্‌লেন—"হাঁ! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। তার নাম বল্‌তে যখন ভরসা পাও না, তখন নিশ্চয় সে নীচ বংশের! দাঁড়াও—একথা নিশ্চয়ই সম্রাটের কাণে যাবে এবং তিনি তোমার বিচার করবেন।" এই বলে কাউণ্ট্ রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেলেন।

রাজার মেয়ে নীচবংশে বিয়ে করলে তার দরুণ গুরুতর শাস্তি হতে পারে। সুতরাং এল্‌সা মহা ভাবনায় পড়লেন। সম্রাটের কাছে যদি তাঁর বিচার হয় আর তিনি তাতে সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তাঁর অপমান লাঞ্ছনা ও কারাবাস নিশ্চিত! এই রকম ভাবতে ভাবতে রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমের মধ্যে সেই রাজকুমার আবার যোদ্ধার বেশে উপস্থিত! তাঁর হাতে ছোট্ট একটি রূপার ঘণ্টা। তিনি অতি মধুর স্বরে বল্লেন—"এল্‌সা! তোমার কোন ভয় নাই,

আমি তোমার সহায় আছি। এই রূপার ঘণ্টাটি নাও। যখনই সাহায্যের দরকার হবে, ঘণ্টাটি বাজিও—আমি তখনি তোমার কাছে আসব।"

রাজকুমারী তাড়াতাড়ি জেগে উঠলেন। জেগে উঠেও তাঁর মনে হলো যেন সত্য সত্যই ঘণ্টার 'টুং টুং' শব্দ হচ্ছে। তিনি উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন, শাদা ধপ্‌ধপে একটি পাখী তাঁর মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে—তার গলায় ঠিক সেই রকম একটি ঘণ্টা। পাখীটি এসে নির্ভয়ে তাঁর কাঁধে বস্‌ল। রাজকুমারীও আস্তে আস্তে সেই ঘণ্টাটি তার গলা থেকে খুলে নিলেন। পাখী আবার উড়ে চলে গেল।

এদিকে দুষ্ট কাউণ্ট সত্য সত্যই সম্রাটের নিকট নালিশ করেছে।

সম্রাট্ হেন্‌রিক্ ন্যায়বান্ ও পরম দয়ালু। তাঁর কাছে এল্‌সার বিচার হবে। ক্রমে বিচারের দিন উপস্থিত হ'ল। রাজবাড়ীর সামনে নদীর ধারে একটা বড় মাঠের মধ্যে বিচার সভার আয়োজন হল। রাজা তাঁর পারিষদ্বর্গ নিয়ে এসে সিংহাসনে বস্‌লেন। সিংহাসনের এক পাশে এল্‌সা ও তাঁর লোকজন; অপর পাশে কাউণ্ট এবং তাঁর লোকজন। তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ও বড়লোকে সভা পরিপূর্ণ।

ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে রাজা এল্‌সাকে বল্লেন—"রাজকুমারি! তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ হয়েছে। তুমি নাকি তোমারই একজন সাধারণ প্রজাকে বিয়ে করতে চাও?"

এল্‌সা উত্তর দিলেন—"মহারাজ! এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

সম্রাট্—"তবে বল, তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও? সে কিরূপ বংশের ছেলে?"

এল্‌সা এ কথার কি আর উত্তর দেবেন! মাথা নীচু করে তাঁকে স্বীকার করতে হল যে, তিনি এ বিষয়ে কিছু বল্‌তে পারেন না। কিন্তু লোকের মন কেন তাতে সন্তুষ্ট হবে? চারদিকে সকলে কানাকানি করতে লাগল—তবে বা কাউণ্টের কথাই সত্যি!

সম্রাটের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি হুকুম দিলেন—অন্য উপায়ে যদি এর মীমাংসা না হয়, তবে ভগবান্ এ অভিযোগের নিষ্পত্তি করবেন। রাজকুমারীর নির্ব্বাচিত কোন যোদ্ধার সঙ্গে কাউণ্টকে যুদ্ধ করতে হবে। দেবতার কৃপায় ন্যায়ের জয় হবে।"

এল্‌সার হ'য়ে কে যুদ্ধ করবে? কাউণ্ট ফ্রেডারিকের অসাধারণ বীরত্বের কথা কে না জানে? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কেউ ভরসা পেল না। সম্রাটের দূত বার বার বিগল বাজিয়ে ডাক্‌তে লাগল, কিন্তু একজন লোকও এগিয়ে এল না।

তখন এল্‌সা সেই রূপার ঘণ্টাটি বাজালেন। ঘণ্টা বাজাবামাত্র শূন্যে চমৎকার মিষ্টি গান আরম্ভ হল, তেমন গান কেহ কখনও শুনে নাই। সভাস্থ সকলে অবাক্ হয়ে

চেয়ে দেখল—নদীতে সোণার একখানা নৌকা। প্রকাণ্ড একটা রাজহাঁসে টেনে নিয়ে আস্‌ছে। সেই নৌকায় বর্ম্মপরা অস্ত্রধারী সজ্জিত একটি পরম সুন্দর যোদ্ধা।

যোদ্ধাটি পারে নেমে তাঁর সোণার শিঙ্গাটিতে তিনটি ফুঁ দিলেন। তখন সম্রাটের দূত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। যুবক সমস্ত পরিচয় না দিয়ে সংক্ষেপে বল্লেন—"আমি রাজপুত্র লোহেন্‌গ্রীন্।" সম্রাট বল্লেন—"এই পরিচয়ই যথেষ্ট। তোমার মুখখানি দেখেই বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে—এখন বল দেখি, এই রাজকুমারীর হয়ে যুদ্ধ করতে সম্মত আছ কিনা।"

যুবক তৎক্ষণাৎ বল্লেন—হাঁ নিশ্চয় সম্মত আছি। বিপন্ন নির্দ্দোষীকে রক্ষা করবার জন্যই ত এখানে এসেছি।"

তখন কালবিলম্ব না করে সম্রাট হুকুম দিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সে অতি ভয়ানক যুদ্ধ! উভয়ে উভয়কে তলোয়ার দিয়ে কত রকম আঘাত করতে লাগলেন! অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই কাউন্ট্ বেশ বুঝতে পারলেন যে, তিনি বড় সহজ লোকের হাতে পড়েন নি! যত ভাল ভাল কায়দা জান্‌তেন সবই তিনি দেখালেন, কিন্তু যুবক হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর সব আঘাতই বিফল করে দিলেন। কাউণ্টের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল, কপাল দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি বুঝ্‌তে পারলেন, তাঁর মৃত্যু নিকটে! তখন তিনি মরিয়া হয়ে শেষ আঘাত করলেন। লোহেন্‌গ্রীন্ চট্ করে একপাশে সরে গেলেন আর কাউণ্ট্ নিজের আঘাতের বেগ সামলাতে না পেরে একেবারে মাটিতে চিৎপাৎ! লোহেন্‌গ্রীন্ চক্ষের নিমেষে তাঁর গলার উপর তলোয়ার ধরে বল্‌লেন—"হার মান! আমি তোমাকে বধ করতে চাই না।" কাউণ্ট্ ফ্রেডারিক্ নিতান্ত লজ্জিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করলেন।

তখন এল্‌সা বল্লেন "ইনিই সেই যোদ্ধা—যাঁকে আমি ভালবেসেছি।" তখন মহা সমারোহ ক'রে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর লোহেন্‌গ্রীন্ এল্‌সাকে বল্‌লেন—"আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে যে, কোন দিন তুমি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারবে না। যদি জিজ্ঞসা কর তবে অবশ্য আমাকে উত্তর দিতে হবে, কিন্তু মনে রেখো—সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।"

কিন্তু হায়! হাটে বাজারে—যেখানে সেখানে লোকে বলাবলি করে—"কোথাকার একটা অজানা বিদেশী লোক এসে রাজকুমারীকে বিয়ে করলে—আচ্ছা, তিনিই বা কেন রাজি হলেন?" কেউ বলে—"এ লোকটা নিশ্চয় কোন যাদুকরের

ছেলে। নিজেও মন্ত্রতন্ত্র জানে, আর সেই যাদুর গুণেই কাউণ্টকে হারিয়েছিল!" এল্‌সা এসব কথা শুনে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসাই করে ফেল্লেন—"এ হতভাগা নিন্দুক লোকগুলোর কথা কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছি না। অনুগ্রহ করে বল তুমি কে? তবেই ওদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।"

লোহেন্‌গ্রীনের মনে বড়ই কষ্ট হলো। তিনি বল্‌লেন—"জিজ্ঞাসা যখন করেছ তখন উত্তর দিতে আমি বাধ্য। সম্রাটের দরবারে গিয়ে সকলের সাক্ষাতে পরিচয় দিব।" এল্‌সাকে নিয়ে লোহেনগ্রীন দরবারে সকলের সাক্ষাতে বললেন—"মহারাজ! নিন্দুক লোকের মুখবন্ধ করবার জন্য সকলের সাক্ষাতে আমি পরিচয় দিতে এসেছি। সেই আশ্চর্য্য জীবন্ত মন্দিরের অধিপতি রাজা পার্সিভাল আমার পিতা। আমাদের আশ্রমের নিয়ম অতি কঠোর—যুদ্ধ করতে গিয়ে পরিচয় দিলে তখনি আশ্রমে ফিরে যেতে হয়—সুতরাং আমি চল্লাম।"

তখনি সেই সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হলো এবং দেখতে দেখতে সেই রাজহাঁস টানা সোণার নৌকা খানিও নদীতে এসে উপস্থিত।

তারপর কি করুণ দৃশ্য! রাজকুমারীর কান্না ও মিনতি, লোহেনগ্রীনের শেষ বিদায় ও তারপর শোকে দুঃখে রাজকুমারীর মৃত্যু—এসকল কথা এখনও সে দেশের লোক গান গেয়ে গল্প করে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

নকল জিনিষ

আসলের চেয়ে নকলের দামও কম, আদরও কম। কিন্তু নকল জিনিষের ব্যবহার দিন দিন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর লোক সংখ্যা যত বাড়ছে, জিনিষ পত্রের দামও তত বেড়ে যাচ্ছে, আর নকল জিনিষের আবশ্যকতাও বেড়ে যাচ্ছে।

আমার একখানা বই ছিল, তার মলাট চমৎকার লাল চামড়ায় বাঁধান। একদিন কি ক'রে জানি সেই চামড়ার উপর জল পড়ে গেল। অমনি দেখি কিনা, ওমা! চামড়া তো নয়, ও যে কাপড়ের বাঁধান! চেহারাটা ঠিক চামড়ার মত করেছে ব'লে আগে কাপড় ব'লে কোন রকমেই সন্দেহ হয় নি। এই রকম নকল চামড়া আজকাল খুব

ব্যবহার হয়ে থাকে ;—রেলগাড়ীতে যে সব গদি থাকে তার সবই এই নকল চামড়ার। আসল চামড়ার চেয়ে এই নকল চামড়ার দাম অনেক কম। অনেক সময় নকল চামড়ার জুতাও তৈরী হয়ে থাকে।

হাতীর দাঁতের এক রকম নকল বেরিয়েছে, তার চেহারাটা অনেকটা হাতীর দাঁতের মত, কিন্তু দাম হাতীর দাঁতের চেয়ে অনেক কম। 'সেলুলয়েড' তোমরা বোধ হয় সকলেই দেখেছ (আলুর চুড়ি' এই সেলুলয়েডের তৈরী)। এই সেলুলয়েড দিয়েই নকল হাতীর দাঁত তৈরী হয়। সেলুলয়েড তৈরী করবার প্রধান জিনিষ আলু। কাজেই 'আলু থেকে নকল হাতীর দাঁত হয়', বলা যেতে পারে।

কচ্ছপের খোলা দিয়ে অনেক সুন্দর জিনিষ হয়,—কিন্তু তার দাম অনেক বেশী। সেলুলয়েড দিয়ে তারও নকল তৈরী হয়ে থাকে। দেখ্‌তে সেগুলি ঠিক কচ্ছপের খোলার জিনিষেরই মত ; কিন্তু তার চেয়ে নরম, আর দামে খুবই সস্তা।

নকল রেশম আজকাল খুব ব্যবহার হচ্ছে। তূলোর সূতা কিম্বা পাটের সূতার কাপড় থেকে রেশমের নকল হয় বটে, কিন্তু সে তত ভাল নয়। সিরিসের আঠায় অন্য একটা জিনিষ মিশিয়ে তা থেকে সূতো বের ক'রে এক রকম নকল রেশম হয়, তার চেহারা অনেকটা রেশমেরই মত।

পশ্‌মী কাপড় পুরোনো হয়ে ছিঁড়ে গেলে তাকে কুচি কুচি ক'রে কেটে, কলে চাপ দিয়ে তা' থেকে এক রকম কাপড় তৈয়ারী হয়। সে কাপড় দেখ্‌লে কিছুই বোঝা যায় না যে পুরানো কাপড় দিয়ে তৈরী।

ফুল ফলের গন্ধ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর নকল করা হয় যে আসল ফুল ফলের গন্ধের সঙ্গে কোনই প্রভেদ বোঝা যায় না। কলার গন্ধ, আনারসের গন্ধ, এ সব অল্প খরচেই বেশ সুন্দর নকল করা যায়। আরেকটা আশ্চর্য্য এই যে, দুটো বদ্‌গন্ধওয়ালা জিনিষ মিশিয়ে সুন্দর আনারসের গন্ধ হয় ; কলার গন্ধও ঐ রকমের বদ্‌গন্ধ জিনিষ দিয়ে তৈরী হয়। ফুলের গন্ধ এমন সুন্দর নকল করা যায় যে খুব ওস্তাদেও নকল জিনিষটাকে ধর্‌তে পারে না। গোলাপের আতর পর্য্যন্ত নকল হয়েছে। নকল ফুলের গন্ধ সম্বন্ধেও আশ্চর্য্য এই যে, তার অধিকাংশই আলকাত্‌রা থেকে তৈরী হয়।

আগে আমাদের দেশে গাছ গাছড়া থেকে অনেক রকম রং তৈরী হ'তো। নীলের চাষ আমাদের দেশে খুব বেশী পরিমাণে হ'তো, আর সেই নীলের রং নানা দেশে চালান দেওয়া হ'তো। কিন্তু এখন আর সে সব রং তৈরী হয় না, কারণ বিদেশ থেকে নকল

রং এত সস্তায় আসে, যে সে সব রং তৈরী করার খরচই পোষায় না। নকল রং অবশ্যি আসল রংএর চেয়ে অনেক বিষয়েই খারাপ ;—কিন্তু সে রং এতই সস্তা যে, খারাপ হ'লেও লোকে সেই রং ব্যবহার করে থাকে। এ সব রংও অধিকাংশই আলকাত্‌রা থেকে তৈয়ারী হ'য়ে থাকে।

যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে চটের থলির অভাব হওয়ায়, কাগজের সূতো বানিয়ে তা' দিয়ে এক রকম থলি করা হয়েছে। সে থলি নাকি চটের চেয়ে অনেক মজবুত হয়। খাবারেরও অভাব খুবই হচ্ছে। জার্ম্মাণ রাসায়নিকেরা নাকি কাঠের গুঁড়োকে খাবার উপযুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন;—উপায়ও নাকি একটা বের করেছেন। ডাক্তারী তুলোর অভাব হওয়ায় সমুদ্রের শ্যাওলা দিয়ে এক রকম তুলোর মত জিনিষ করা হয়েছে, তাই দিয়ে তুলোর কাজ চালান হচ্ছে।

রবারের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, আর দামও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই নানা দেশী রসায়নিকেরা নকল রবার তৈরী করার চেষ্টা কর্‌ছেন। যিনি পার্‌বেন তিনি মস্ত বড় লোক হয়ে যাবেন।

ছেঁড়া ন্যাকড়া থেকে চিনি তৈরী হয় জান কি ?—এই চিনিকে নকল চিনি বলা যায় যায় না ;—এ হচ্ছে 'কৃত্রিম চিনি ;' কারণ এই চিনি ঠিক আসল চিনিরই মতন ; কেবল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত।

সে দিন একটা কাগজে পড়্‌ছিলাম যে একজন জাপানী পণ্ডিত এক রকম ফলের রস থেকে নকল দুধ তৈরী করেছেন ;—সে দুধ নাকি খেতে আর উপকারীতায় অনেকটা গরুর দুধেরই মত !

হয়তো এমন দিনও আস্‌বে যখন মানুষে তরি তরকারী বেশী না খেয়ে তার নকল জিনিষ খাবে। শেষটায় গিয়ে যে কি দাঁড়াবে কে জানে ?

শ্রীসুবিনয় রায়।

ক্লোরোফর্ম্ম

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষ দিকে অর্জ্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না—কিন্তু আজকালকার ডাক্তারেরা এই বিদ্যাটি রোগীদের উপর অনেক সময়েই প্রয়োগ করিয়া

থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল—রোগী সেই মিষ্ট গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁস্ হইয়া গেল। বাস্! তারপর চট্‌পট্ ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়।

আফিং খাইলে, বা অন্য নানারকম নেশা করিলে, মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের উপর অস্ত্র চিকিৎসা করেন—মাতাল তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোন অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে, ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাবোধকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে রোগী আর কোনরূপ যন্ত্রণা টের পায় না। কিন্তু এরূপ ভাবে নেশা ধরাইয়া চিকিৎসা করার বিপদ অনেক। একেত এই সকল ঔষধে শরীরের মধ্যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে—চিকিৎসা শেষ হইবার বহু পরেও ঔষধের দরুণ নানারূপ উৎপাত চলিতে থাকে। তাহার উপর আবার ঔষধের অভ্যাস একবার ধরিয়া গেলে—তাহাতে রোগীকে একেবারে নেশার মত পাইয়া বসে। তখন বিনা প্রয়োজনেও রোগী ঐ সকল ঔষধের জন্য পাগল হইয়া উঠে—এবং ঔষধের দাস হইয়া সমস্ত জীবনটিকে মাটি করিয়া ফেলে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭ বৎসর পূর্ব্বে হাম্‌ফ্রে ডেভি নামে একজন অসাধারণ ইংরাজ পণ্ডিত একপ্রকার 'গ্যাস' লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজিতে ইহাকে laughing gas অর্থাৎ হাসাইবার গ্যাস বলা হয়। এই জিনিষটিকে নিশ্বাসের সঙ্গে টানিতে গেলে ঘাড়ে মাথায় কেমন সুরসুর করিতে থাকে—তাহাতে অনেকের হাসি আসে। ডেভি দেখিলেন, শুধু সুরসুর করে তাহা নয়, একটু বেশী করিয়া টানিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই রকম ভাবে একটুখানি গ্যাস শুঁকাইয়া মানুষকে মিনিটখানেক বেশ আরামে বেহুঁস করিয়া রাখা যায়। তাহাতে খুব দুর্ব্বল লোকেরও কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডেভি বলিলেন, "এই উপায়ে বেশ সহজেই বিনা যন্ত্রণায় ছোট খাট অস্ত্র চিকিৎসা চলিতে পারে।" দুঃখের বিষয় সে সময়কার অস্ত্র চিকিৎসকেরা এ কথায় কাণ দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পরে একজন আমেরিকান ডাক্তার এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় একটি রোগীর দাঁত তুলিয়া দেখান যে ডেভির কথাটা নেহাৎ মিথ্যা

নয়। সেই অবধি নানারূপ ছোট খাট অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষত দাঁতের ডাক্তারিতে এই গ্যাসের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সামান্য এক মিনিট সময়ের মধ্যেত আর রীতিমত অস্ত্র চিকিৎসা চলে না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসার যন্ত্রণা দূর করিবার আর উপায় ছিল না। সেই সময়কার রোগীদের কাছে অস্ত্র চিকিৎসার মত ভয়ানক জিনিষ আর কিছু ছিল কি না সন্দেহ। যে কয়েদীর প্রাণদণ্ড হইবে, সে যেমন করিয়া ফাঁসির কথা ভাবে, রোগী তেমনি করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবিত। কবে 'অস্ত্র করা' হইবে, সেই ভাবনায় রোগী আগে হইতেই আধমরা হইয়া থাকিত। প্রায় সকল রোগীকেই ধরিয়া বাঁধিয়া জবরদস্তি করিয়া তবে ছুরি চালাইতে হইত। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল সেখানকার এক ডাক্তার 'ইথার' অর্থাৎ সুরা-জাতীর এক প্রকার ঔষধের সাহায্যে, রোগীকে বহুক্ষণ নিরাপদে অজ্ঞান রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছেন।
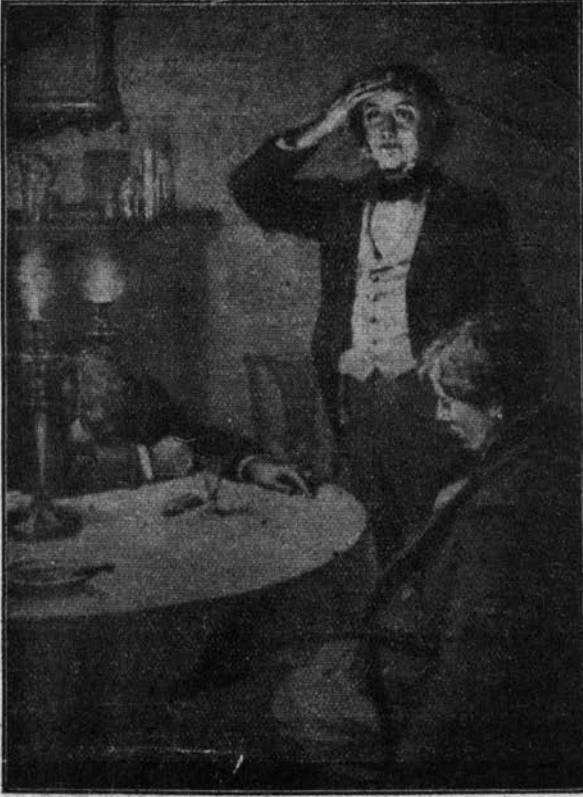
জেম্‌স্ সিম্‌সন নামে একটি উৎসাহী চিকিৎসক সেই সময়ে এডিনবরায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় সেই সময়কার অস্ত্রচিকিৎসার ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সিম্‌সন এক সময়ে আরেকটু হইলেই ডাক্তারি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেন। বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসার কথা শুনিয়া তিনিও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিম্‌সনের

কয়েকটি বন্ধুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া যত রাজ্যের ঔষধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া নানারূপে তাহার নিশ্বাস লইয়া দেখিতেন—ঐরকম অবসাদ আসে কি না! এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ উৎসাহ ছিল সে সম্বন্ধে সিম্‌সনের কোন বন্ধু একটি সুন্দর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বন্ধুটির বাড়ীতে একটি নূতন উগ্র ঔষধ দেখিয়া সিম্‌সন্ তৎক্ষণাৎ, জিনিষটা বিষাক্ত কি না তাহা বিচার না করিয়াই, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হ'ন। কিন্তু বন্ধুটি বাধা দিয়া আগে দুইটা খরগোসের উপর তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে, দুইটা খরগোসই মারা যায়।

যাহা হউক অনেক দিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিম্‌সন এক দিন এক শিশি ক্লোরোফর্ম্ম আনিয়া হাজির করিলেন। সেই দিন আহারের পর দুটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। ক্লোরোফর্ম্মের শিশিতে নাক গুঁজিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে তিন জনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন সিম্‌সনের জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন বন্ধু দুটি তখনও মোহের ঘোরে বেহুঁস হইয়া আছেন। তিনি উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ইথারের চাইতেও চমৎকার"।

সেইদিন হইতে চিকিৎসকগণ এই সম্মোহন অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে অস্ত্র-চিকিৎসার বিভীষিকা সাড়ে পনের আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল অবস্থায় ছুরী ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে রোগী যন্ত্রণায় মারা যাইত—সেরূপ সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও এখন আর রোগীর সে ভয়ের কারণ নাই।

চালিয়াৎ

শ্যামচাঁদ আমাদের নীচের ক্লাসে পড়িত, কিন্তু তার দেমাকের দৌরাত্ম্যে সমস্ত স্কুলশুদ্ধ ছেলে অস্থির হইয়া থাকিত। শ্যামচাঁদের বাবা কোন্ একটা সাহেব অফিসে বড় কাজ করিতেন, তাই শ্যামচাঁদের পোষাকে পরিচ্ছদে রকম সকমে কায়দার আর অন্ত ছিল না। সে যখন দেড় বিঘৎ চওড়া 'কলার' আঁটিয়া রঙ্গিন ছাতা মাথায় দিয়া নূতন জুতার মচ্ মচ্ শব্দে গম্ভীর চালে ঘাড় উঁচাইয়া স্কুলে আসিত—তাহার সঙ্গে পাগ্‌ড়ীবাঁধা তক্‌মাআঁটা চাপরাশি একরাজ্যের বই ও টিফিনের বাক্স বহিয়া আনিত—তখন তাহাকে দেখাইত ঠিক যেন পেখমধরা ময়ূরটির মত! স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা হাঁ করিয়া অবাক হইয়া থাকিত, কিন্তু আমরা সবাই একবাক্যে বলিতাম—"চালিয়াৎ"।

বয়সের হিসাবে শ্যামচাঁদ একটু বেঁটে ছিল। পাছে কেহ তাহাকে ছেলে মানুষ ভাবে, এবং যথোপযুক্ত খাতির না করে, এই জন্য সর্ব্বদাই সে অনাবশ্যক রকম গম্ভীর হইয়া থাকিত এবং কথায় বার্ত্তায় ধরনেধারনে ইংরাজি বোলচাল দিয়া এমন বিজ্ঞের মত ভাব প্রকাশ করিত, যে স্কুলের দরোয়ান হইতে নীচের ক্লাসের ছাত্র পর্য্যন্ত সকলেরই তাক্ লাগিয়া যাইত—সকলেই ভাবিত, "নাঃ, লোকটা কিছু জানে!" শ্যামচাঁদ প্রথম যেবার ঘড়ি চেইন আঁটিয়া স্কুলে আসিল, তখন তাহার কাণ্ড যদি দেখিতে! পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়িটাকে বাহির করিয়া সে কাণে দিয়া শুনিত, ঘড়িটা চলে কিনা! স্কুলের যেখানে যত ঘড়ি আছে সব কটার ভুল তাহার দেখান চাই-ই চাই! পাঁড়েজি দরোয়ানকে সে একদিন রীতিমত ধমক লাগাইয়া বসিল—"এই! স্কুলের ক্লক্‌টাতে যখন চাবি দাও তখন সেটাকে রেগুলেট কর না কেন? ওটাকে অয়েল করতে হবে—ক্রমাগতই স্লো চল্‌ছে!" পাঁড়েজির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও ঘড়ি 'অয়েল' বা 'রেগুলেট' করে নাই। সে যে সপ্তাহে একদিন করিয়া চাবি ঘুরাইতে শিখিয়াছে, ইহাতেই তাহার দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা নাই! কিন্তু দেশ-ভাইদের কাছে মানরক্ষা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, আভি হামি রেংলিট্ করবে"। পাঁড়েজির উপর একচাল চালিয়া শ্যামচাঁদ ক্লাসে ফিরিতেই, কতগুলা ছোট ছেলে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—শ্যামচাঁদ তাহাদের কাছে মহা আড়ম্বর করিয়া স্লো, ফাষ্ট, মেইন স্প্রিং, রেগুলেট্ প্রভৃতি ঘড়ির সমস্ত রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া আমরা সবাই বলিলাম, "চালিয়াৎ!"

একবার আমাদের একটি নূতন মাষ্টার আসিয়াছিলেন, তিনি শ্যামচাঁদকে বেজায় অপ্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি ক্লাসে আসিয়াই শ্যামচাঁদকে 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন! লজ্জায় ও অপমানে শ্যামচাঁদের মুখ কাণ একেবারে লাল হইয়া উঠিল—সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল "আজ্ঞে, আমার নাম শ্যামচাঁদ ঘটক।" মাষ্টার মহাশয় অত কি বুঝিবেন—"শ্যামচাঁদ? আচ্ছা বেশ, খোকা বস।" তারপর কয়েকদিন ধরিয়া স্কুলশুদ্ধ ছেলে তাহাকে "খোকা" "খোকা" করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু কয়দিন পরেই শ্যামচাঁদ ইহার শোধ লইয়া ফেলিল। সে দিন সে ক্লাসে আসিয়াই পকেট হইতে কাল চোঙার মত কি একটা বাহির করিল। মাষ্টার মহাশয় সাদাসিধা ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন "কি হে খোকা, থারমোমিটার [illegible]নেছ যে! জ্বর টর হয় নাকি?" শ্যামলাল বলিল "আজ্ঞে না—থার্‌মোমিটার নয়—ফাউণ্টেন্ পেন্।"

শুনিয়া সকলেরত চক্ষুস্থির ! ফাউণ্টেন্ পেন্ ! মাষ্টার এবং ছেলে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কি ! শ্যামচাঁদ বলিল "এই একটা ভাল্‌কেনাইট্ টিউব, তার মধ্যে কালি ভরা আছে।" একটা ছেলে উৎসাহে বলিয়া উঠিল,—"ও, বুঝেছি, পিচ্‌কিরি বুঝি ? এই খানে টিপে দিলেই ছররর্ করে কালি বেরুবে" ? শ্যামচাঁদ কিছু জবাব না দিয়া খুব মাতব্বরের মত একটুখানি মুচকি হাসিয়া কলমটিকে খুলিয়া তাহার সোণালি নিবখানা দেখাইয়া বলিল, "ওতে ইরিডিয়াম্ আছে—সোণার চেয়েও বেশী দাম"। তারপর যখন সে একখানা খাতা লইয়া সেই আশ্চর্য্য কলম দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নিজের নাম লিখিতে লাগিল, তখন স্বয়ং মাষ্টার মহাশয় পর্য্যন্ত বড় বড় চোখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর, শ্যামচাঁদ কলমটিকে তাঁর হাতে দিবামাত্র তিনি ভারি খুসী হইয়া সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দুই ছত্র লিখিয়া বলিলেন, "কি কলই বানিয়েছে—বিলিতি কোম্পানি বুঝি" ? শ্যামচাঁদ চট্‌পট্ বলিয়া ফেলিল, "আমেরিকান ষ্টাইলো এণ্ড্ ফাউণ্টেন্ পেন কোং ফিলাডেল্‌ফিয়া"। সেই দিন হইতে ক্লাসে তাহার 'খোকা' নাম ঘুচিল—কিন্তু আমরা আরও বেশী করিয়া বলিতাম—"চালিয়াৎ"।

যাহা হউক চালিয়াতের চালচলনের আলোচনা চলিতে চলিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। ছুটির দিন স্কুলের উঠানে প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটান হইল, কলিকাতা হইতে কে এক বাজিওয়ালা আসিয়াছেন, তিনি 'ম্যাজিক' দেখাইবেন। যথা সময়ে সকলে আসিলেন, মাষ্টার ছাত্র লোকজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সকলে মিলিয়া উঠান সিঁড়ি রেলিং পাঁচিল একেবারে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাজিক চলিতে লাগিল। একখানা সাদা রুমাল চোখের সামনেই লাল নীল সবুজের কারিকুরিতে রঙ্গীন্ হইয়া উঠিল ! একজন লোক একটা সিদ্ধ ডিম গিলিয়া মুখের মধ্য হইতে এগারটা আস্ত ডিম বাহির করিল ! ডেপুটি বাবুর কোচম্যানের দাড়ি নিংড়াইয়া প্রায় পঞ্চাশটি টাকা বাহির করা হইল। তারপর ম্যাজিকওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,"কারও কাছে ঘড়ি আছে ?" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিল,"আমার ঘড়ি আছে"। ম্যাজিকওয়ালা তাহার ঘড়িটি লইয়া খুব গম্ভীর-ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘড়িটির খুব প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোফা ঘড়ি ত !" তারপর চেনশুদ্ধ ঘড়িটাকে একটা কাগজে মুড়িয়া একটা হামানদিস্তায় দমাদম্ ঠুকিতে লাগিল। তারপর কয়েক টুক্‌রা ভাঙা লোহা আর কাঁচ দেখাইয়া শ্যামচাঁদকে বলিল "এইটা কি তোমার ঘড়ি ?" শ্যামচাঁদের অবস্থা বুঝিতেই পার ! সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া

রহিল, দুতিনবার কি যেন বলিতে গিয়া আবার থামিয়া গেল। শেষটায় অনেক কষ্টে একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া রুমাল দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িল। যাহা হউক, খানিক বাদে যখন একটা বাতাবি লেবুর মধ্যে ঘড়িটাকে আস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন "চালিয়াৎ" খুব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—যেন তামাসাটা সে আগাগোড়াই বুঝিতে পারিয়াছে। আমরা বলিলাম "কি চালিয়াৎ!"

সব শেষে ম্যাজিকওয়ালা নানাজনের কাছে নানা রকম জিনিষ চাহিয়া হইল—চশমা, আংটি, মণিব্যাগ, রূপার পেন্সিল, প্রভৃতি আট দশটি জিনিষ সকলের সামনে একসঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া, শ্যামচাঁদকে ডাকিয়া তাহার হাতে পোঁটলাটা দেওয়া হইল। শ্যামচাঁদ বুক ফুলাইয়া পোঁটলা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল—আর ম্যাজিকওয়ালা লাঠি ঘুরাইয়া, চোখ টোখ পাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া কি সব বকিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ

শ্যামচাঁদের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "জিনিষগুলো ফেল্লে কোথায়"? শ্যামচাঁদ পোঁটলা

দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" ম্যাজিকওয়ালা মহা খুসী হইয়া বলিল, "সাবাস্ ছেলে! দাও, পোঁটলা খুলে যার যার জিনিষ ফেরৎ দাও।" শ্যামচাঁদ তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে খালি কয়েকটুকরা কয়লা আর ঢিল। তখন ম্যাজিকওয়ালার তম্বী দেখে কে? সে কপালে হাত ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "হায় হায়,—আমি ভদ্রলোকদের কাছে মুখ দেখাই কি ক'রে? এই ছোকরাই আমার সর্ব্বনাশ করল! কেনই বা ওর কাছে দিতে গেছিলাম? ওহে ছোকরা, ওসব তামাসা এখন রাখ, আমার জিনিষগুলা একবার ফিরিয়ে দাও দেখি"। শ্যামচাঁদ হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কাণের মধ্য হইতে আংটি, চুলের মধ্যে পেন্সিল, আস্তিনের মধ্যে চশমা—এইরূপে একটি একটি জিনিষ উদ্ধার করিতে লাগিল। আমরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম—শ্যামচাঁদও প্রাণপণে হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত জিনিষের হিসাব মিলাইয়া ম্যাজিকওয়ালা যখন বলিল, "আর কি নিয়েছ?" তখন সে বাস্তবিকই ভয়ানক রাগিয়া বলিল, "ফের মিছে কথা! কখ্খনো আমি কিচ্ছু নিইনি"। তখন ম্যাজিকওয়ালা তাহার কোটের মধ্য হইতে জ্যান্ত একটা পায়রা বাহির করিয়া বলিল "এটা বুঝি কিছু নয়"? এবার শ্যামচাঁদ একেবারে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর পাগলের মত হাত পা ছুঁড়িয়া সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আমরা সবাই আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া চেঁচাইতে লাগিলাম—চালিয়াৎ! চালিয়াৎ!

তারপর ছুটির পরে সবাই আমরা ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু চালিয়াৎকে আর দেখা গেল না। শুনিলাম, সে নাকি কলিকাতার কোন্ বড় স্কুলে পড়িতে গিয়াছে। শুনিয়া আবার সকলে একবাক্যে বলিলাম—"বেজায় চালিয়াৎ"!

প্রাচীনকালের শিকার

মানুষকে যদি কেবল জন্তু-হিসাবে শরীরের গঠন দেখিয়া বিচার করা যায়, তবে তাহাকে নিতান্তই আনাড়ি জানোয়ার বলিতে হয়। সে না পারে ঘোড়ার মত দৌড়িতে, না জানে ক্যাঙ্গারুর মত লাফাইতে; দেহের শক্তি বল, অথবা নখ দাঁত প্রভৃতি যে কোন অস্ত্রের কথা বল, সব বিষয়েই সে অন্যান্য অনেক জানোয়ারের কাছে হার মানিতে বাধ্য। অথচ এই মানুষই এখন আর সব জানোয়ারের উপর টেক্কা দিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব
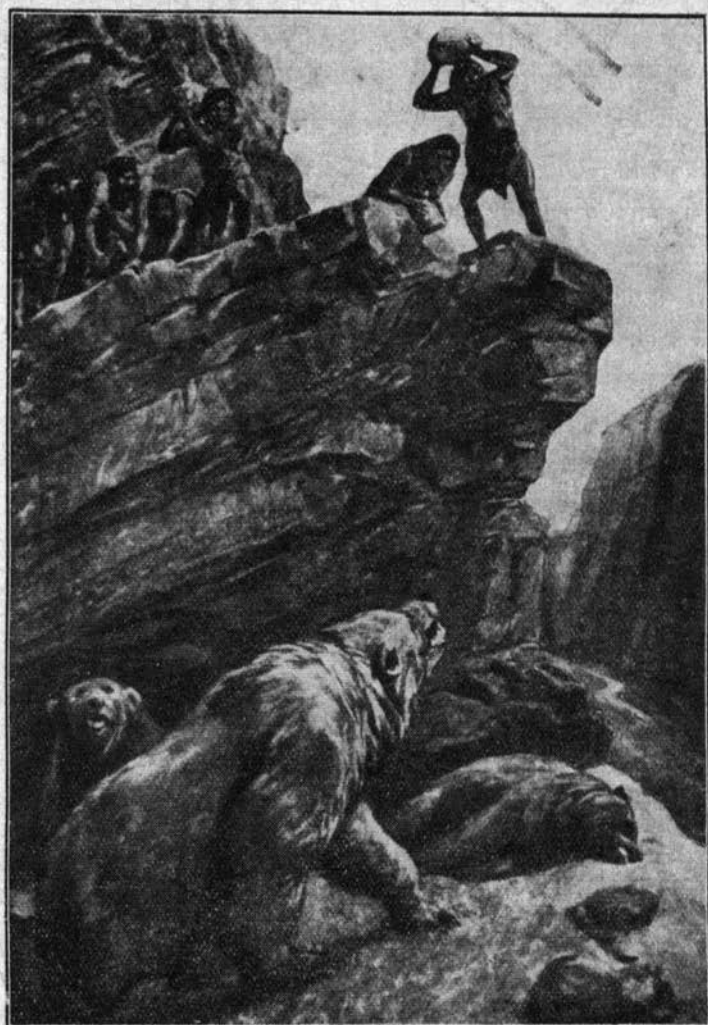
প্রাচীন মানুষ ও গুহাভল্লুক।

করিতেছে। এখনকার যুগের মানুষত আত্মরক্ষার জন্য সহস্র রকম উপায় করিয়া রাখিয়াছে—সহর বাড়ী লোকালয় বানাইয়া, সে বনের জন্তুর কাছ হইতে আশ্রয় পাইবার নানাপ্রকার ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু সেই আদিমকালের মানুষ, যার ঘর ও ছিল না বাড়ীও ছিল না—যে বন্দুক চালাইতে শিখে নাই, এমন কি তলোয়ার বল্লম পর্য্যন্ত বানাইতে পারিত না—সে কেমন করিয়া এত রকম হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রেষারেষি করিয়া টিকিয়া রহিল, ভাবিতে আশ্চর্য্য লাগে।

সে যুগের মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ গুহাগহ্বরে কেহ গাছের ডালে বাসা লইয়া বনের পশুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিত। চলিতে ফিরিতে কত রকম হিংস্র জন্তু আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কোন কোনটা এ যুগের জানোয়ারগুলার চাইতেও ভয়ানক। যেখানেই সেই প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাও—তাহারই আশে পাশে সেই সব পাথরের স্তরের মধ্যেই দেখিবে, আরও কত রকম জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন। এমন অবস্থায় সেকালের মানুষ যে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

"সেকাল" কথাটা খুবই অস্পষ্ট। প্রবীণ লোকেরা নিজেদের বাল্যকালের কথা বলিবার সময় বলেন—"সেকালে" এইরূপ হইত। কোন প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিবার সময় ইতিহাসে বলে "সেকালে" এইরূপ হইত। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর লুপ্ত ইতিহাস লইয়া চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের কাছে এ সমস্ত নিতান্তই "একাল"। ইতিহাস যাহার কথা লেখে না—যে সময়ে ইতিহাস ত দূরের কথা লিখিত ভাষারই সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই যথার্থ "সেকাল"। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেকালের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে কে তাহার হিসাব রাখে? কবে কেমন করিয়া সে অস্ত্র গড়িতে শিখিল, কত ঝগড়া কত লড়াইয়ের মধ্যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে তাহার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল, তাহার একটু আধটু সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহারই পরিচয় সংগ্রহ করিতে আজও কত পণ্ডিতের সারাটা জীবন কাটিয়া যায়!

কত যুগের কত দেশের কত রকম মানুষ। তাহারা পৃথিবীর কত দিকে চলাফিরা করিয়াছে, আর নদীর গর্ভে পাহাড়ের স্তরে তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করিয়া যে মানুষ কাঁচা মানুষ খাইত; ভ্রূকুটি-কপাল চ্যাটাল-চোয়াল যে মানুষ দল বাঁধিয়া নরমাংস ভোজন করিত; গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া যে মানুষ আপন পরিবার লইয়া লুকাইয়া থাকিত; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে যে মানুষ

দলেবলে রাত কাটাইত; পাথরে পাথর শানাইয়া যে মানুষ অস্ত্রে শস্ত্রে পোষাকে পরিচ্ছদে সভ্য হইয়া উঠিতেছিল; বড় বড় পাথরের স্তূপচক্র গড়িয়া যে মানুষ না জানি কোন্ দেবতার পূজা করিত; তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সংবাদ এই যুগের পণ্ডিতেরা তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন।

একবার ভাবিয়া দেখ, সেই গুহাবাসীদের কথা; যাহাদের ঘরের পাশে সেকালের প্রকাণ্ড ভালুকগুলি অহরহই ঘুরিয়া বেড়াইত—প্রতিদিন চলিতে ফিরিতে যাহারা নানা জানোয়ারের প্রচণ্ড তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত; অস্ত্র বলিতে পাথর ছাড়া যাহাদের আর কিছুই ছিল না। তাহারা যে নিতান্ত সখ করিয়া শিকার করিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হয় শত্রুকে মারা, নয় শত্রুর হাতে মরা, ইহা ছাড়া তাহার কাছে আর তৃতীয় কোন পথ ছিল না। 'ম্যামথ্' বা অতিকায় হস্তীর মত অত বড় একটা জানোয়ারকে কাবু করা, অথবা গুহা-ভাল্লুক প্রভৃতি সাংঘাতিক জন্তুগুলির সহিত লড়াই করা, একলা মানুষের সাধ্য নয়—সুতরাং শিকার কাজটা তাহাদের দল বাঁধিয়াই করিতে হইত। এই শিকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রধান সম্বল যেটি ছিল, সেটি অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়—সেটি তার বুদ্ধি। দশ জনে মিলিয়া আগে হইতে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে বেকায়দায় মারিবার চেষ্টাতেই মানুষের বুদ্ধিটা খুলিত ভাল।
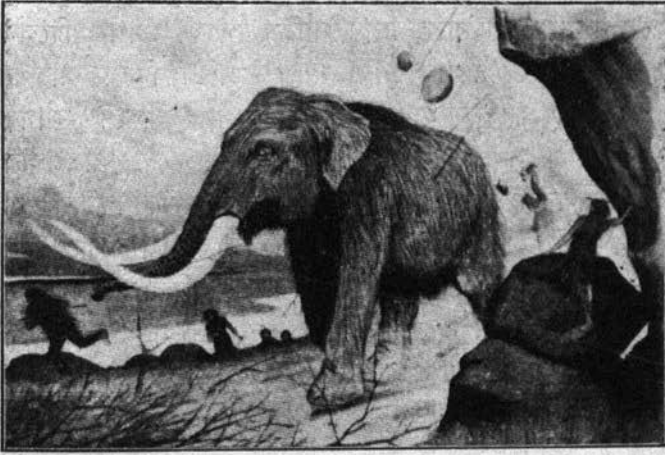
প্রথমত যেমন-তেমন একটা পাথর পাইলেই সে মনে করিত ভারি একটা অস্ত্র পাইলাম। ক্রমে পাথর ছুঁড়িতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ত এটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে হাতের কাছে ছোট পাথর না থাকিলে বড় পাথর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ছুঁড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। তারপর যখন হইতে সে বিবেচনাপূর্ব্বক পাথর ভাঙ্গিতে অভ্যাস

করিল, তখন হইতেই ক্রমে অস্ত্র গড়িবার নানা রকম কায়দা দেখা দিল—ঠ্যাঙাইবার অস্ত্র, গুঁতাইবার অস্ত্র, ছুঁড়িয়া বিঁধাইবার অস্ত্র, কোপাইয়া কাটিবার অস্ত্র, ভারি ভারি ভোঁতা অস্ত্র, পাথরে খোদাই ধারাল অস্ত্র। যেদিন মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল, আর যেদিন সে নানা রকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল, সেই দিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে মানুষ যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

বেলুন

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মসিল্ চার্লস্ নামে এক ব্যক্তি তিনি পারিস্ নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭এ আগষ্ট আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব; আর সে আপনা আপনি উর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭এ আগষ্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্ল্স্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোন জিনিস আপনা হইতেই উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্ল্স্ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্ব্বেই অনেকে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়িদ্বারা বেলুন বাঁধিয়াছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও বেশী উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পার।

ফ্রান্স্ দেশের একটি ছোট গ্রামে বেলুনটি পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। সহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসিগণ তাহা জানিত না; সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে

এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখী বই আর কিছুই নহে। চারি ধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভিতর একটু একটু গুর্ গুর্ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটিকে দুই একটা খোঁচা দিয়া তামাসা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেক বার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রাম-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল; অমনি সেটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছুকাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুট্‌কাইয়া গেল; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারকে বন্দী করতঃ গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন "ইহা এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম্ম।"

[৩১ বৎসর আগেকার "সখা" হইতে লওয়া হইয়াছে]

মরুর দেশে

"মরু" নামটিতেই বলিয়া দেয় যে দেশটি মরা। গাছপালা জীবজন্তু সেখানে বাড়িতে পায় না; মানুষ সেখানে বাস করিতে গেলে, দুদিনের বেশী টিকিতে পারে না; এম্নি ভয়ানক সে দেশ।

পৃথিবীর 'ম্যাপ্' যদি দেখ, দেখিবে আফ্রিকার উত্তরপশ্চিমে সাহারার প্রান্ত হইতে চীন সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বড় বড় দেশ জুড়িয়া Desert (পরিত্যক্ত দেশ) বা মরুভূমি পড়িয়া আছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই মানুষের আবাসের আশেপাশেই ছোট বড় ফাঁকা দেশ—সেখানে ঘর নাই বাড়ী নাই, আছে খালি বালির মাঠ আর বালির ঢিপি। মেরুর কাছে সাইবিরিয়া বা গ্রীণলাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও এমন সব ফাঁকা জায়গা আছে, যেখানে বছরের মধ্যে আটমাস ধরিয়া সারাটি দেশ শ্মশানের মত পড়িয়া থাকে—কেবল বসন্তের কাছাকাছি একটু আধটু গাছপালার চেহারা দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তবিক "মরুভূমি" বলিতে কেবল সেই সব দেশকেই বুঝায় যেখানে বারো মাস কেবল বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখিবার যো' নাই—যেখানে শুক্‌না বালি রৌদ্রে তাতিয়া সমস্ত দেশটাকে একেবারে শুকাইয়া রাখে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি নাই—গাছ পালার মধ্য ক্বচিৎ কোথাও একটু সুবিধা পাইয়া হয়ত দুদশটি মনসা গাছ মাথা তুলিয়াছে। মরুভূমির ধারে কিনারায় হয়ত দুচারিটা সাপ বিছা বা গিরগিটি মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু যতই ভিতরে যাও, ততই দেখিবে জনপ্রাণীর কোন সাড়া

নাই। মাছিটা পর্য্যন্ত সেখানে শুকাইয়া মরে। চারিদিকে কেবল বালি, তার মধ্যে জন্তুই বা বাঁচে কি খাইয়া, আর গাছই বা রস পায় কোথায়? মনসা জাতীয় গাছগুলার পাতা মোটা, তাহাতে রস থাকে অনেক বেশী—আর তাদের ছাল পুরু, তাহাতে রসটাকে তাড়াতাড়ি শুকাইতে দেয় না। তাহারা বালির নীচে সরস মাটিতে প্রাণপণে শিকড় বসাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে।

মরুভূমির মধ্যে আগাগোড়াই কেবল যদি বালি থাকিত, তবে তাহার ভিতরে কার সংবাদ লওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু বালির নীচেও ত জমী আছে—সেই জমীর মধ্যে কত ঝরণা কত জলাশয় বালির চাপে চাপা পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে বালির চাপ কম অথবা জলের বেগ খুব বেশী, সেখানে সমস্ত চাপ ঠেলিয়া জল একেবারে উপরে উঠিয়া আসে। জলের পরশ পাইয়া তাহার চারিদিকে খেজুর

গাছ আর নানা রকম লতাপাতা গজাইয়া উঠে ; গাছের ছায়ায় ছায়ায় সমস্ত জায়গাটিকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। দেখিলে মনে হয় যেন এক একটি তীর্থস্থান। এক একটি মরু তীর্থের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম বসিয়া যায়—মরু পথের যাত্রীরা পথ চলিতে চলিতে এই সকল জায়গায় আসিয়া বিশ্রাম করে।

বাতাস যেখানে শুক্‌না, সেখানকার জমী অল্পেই তাতিয়া উঠে আর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। সেই জন্য মরুভূমিতে যেমন গরম খুব বেশী, শীতও তেমনি প্রচণ্ড। এক সময়ে যেমন মাটিতে পা ফেলিবামাত্র ফোস্কা উঠিয়া যায়—আরেক সময় হয়ত জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। দিনের বেলা যেখানে গরমে শরীর ঝলসিয়া যায়, রাত্রে সেইখানেই কম্বলের উপর কম্বল চাপাইয়া তবু শীত মানিতে চায় না। এইরূপ শীত গ্রীষ্মের লড়াইয়ের মধ্যে বাতাস বড় একটা স্থির থাকিতে পারে না। যেখানেই গরম বেশী, বাতাস সেখান হইতে চিম্‌নির ধোঁয়ার মত উপরে উঠিতে থাকে। তখন চারিদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে। মরুপথের বিপদ অনেক—চলিতে চলিতে পথ হারাইলে তৃষ্ণায় মরিতে হয়—চোরা বালির পাহাড় ধ্বসিয়া কত মানুষ প্রাণ হারায়—শীতে জমিয়া গরমে পুড়িয়া কত সময়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু যত রকম বিপদ আছে তাহার মধ্যে মানুষ সব চাইতে ভয় করে মরুভূমির ঝড়কে। সে ঝড় যে কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। দম্‌কা বাতাসের ঝাপটায় মরুভূমির তপ্ত বালি হূ হূ করিয়া ছুটিতে থাকে ; বাতাসের আঁচে আর বালির ঘষায় সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া

যায়, ধূলায় অন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া মানুষগুলা পাগলের মত ছুটিতে থাকে। তার উপর বাতাসের ঘূর্ণীটানে মরুভূমির বালি যখন পাক দিয়া উঠিতে থাকে, তখন সেই বালুস্তম্ভের মুখে যে পড়ে, তাহার আর রক্ষা নাই। বালির স্তম্ভে চাপা পড়িয়া কত বড় বড় যাত্রীদল যে মারা গিয়াছে তাহার আর হিসাব নাই।

এত বালি আসিল কোথা হইতে? সাহারা মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মণ বালি ক্রমাগত উড়িয়া উড়িয়া পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—তবু মনে হয় বালির আর শেষ নাই। সাহারার মধ্যে এবং পূবে উত্তরে আশে পাশে বেলে পাথরের পাহাড়। কোন্ কালে সে স্থানে সমুদ্র ছিল—তাহার নরম বালি জমাট বাঁধিয়া এখনও পাহাড় হইয়া সঞ্চিত আছে। বাতাসে সেই পাহাড়কে রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে—আবার মরুভূমির বালিকে সেই কোথাকার সমুদ্রের মধ্যে নিয়া ফেলিতেছে। মোটের উপর দেখা যায় যে, বালি ক্ষয় হইতে হইতে ক্রমে

সমস্ত মরুভূমিটাই নীচু হইয়া আসিতেছে। এখন যেখানে মরুভূমি দেখা যায়, শেষে তাহারই কত জায়গায় মানুষের থাকিবার মত চমৎকার জমী দেখা দিবে।

মরুভূমির কথা বলিতে গেলেই উটের কথা আসিয়া পড়ে। উটের শরীরটিকে মরুভূমির উপযোগী করিয়াই গড়া হইয়াছে। চ্যাটাল চ্যাটাল পা, তার আষ্টেপৃষ্টে কড়ায়
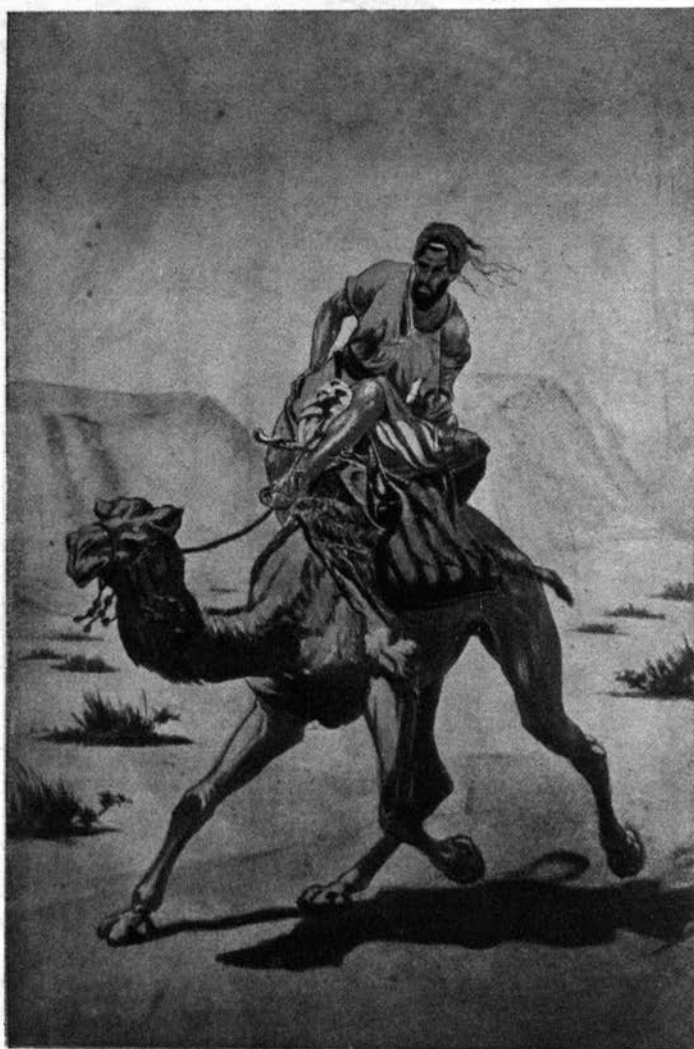
মরুর দেশে

ঢাকা—ঝামা দিয়া ঘষিলেও তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই—এক পেট ঘাস খাইয়া তিন দিন উপাস থাকে—এক ঢোক জল লইয়া সারাদিন পথ চলে। সব দিকে তার সবই ভাল—মন্দের মধ্যে কেবল তার মেজাজটি। আরবদের বিশ্বাস যে উট যদি একবার রাগ করে তবে একদিন হউক, এক বৎসর হউক, সে প্রতিহিংসা না লইয়া ছাড়িবে না। সেই জন্য কোন উটের মেজাজ বিগড়াইতে দেখিলেই তাহারা মাটির উপর নানা রকম পোষাক ছড়াইয়া উটকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উট তখন ঐগুলার উপর মনের সুখে লাথি চাঁটি মারিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা করে।

মরুর দেশের কথা বলিলাম। এখন মরু সাগরের (Dead Sea) কথা বলিয়া শেষ করি। মরু সাগরটি একটা মাঝারি গোছের হ্রদ—৫০ মাইল লম্বা ৮।১০ মাইল চওড়া। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও একটি মাছ বা কোন রকম জলের প্রাণী নাই! সমুদ্রের জলকে শুকাইয়া ঘন করিলে যেরূপ হয়, মরু সাগরের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জল এমন ভারি যে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই আর এমন লবণাক্ত যে জলে স্নান করিলে সর্ব্বাঙ্গে চাপ বাঁধিয়া নুন জমিতে থাকে। ছবিতে দেখ একটি সাহেব জলের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া কেমন নিশ্চিন্তে আরামে শুইয়া বই পড়িতেছেন।
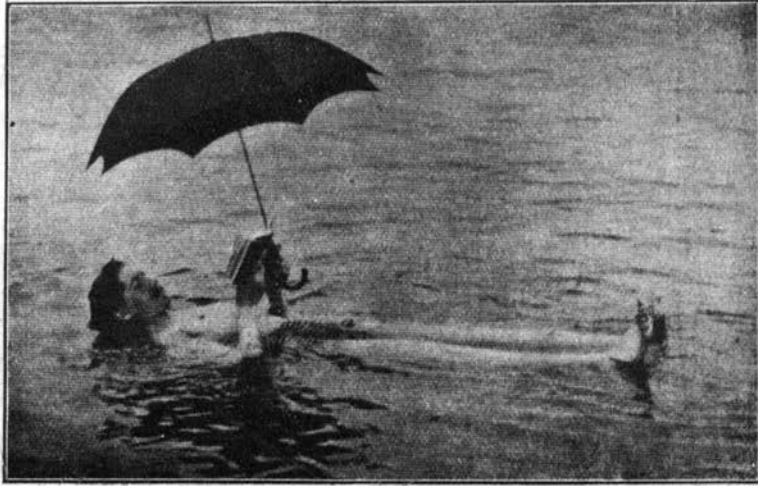
আবোলতাবোল

এক যে ছিল রাজা—(খুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনী বুড়ি) !
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের ? ছাগল ছানা) ।
উঠানে তার থাক্‌ত পোঁতা—
—(বাড়ীই নেই, তার উঠান কোথা) ?
শুনেছি তার পিশ্‌তুতো ভাই—
—(ভাই নয়ত, মামা-গোঁসাই) ।
বল্‌ত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্ম-বোবা, বল্‌বে কিরে !)
যা হো'ক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা, সবাই জানি) !
থও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি
—(আচ্ছা বল, চুপ ক'রেছি) ॥
তার পরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেম্নি না তার ওষুধ গেলা,
অম্‌নি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা ? টাক যে ভরা) !
হোক্‌না টেকো, হোক্‌না বুড়ো,
ধর্‌ব ঠেসে টুঁটির চূঁড়ো ;
হোক্‌না বামুন—হোক্‌না মুচি
কাট্‌ব তেড়ে—কুচি' কুচি' ;
পিট্‌ব তারে হাড়ে মাসে,
দে দমাদম্ আড়ে পাশে।
এখন বাছা পালাও কোথা ?
গল্প বলা সহজ কথা ?

ফট্ ফট্ বন্দুকে ক্যাপ্ যত ফোটে
বোন ভাবে "দাদা মোর বাহাদুর বটে" !

পঞ্চম বর্ষ আষাঢ়, ১৩২৪ তৃতীয় সংখ্যা

প্রভাতে

আজি নব প্রভাতের নবীন কিরণে,
হে বঙ্গ জননী আজি হেরিনু নয়নে।
স্নিগ্ধ-শান্ত ছায়াবৃত পল্লীকুঞ্জ মাঝে,
তোমার সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি সেথায় বিরাজে।
তব দূর নীলাম্বরে ওই যায় দেখা,
উষার প্রথম স্পর্শে ঘন স্বর্ণরেখা।
তারপরে দেখা দেয় ওই রক্ত রবি,
সে আলোকে ফুটে উঠে ধরণীর ছবি।
সে কিরণ নদীজলে করে কত খেলা,
প্রতিদিন উষাকালে প্রতি সন্ধ্যাবেলা।

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নরিষ্যন্ত ও দম

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

মহারাজ মরুত্ত, বৃদ্ধ বয়সে, জ্যেষ্ঠ পুত্র নরিষ্যন্তকে সিংহাসনে বসাইয়া, তপস্যার জন্য বনে গেলেন। রাজা হইয়া নরিষ্যন্ত ভাবিলেন—"আমার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষেরা দানে ধর্ম্মে ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ গৌরবের সহিত পৃথিবী পালন করিয়া গিয়াছেন, আমি কি সেরূপ করিতে পারিব? আমাকে এমন একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে হইবে, যাহা পূর্ব্বপুরুষেরা করেন নাই, এবং যাহাতে আমারও যথেষ্ট সুনাম হইবে। এখন আমি কি করি?" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরাই চিরকাল যাগ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন; অন্য কাহারও যজ্ঞের সুবিধা করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি এমন কাজ করিবেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা, ইচ্ছামত যাগ যজ্ঞ করিতে পারেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি পৃথিবীর ব্রাহ্মণদিগকে এমনই ধনরত্ন দান করিলেন যে, সূর্য্যবংশে পূর্ব্বে অন্য কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইহার ফল হইল এই যে, কিছুকাল পরে, নরিষ্যন্ত যখন আর একটি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তখন আর পুরোহিত খুঁজিয়া পাইলেন না। যাঁহাকেই ডাকিয়া পাঠান, তিনিই বলেন—"মহারাজ! আমি অন্য একটি যজ্ঞে পুরোহিত হইব বলিয়া কথা দিয়াছি, আপনি অপর কাহাকেও বরণ করুন।" নরিষ্যন্তের যজ্ঞে, অপরিমিত ধনরত্ন পাইয়া, পৃথিবীর ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং রাজার যজ্ঞে পুরোহিতের অভাব হওয়া আর বিচিত্র কি? নরিষ্যন্ত যখন দ্বিতীয়বার যজ্ঞের আয়োজন করিতে চাহিলেন, তখন নাকি পূর্ব্বদিকে আঠার কোটী, পশ্চিমদিকে সাত কোটী, দক্ষিণদিকে চৌদ্দ কোটী এবং উত্তরদিকে পঞ্চাশ কোটী যজ্ঞ হইতেছিল। রাজা নরিষ্যন্তের অত্যাশ্চর্য্য দানের ফলেই, এক সময়ে এতগুলি যজ্ঞের আয়োজন সম্ভব হইয়াছিল! বাস্তবিক, সূর্য্যবংশে অন্য কোন রাজাই নরিষ্যন্তের মত এরূপ দান করিতে পারেন নাই।

নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম ছিল দম। তিনি ইন্দ্রের মত বলবান্ এবং মুনি ঋষির মত দয়াবান্ ও সাধু ছিলেন। রাজা বৃষপর্ব্বা ও দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট, তিনি সকল রকমের ধনুর্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

রাজা চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ংবরে, পৃথিবীর রাজাদিগের নিমন্ত্রণ হইল। রাজপুত্র দমও নিমন্ত্রণ পাইয়া স্বয়ংবর সভায় গেলেন। রাজকুমারী সুমনা দমকেই বরণ করিলেন। ইহাতে, মদ্ররাজপুত্র মহানন্দ এবং বিদর্ভরাজপুত্র বপুষ্মান ও মহাধনু, ইঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তিন জনে মিলিয়া তখন পরামর্শ করিলেন—রাজপুত্র দমের নিকট হইতে সুমনাকে কাড়িয়া লইবেন। পরে সুমনা, তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা, বরণ করিবেন। এই দুষ্ট রাজপুত্রেরা সভাস্থ অপর রাজাদিগকেও উত্তেজিত করিলেন। তখন রাজপুত্র দমের সহিত সকলের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দমের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে অস্থির হইয়া অনেকে প্রাণ হারাইলেন ; আর একা বপুষ্মান্ ছাড়া, অন্য সকলেই পলায়ন করিলেন। বপুষ্মানের সহিত রাজপুত্র দমের অনেকক্ষণ দারুণ যুদ্ধ হইল। শেষে দম, তাহাকে বাণে জর্জ্জরিত করিয়া, মাটিতে ফেলিলেন। ক্ষমাশীল দম, বপুষ্মান্‌কে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দিলেন। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বপুষ্মান্ প্রস্থান করিল। ইহার পর, মহা সমারোহের সহিত দম ও সুমনার বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্র দম সুমনাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ক্রমে রাজা নরিষ্যন্ত বৃদ্ধ হইলে, দমকে সিংহাসনে বসাইয়া, রাণী ইন্দ্রসেনার সহিত তপস্যার জন্য বনে গেলেন।

কিছুকাল পরে, একদিন সেই বিদর্ভরাজপুত্র পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্ লোকজন লইয়া, শিকারের জন্য, সেই বনে উপস্থিত হইল। ঘটনাক্রমে, তপস্বী নরিষ্যন্ত ও রাণী ইন্দ্রসেনাকে দেখিতে পাইয়া, সে জিজ্ঞাসা করিল—"এই ভয়ঙ্কর বনে, স্ত্রীকে লইয়া তপস্যা করিতে আসিয়াছেন—আপনি কে ?" নরিষ্যন্ত তখন মৌনব্রতী থাকায়, রাণী ইন্দ্রসেনাই সে কথার উত্তরে আপনাদের পরিচয় দিলেন।

তপস্বীকে শত্রুর পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, হতভাগা বপুষ্মানের মনে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সে তপস্বী নরিষ্যন্তের জটার মুঠি ধরিল। ইন্দ্রসেনা নিতান্ত কাতর হইয়া, কত মিনতি করিতে লাগিলেন, দুরাচার বপুষ্মান্ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না ! হাতে তলোয়ার লইয়া সে বলিতে লাগিল—"যে আমাকে স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারাইয়া, রাজকন্যা সুমনাকে চুরি করিয়াছে, আজ সেই দমের পিতাকে বধ করিব—দমের যদি ক্ষমতা থাকে, আসিয়া রক্ষা করুক।" এই বলিয়া, সে তৎক্ষণাৎ নরিষ্যন্তের মাথা কাটিয়া ফেলিল ! ইন্দ্রসেনা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বনবাসী ঋষিরা পাপিষ্ঠ

বপুষ্মান্‌কে ধিক্কার দিতে লাগিলেন! এইরূপে, নরিষ্যন্তকে বধ করিয়া, দুরাচার বপুষ্মান্ বন হইতে প্রস্থান করিল।

বপুষ্মান্ চলিয়া গেলে পর, রাণী ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রদাস নামে একজন তাপসকে বলিলেন —"তুমি আমার স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তোমাকে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। আমার পুত্র দমকে গিয়া বল—তুমি রাজা হইয়া পৃথিবী পালন করিতেছ, কিন্তু তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছ না? ধিক্ তোমার রাজত্বে! তোমার পিতা নরিষ্যন্ত তপস্যা করিতেছিলেন, পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্ আসিয়া, বিনা অপরাধে, তাঁহাকে বধ করিয়াছে! আমি তাপসী, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত হইবে না। এখন, তুমি যাহা উচিত মনে কর, তাহাই কর।" এই বলিয়া তাপসকে বিদায় করিয়া, রাণী ইন্দ্রসেনা, পতির মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া, আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

তাপস ইন্দ্রদাস, রাজা দমের নিকট গিয়া, তাঁহার পিতার মৃত্যু কাহিনী ও রাণী ইন্দ্রসেনা যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সমুদয় বর্ণন করিল। এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া, শান্তপ্রকৃতি এবং ক্ষমাশীল দমও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন! রাগে আত্মহারা হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি পুত্র জীবিত থাকিতে, হতভাগা বপুষ্মান্ আমার পিতাকে অনাথের মত বধ করিয়াছে? যদি তার রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তবে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিব। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং অসুরগণও যদি তাহাকে রক্ষা করেন, তবুও তাহার নিস্তার নাই!"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া,রাজা দম অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত বপুষ্মানের সন্ধানে চলিলেন। বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া, বপুষ্মান্‌কে যুদ্ধে আহ্বান করিবামাত্র, সেও সাজিয়া গুজিয়া দমের সম্মুখীন হইল। তখন দম ও বপুষ্মানের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে অতি ভীষণ! অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

দম ক্রুদ্ধ হইয়া যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। দমের বাণের আঘাতে বপুষ্মানের সৈন্যগণ আহত হইয়া পড়িল। বপুষ্মানের সেনাপতি, দমের সম্মুখে আসিবামাত্র, তিনি তাহার বুকে এমন সাংঘাতিক এক বাণ মারিলেন যে, হতভাগ্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল! সেনাপতির মৃত্যুতে, বপুষ্মান্ নিরাশ হইয়া, সৈন্যের সহিত পলায়ন করিলে, দম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"রে দুষ্ট! তুই আমার অসহায় তপস্বী পিতাকে বধ করিয়াছিস্, এখন কাপুরুষের মত পলায়ন করিতেছিস্ কেন? ধিক্ তোর বাহুবলে! তুই না ক্ষত্রিয়? শীঘ্র ফিরিয়া আয়।"

এই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া, বপুষ্মান্ ফিরিয়া আসিল—পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! ক্রুদ্ধ বপুষ্মান্, বাণের পর বাণ মারিয়া, রথশুদ্ধ দমকে ঢাকিয়া ফেলিল। দম, চক্ষের নিমেষে সে বাণ কাটিয়া, একটি মাত্র সাংঘাতিক বাণ মারিয়া, বপুষ্মানের সাত পুত্র ও তাহার ছোট ভাইকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বপুষ্মান্ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বাণের পর বাণ মারিয়া দমকে অস্থির করিয়া দিল। উভয়ে মহা যোদ্ধা! পরস্পরে পরস্পরের বধ ইচ্ছা করিয়া, দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরীর রক্তে লাল হইয়া গেল! তারপর, যুদ্ধ করিতে করিতে, যখন দুই জনেরই ধনু কাটিয়া গেল, তখন খড়গ যুদ্ধ আরম্ভ হইল!

এই সময়ে, বনমধ্যে নিহত পিতাকে স্মরণ করিয়া, দম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে দ্বিগুণ বল আসিল! এবং চক্ষের নিমেষে, দুরাচার বপুষ্মান্‌কে, চুলের মুঠি ধরিয়া, মাটিতে ফেলিয়া, তাহার বুকে চড়িয়া বসিলেন! পরে, খড়গ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"ক্ষত্রিয়াধম বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতেছি—দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য সকলে সাক্ষী থাক!" এই বলিয়া, দম, পাপিষ্ঠ বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিলেন; এবং সেই রক্তে পিতার তর্পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক, রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

রাজার প্রশ্ন

কেন্টারবারির বৃদ্ধ পুরোহিতের মত সুখী কে ? গির্জ্জার পাশেই, অট্টালিকার মত একটা বাড়ীতে, তিনি রাজার হালে থাকেন। অভাব কিছুই নাই, কাজকর্ম্মও বিশেষ কিছু তাঁহাকে করিতে হয় না। বৃদ্ধ হইলেও, যুবকের মত হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল তাঁহার শরীরটি, উজ্জ্বল চোখ দুটি—কপালে ভাবনা চিন্তার রেখাটি পর্য্যন্ত পড়ে নাই ! তাঁহাকে দেখিলে বাস্তবিকই হিংসা হয়।

একবার রাজা জন, ঘোড়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়া, কেণ্টারবারি গির্জ্জার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, পুরুতঠাকুর তাঁহার নন্দনকাননের মত সুন্দর বাগানটিতে বেড়াইতেছেন। রাজা, আড়ালে থাকিয়া, অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া, ভাবিলেন—"বাঃ, পুরুত ঠাকুর ত বেশ সুখে আছেন ! বুড়া হইলেও, কেমন সুস্থ চেহারাখানি ! মুখে দুঃখ কষ্ট, ভাবনা চিন্তার চিহ্নটুকুও নাই ! আর আমি দেশের রাজা হইয়াও কিনা সুখের আস্বাদন পাইলাম না !" ভাবিতে ভাবিতে, রাজার মনে বড় হিংসা হইল, ভাবিলেন—"পুরুতকে একটু ভাবনা লাগাইয়া দিয়া, ব্যস্ত করিতে হইবে।" এই ভাবিয়া রাজা, ঘোড়াটাকে একটা লোকের জিম্মায় রাখিয়া, ঠাকুরের বাগানে ঢুকিলেন।

পুরোহিতকে দেখিয়াই, নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ঠাকুর ! ভাল আছেন ত ? দিনগুলি কাটান কি করিয়া ? কাজকর্ম্ম বুঝি বিশেষ কিছু নাই ?" গোড়াতেই এইরূপ পর পর প্রশ্ন করিয়া রাজা পুরুতকে বেশ ব্যস্ত করিয়া লইলেন। তারপর কথায় কথায় রাজার একটু রাগ হইল, তিনি একটু কড়া সুরে বলিলেন—"ঠাকুর ! আমার আরও তিনটি প্রশ্ন করিবার আছে। যদি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পার, তবেই কাজে বহাল থাকিবে। নতুবা তোমাকে, উল্টামুখে গাধায় চড়াইয়া, সহরের চারিদিকে ঘুরাইব !"

রাজার কথা শুনিয়া, পুরুতঠাকুরের চক্ষুস্থির ! ভয়ে বেচারি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়া, রাজা, মনে মনে ভারী খুসী হইয়া, বলিলেন—"শুন ঠাকুর ! তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করিব, আর তিন মাস সময় দিব। এই সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারিলেই, উল্টা গাধায় চড়িয়া সহর ঘুরিতে হইবে !" পুরুত ঠাকুর জানিতেন যে, তাঁহার বুদ্ধি তেমন চোখা নয় ! উল্টা গাধায় চড়াইয়া, সহর ঘুরাইবার কথা ভাবিয়া, তিনি এমনই ঘাবড়াইলেন যে, জীবনে

তেমন কখনও ঘাবড়ান নাই! রাজা আরও খুসী হইয়া বলিলেন—"শুন, প্রথম প্রশ্ন এই—সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিতে আমার কত সময় লাগিবে? একেবারে মিনিট, সেকেণ্ড পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া বলিতে হইবে।"

প্রশ্ন শুনিয়া, পুরুত ঠাকুরের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল! রাজা হাসিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—"রাজার পোষাক পরিয়া, মাথায় মুকুট দিয়া, রাজদণ্ড লইয়া সিংহাসনে বসিলে, আমার মূল্য কত হইবে? একেবারে, কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া বলা চাই।" তারপর, রাজা বলিলেন—"এই দুই প্রশ্নের যখন উত্তর দিবে, সে সময় আমি মনে মনে কি ভাবিতেছি, তাহা বলিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমি যাহা ভাবিব, তাহা যে ভুল—সেটাও তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। ইহাই আমার তৃতীয় প্রশ্ন।"

প্রশ্নের পর, পুরোহিতের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না! রাজা ভারী খুসী! প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে, যে শাস্তির ব্যবস্থা হইবে, পুরোহিতকে আবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া, রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

বেচারি পুরোহিতের মনের শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। রাতদিন কেবলই সেই দারুণ প্রশ্নের চিন্তা—না আছে আহার, না আছে নিদ্রা! রাজ্যের জ্ঞানী, গুণী—কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না! ক্রমে এক মাস কাটিয়া গেল। দুই মাস পূর্ণ হইয়া, তৃতীয় মাস শেষ হইতে চলিল—পুরোহিত একেবারে নিরাশ হইলেন।

তাঁহার এই দুরবস্থার সময়, হঠাৎ একদিন, তাঁহার পরিচিত এক কৃষক আসিয়া বলিল—"প্রণাম হই ঠাকুর! আপনাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? খুলিয়া বলুন। শুনিয়াছি, ইঁদুরও নাকি সিংহের উপকার করিয়াছিল। হয়ত বা, আমার মত সামান্য লোকের দ্বারাও, আপনার উপকার হইতে পারে।"

দুঃখ বিপদের সময়, সামান্য লোকের নিকট হইতেও সহানুভূতি পাইলে, মনে আশা হয়। পুরোহিত ঠাকুর কৃষককে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন। আরও বলিলেন—"তিন মাস ত শেষ হইতে চলিল—এখনও পর্য্যন্ত প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইল না! দেখিতেছি, বুড়া বয়সে আমার ভাগ্যে নিতান্তই অপমান লেখা আছে!"

মুখখানি গম্ভীর করিয়া কৃষক বলিল—"ঠাকুর! আমি নিতান্ত সামান্য লোক হইলেও, আমার বিশ্বাস আপনার প্রশ্ন তিনটির উত্তর আমি দিতে পারিব। অনুগ্রহ

করিয়া, পুরোহিতের পোষাকটি, আর আপনার এই ক্রুস্‌টি আমাকে দিন। বিচারের দিনে আপনার বদলে আমি রাজার দরবারে উপস্থিত হইব।"

কৃষকের মুখ, নাক, চোখ ও চেহারার সহিত পুরোহিত ঠাকুরের এতই সাদৃশ্য ছিল যে, হঠাৎ পুরোহিতের পোষাকে তাহাকে দেখিলে, সকলেরই ভুল হইবার সম্ভাবনা! এই সাদৃশ্য দেখিয়া, পুরোহিতের মনেও কেমন জানি একটু আশা হইল। তিনি ভাবিলেন—"প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে, ইহাকেই ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে! আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাঁচিয়া যাইব!" এদিকে, কৃষকও যখন তাঁহাকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন পুরোহিত সম্মত হইয়া তাহাকে পোষাক ও ক্রুস্‌টি দিলেন।

তিন মাসের শেষ দিনে, রাজা সভায় বসিয়া আছেন। সেই প্রশ্নের কথা তাঁহার মনেই নাই। এমন সময় দূত আসিয়া বলিল—"মহারাজ! কেণ্টারবারির পুরোহিত ঠাকুর আসিয়াছেন।" হঠাৎ রাজার সব কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি পুরোহিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পুরোহিত আসিলে, রাজা বলিলেন—"কি ঠাকুর! আছ কেমন? তোমাকে যে বড় রোগা দেখিতেছি? প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়াছ কি? যদি না করিয়া থাক, শাস্তির কথাটা মনে রাখিও।" একথা বলিয়া, রাজা পুরোহিতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কি আশ্চর্য্য! সে মোটেই ঘাবড়ায় নাই, বুক টান করিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। রাজা ত একেবারে অবাক্!

তখন পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ! উত্তর ঠিক হইয়াছে, এবং তাহা বলিতেই আসিয়াছি।"

রাজা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা বেশ! প্রথমে, বল দেখি—পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগিবে? ধীরে, আস্তে বল—আমি ঠিক উত্তর চাই।"

"মহারাজ! সূর্য্য উদয়ের সময় প্রস্তুত হইয়া, সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, তেমনই তাড়াতাড়ি চলিতে থাকিবেন। তাহা হইলে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় যে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারিবেন—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।"

এই উত্তর শুনিয়া, রাজা এমনই আশ্চর্য্য হইলেন যে, ক্ষণকাল তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। উত্তরে কোনও ভুল নাই দেখিয়া, তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন—

"এই, যেমন আমি সিংহাসনে বসিয়া আছি, ঠিক এই অবস্থায়—বল দেখি, আমার মূল্য কত?"

একটুও না ঘাবড়াইয়া পুরোহিত উত্তর করিলেন—"প্রভু যীশু ত্রিশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছেন।* মহারাজ! আপনি প্রভু যীশুর তুল্য নহেন—সুতরাং আপনার মূল্য উনত্রিশ টাকা ধার্য্য করিলাম।"

এ উত্তর শুনিয়া রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু উত্তরে কোন ত্রুটি না দেখিতে পাইয়া, একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন—"দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ। এখন আমার তৃতীয় প্রশ্ন বাকি আছে। ইহার উত্তর না দিতে পারিলেই, উল্টা গাধায় চড়াইব। তৃতীয় প্রশ্ন এই—বল দেখি, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি কি ভাবিতেছি?"

"আপনি ভাবিতেছেন যে, আমিই সেই কেণ্টারবারির পুরোহিত।"

রাজা জন্ বলিলেন—"নিশ্চয়ই! আমি ঠিক তাই ভাবিতেছি। এখন প্রমাণ কর দেখি—সেটা ভুল!

কৃষক, চক্ষের নিমেষে, পুরোহিতের পোষাক ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তবে, এই দেখুন মহারাজ! আমি তা নই, আপনি ভুলই ভাবিয়াছেন।" রাজা ত একেবারে অবাক্! সভাশুদ্ধ সকলেই অবাক্! তখন কৃষকের সহিত পুরোহিতের

* জুডাস্ নামে এক ব্যক্তি ত্রিশটাকার লোভে যীশুকে শত্রুর হাতে দিয়াছিল।

আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিয়া, রাজা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, এবং কৃষককে বলিলেন—"বলিহারি তোমার সাহস ও বুদ্ধি! যাহা হউক, আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন বল দেখি, তুমি কি পুরস্কার চাও? আমি তাহাই দিব। তুমি ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে কেণ্টারবারির পুরোহিতও করিতে পারি।"

সাধু কৃষক বলিল—"মহারাজ! আপনি যখন দয়া করিয়া বলিয়াছেন—আমি যাহা চাই, তাই দিবেন—তখন অনুগ্রহ করিয়া হুকুম দিন, পুরোহিত ঠাকুর কেণ্টারবারির পুরোহিতই থাকুন; এবং আপনার প্রসাদে, চিরজীবন তিনি নির্ভাবনায় বাস করুন।"

কৃষকের মহত্ত্ব দেখিয়া, রাজা ভারী সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পোষা জন্তু

কথায় বলে,

"যত্নে পড়ে বনের পাখী,
চেষ্টা কর্‌লে হয় না বা কি?"

এটা খুবই সত্যি। বনের পশু পাখী গোড়ায় যতই 'জংলী' আর হিংস্র হোক না কেন, মানুষের বুদ্ধির কৌশলে আর যত্নে শেষটায় তাকে পোষ মান্‌তেই হয়।

বাঘের মত হিংস্র জন্তু আর কি আছে? কিন্তু সেই বাঘই পোষ মেনে কেমন নিরীহ হয়েছে দেখ! ছবিতে দেখ চিতাবাঘ খোকার পাশে কেমন চুপচাপ ব'সে আছে—যেন কতই ভদ্রলোক! লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা নেকড়ে বাঘ আছে, তাকে ডাকলে সে এগিয়ে আসে, আর গায়ে হাত বুলালে তার বড় আহ্লাদ হয়। ছেলেবেলায় একটা কুকুরীর কাছে, কুকুরছানার সঙ্গে মানুষ হবে ব'লে, তাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কুকুরছানার সঙ্গে থেকে, তার সঙ্গে বড় হয়ে, দু'জনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। কিন্তু হিংস্র জন্তুর স্বভাব কখনও যায় না। একদিন সকালে দেখা গেল যে দু'জনে ঝগড়া আরম্ভ করেছে। তারপর নেকড়েটা কুকুরটাকে এমন হিংস্রভাবে আক্রমণ কর্‌ল যে লোকজন এসে ছাড়িয়ে না দিলে কুকুরটাকে মেরেই ফেল্‌ত। সিংহও বেশ পোষ মানে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা সিংহের ছানা ছিল, সে তার রক্ষকের কোলে চ'ড়ে বোতলে করে দুধ খেতো, আর তার সঙ্গে খুব ভাব ক'রে নিয়েছিল। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা সিংহ ছিল, সেও বেশ পোষ মেনেছিল।

ওখানকার একটি ভদ্রলোক একদিন তাকে ডাক্‌লেন আর অম্‌নি সে খাঁচার ধারে এসে, রেলিংএর উপর গা ঘষ্‌তে লাগ্‌ল। ভদ্রলোকটি তার গায়ে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন আর সিংহটাও খুসী হয়ে লেজ নাড়তে লাগ্‌ল। ভালুকছানাও বড় সহজে পোষ মানে, আর নানারকম তামাসা করতে শেখে।

১। চিতা বাঘ ২। উটপাখী ৩। 'সীল্' ৪। অজগর ৫। ভাল্লুক ৬। কুমীরছানা ৭। নেকড়ে ৮। ওরাংওটাং ও সিম্পাঞ্জি ৯। পেঁচা

সাপুড়ে সাপ নিয়ে কত খেলা করে দেখেছ তো? অনেক সাপ তাদের খুব পোষা হয়ে যায়। ছবিতে দেখ, একটা অজগর কেমন একটি সাহেবের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে! সাপেরা বড় খামখেয়ালী। হঠাৎ একদিন হয় তো সে খাওয়া দাওয়াই বন্ধ ক'রে দেবে; আর, যদি তাকে জোর ক'রে না খাওয়াও, তবে সে না খেয়ে ম'রেই যাবে! অজগরকে জোর ক'রে খাওয়ানও তো কম ব্যাপার নয়! অজগরের বিষ নাই বটে,

কিন্তু তার একটি বদ অভ্যাস আছে—হঠাৎ ভয় টয় পেলে সে চট্ ক'রে তার শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে। স্পেন দেশে একজন লোক সাপের খেলা দেখাত; একদিন সাপটা তার গায়ে পাক দিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ শরীরটাকে গুটিয়ে তাকে এমনি চেপে ধরল যে লোকটা তৎক্ষণাৎ মারা পড়ল!

একটা কুমীর ছিল, তার নাম ছিল "ডিক্"। তাকে নাম ধ'রে ডাক দিলে সে বুঝ্তে পার্‌ত, আর আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌ত। এক সাহেবের কুমীর পোষা সখ ছিল। তিনি তাঁর বাড়ীতে ছোট বড় নানারকম কুমীর পুষে রীতিমত 'কুমীরখানা' বসিয়েছিলেন!

বাঁদরেরা যেমন পোষ মানে, আর কোন জন্তুই বোধ হয় অমন পোষ মানে না। মানুষের মত চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, কাজ কর্ম্ম সবই তারা কর্‌তে পারে। অনেক কথাও তারা বুঝ্তে পারে। 'সিম্পাঞ্জি' আর 'ওরাং ওটাং', এই দুই জাতের বাঁদরই সব চেয়ে বেশী পোষ মানে, আর সব চেয়ে চালাক হয়।

পেঁচাকে কখনও পোষ মান্‌তে দেখেছ? তার চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় যে সে কখনই পোষ মান্‌বে না; কিন্তু মানুষের চেষ্টা যত্নে পেঁচাও পোষ মেনে যায়।

পোষা জন্তুর কথা বল্‌তে গেলে হাতী গণ্ডার সিন্ধুঘোটক থেকে ছুঁচো ব্যাং টিকটিকি পর্য্যন্ত প্রায় সব জানোয়ারেরই নাম কর্‌তে হয়। পৃথিবীতে যত জাতের জন্তু আর পাখী আছে, তার অধিকাংশই মানুষের কাছে পোষ মেনেছ—বাকি যারা আছে, তারাও হয় তো কালে মানুষের পোষ মেনে যাবে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

পালোয়ান

তাহার আসল নামটি যে কি ছিল, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি—কারণ আমরা সকলেই তাহাকে "পালোয়ান" বলিয়া ডাকিতাম। এমন কি মাষ্টার মহাশয়েরা পর্য্যন্ত তাহাকে "পালোয়ান" বলিতেন। কবে কেমন করিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইল, তাহা মনে নাই; কিন্তু নামটি যে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, একথা স্কুলশুদ্ধ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত।

প্রথমত, তাহার চেহারাটি ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। মোটাসোটা হাত পা, ব্যাঙের মত গোব্‌দা গলা—তাহার উপরেই গোলার মত মাথাটি—যেন

ঘাড়ে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। তার উপর সে কলিকাতায় গিয়া স্বচক্ষে কাল্লু ও করিমের লড়াই দেখিয়া আসিয়াছিল, এবং বড় বড় কুস্তির এমন আশ্চর্য্য রকম বর্ণনা দিতে পারিত, যে শুনিতে শুনিতে আমাদেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এক এক দিন উৎসাহের চোটে আমরাও তাল ঠুকিয়া স্কুলের উঠানে কুস্তি বাধাইয়া দিতাম। পালোয়ান তখন পাশে দাঁড়াইয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাদের প্যাঁচ ও কায়দা বাৎলাইয়া দিত। মাখনলাল আমার চাইতে আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু পালোয়ানের কাছে "ল্যাংমুচ্‌কির" প্যাঁচ শিখিয়া সে যেদিন আমায় চিৎপাত করিয়া ফেলিল, সেই দিন হইতে সকলেরই এই বিশ্বাস পাকা হইল যে পালোয়ান ছোকরাটা আর কিছু না বুঝুক কুস্তিটা বেশ বোঝে।

ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলা বেজায় ডানপিটে। খামখা এক একদিন আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া তাহারা ঝগড়া বাধাইত। মনে আছে, একদিন ছুটির পরে আমি আর পাঁচ সাতটি ছেলের সঙ্গে গোঁসাইবাড়ীর পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি পাঠশালার চারটা ছোকরা ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছে। একটা ঢিল আরেকটু হইলেই আমার গায়ে পড়িত। আমরা দলে ভারি ছিলাম, সেই সাহসে আমাদের একজন ধমক দিয়া উঠিল, "এইও, বেয়াদব! মানুষ চোখে দেখিস্‌নে?" ছোকরাদের এমনি আস্পর্দ্ধা, একজন অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, মানুষ দেখি, বাঁদরও দেখি"!—শুনিয়া সব কটায় অসভ্যের মত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ানক রাগ হইল, আমি আস্তিন গুটাইয়া বলিলাম, "পরেশ! দে ত আচ্ছা ক'রে ঘা দুচ্চার কষিয়ে।" পরেশও দমিবার পাত্র নয়, সে হুঙ্কার দিয়া বলিল "গুপে, আন্‌ত ওই ছোক্‌রাটার কাণে ধ'রে"। গোপীকেষ্ট বলিল, "আমার হাতে বই আছে—ওরে ভূতো, তুই ধর দেখি একবার চেপে—"। ভূতোর বাড়ী বাঙাল দেশে—তার মেজাজটি যখন মাত্রায় চড়ে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—সে একটা ছোকরার কাণে প্রকাণ্ড এক কীল বসাইয়া দিল। কীল খাইয়াই সে হতভাগা একেবারে "গোব্‌রা দা" বলিয়া চীৎকার দিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিন জনও "গোবরাদা', গোবরাদা" বলিয়া এমন একটা হৈ চৈ রব তুলিল, যে আমরা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া রহিলাম। এমন সময় একটা কুচকুচে কাল মূর্ত্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া ভূতোর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া, গুপের কাণ মলিয়া, আমার গালে খামখা ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড় লাগাইয়া

দিল। তারপর কাহার কি হইল আমি খবর রাখিতে পারি নাই। মোট কথা, সেদিন আমাদের যতটা অপমান বোধ হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল তাহার চাইতেও বেশী। সেই হইতে গোবরার নাম শুনিলেই ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া আসিত।

পালোয়ানের কেরামতির পরিচয় পাইয়া আমাদের মনে ভরসা আসিল। আমরা ভাবিলাম, এবার যেদিন পাঠশালার ছেলেগুলা আমাদের ভ্যাংচাইতে আসিবে, তখন আমরাও আরো বেশী করিয়া ভ্যাংচাইতে ছাড়িব না। পালোয়ানও একথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার আর কোন মতলব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। আমরা বলিতে লাগিলাম "ওরা নিশ্চয়ই পালোয়ানের কথা শুন্‌তে পেয়েছে।" পালোয়ান বলিল—"হ্যাঁ, তাই হবে। দেখছ না, এখন আর বাছাদের টুঁ শব্দটি নেই।" তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিলাম যে পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া গোবরার দলের সঙ্গে ভাল রকম বোঝা পড়া করিতে হইবে।

শনিবার দুইটার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে, এমন সময় কে যেন আসিয়া খবর দিল যে গোবরা চার পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পুকুর পাড়ে বসিয়া গল্প করিতেছে। যেমন শোনা অমনি দলেবলে হৈ হৈ করিতে করিতে সেখানে হাজির! আমাদের ভাবখানা দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে আমরা কেবল বন্ধুভাবে আলাপ করিতে আসি নাই। তাহারা শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই আমরা তিন চার জনে মিলিয়া গোবরাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম। সকলেই ভাবিলাম, এ যাত্রায় গোবরার আর রক্ষা নাই। কিন্তু আহাম্মক রামপদটা একেবারে সব মাটি করিয়া দিল। সে বোকারাম ছাতা হাতে হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছিল, এমন সময় পাঠশালার একটা ছোকরা এক থাবড়া মারিয়া তাহার ছাতাটা কাড়িয়া লইল। আমরা ততক্ষণে গোবরা-চাঁদকে প্রায় চিৎপাত করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় হটাৎ আমাদের ঘাড়ে পিঠে ডাইনে বাঁয়ে ধপাধপ্ ছাতার বৃষ্টি সুরু হইল। আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, আর সেই ফাঁকে গোবরাও একলাফে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তাহার পর চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাদের চার পাঁচজনকে ধরিয়া পুকুরের জলে ভাল রকমে চুবাইয়া রীতিমত নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদের সময় আমাদের দলের আর সকলে কে যে কোথায় পলাইল, তাহার আর কিনারাই করা গেল না। সব চাইতে আশ্চর্য্য এই যে, ইহার মধ্যে পালোয়ান যে কখন নিরুদ্দেশ

হইল,—তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদের গলা ফাটিয়া গেল, তবু তাহার সাড়া পাইলাম না।

সোমবার স্কুলে আসিয়াই আমরা হাঁ হাঁ করিয়া পালোয়ানকে ঘিরিয়া ফেলিলাম, কিন্তু সে যে কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া এমন বোধ হইল না। সে খুব বোলচাল দিয়া লম্বা বক্তৃতা করিয়া বলিল—"তোরা যে এমন আনাড়ি, তা জানলে কি আমি তোদের সঙ্গে যাই ? আচ্ছা, গোবরা যখন তোর টুঁটি চেপে ধরল, তখন আমি যে 'ডানপট্‌কান দে' ব'লে এত চেঁচালাম—কৈ, তুইত তার কিছুই করলি না। আর ঐ গুপেটা, ওকে আমি এতবার বলেছি যে ল্যাং মুচকি মারতে হ'লে পাল্‌টা রোখ্ সাম্‌লে চলিস্—তাত ও শুনবে না! এ রকম কর্‌লে আমি কি করব বল্ ? ও সব দেখে আমার একেবারে ঘেন্না ধ'রে গেল—তাই বিরক্ত হয়ে চ'লে এলুম। তারপর ভূতোটা, ওটা কি করল বল্ দেখি! আরে, দেখ্‌ছিস্ যখন দোরোখা প্যাঁচ্ মারছে, তখন বাপু আহ্লাদ ক'রে কাৎ হ'য়ে পড়তে গেলি কেন ?"—ভূতো এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু পালোয়ানের এই টিপ্পনী কাটা-ঘায়ে নূনের ছিটার মত তাহার মেজাজের উপর ছ্যাঁক্ করিয়া লাগিল। সে গলায় ঝাঁকড়া দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল "তুমি বাপু কানকাটা কুকুরের মত পলাইছিলা ক্যান্ ?" সর্ব্বনাশ! পালোয়ানকে "কানকাটা কুকুর" বলা! আমরা ভাবিলাম "দেখ, বাঙাল মরে বুঝি এবার!" পালোয়ান খুব গম্ভীর হইয়া বলিল "দেখ্ বাঙাল! বেশী চালাকি করিস্ ত চর্‌কী প্যাঁচ লাগিয়ে একেবারে তুর্কী নাচন নাচিয়ে দেব!" ভূতো বলিল "তুমি নাচলে বান্দর নাচবা।" রাগে পালোয়ানের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেঞ্চি ডিঙাইয়া একেবারে বাঙালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তারপর দুইজনে কেবল হুড়াহুড়ি আর গড়াগড়ি। আশ্চর্য্য এই, পালোয়ান এত যে কায়দা আর এত যে প্যাঁচ আমাদের উপর খাটাইত, নিজের বেলায় তার একটিও তাহার কাজে আসিল না। ঠিক আমাদেরই মত হাত পা ছুঁড়িয়া সে খামচাখামচি করিতে লাগিল। তারপর বাঙাল যখন তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, তখন আমরা সকলে মিলিয়া দুজনকে ছাড়াইয়া দিলাম। পালোয়ান হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চে বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিল "ছেলেবেলায় এই ডানহাতের কব্জিটা জখম হ'য়েছিল—তাই বড় বড় প্যাঁচ্‌গুলো দিতে ভরসা হয় না—কি জানি হাতটা যদি আবার মচ্‌কে ফচ্‌কে যায়! তা নৈলে ওকে একবার দেখে নিতুম।"

ভূতো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার নাকের সামনে একবার বেশ করিয়া "কাঁচকলা" দেখাইয়া লইল।
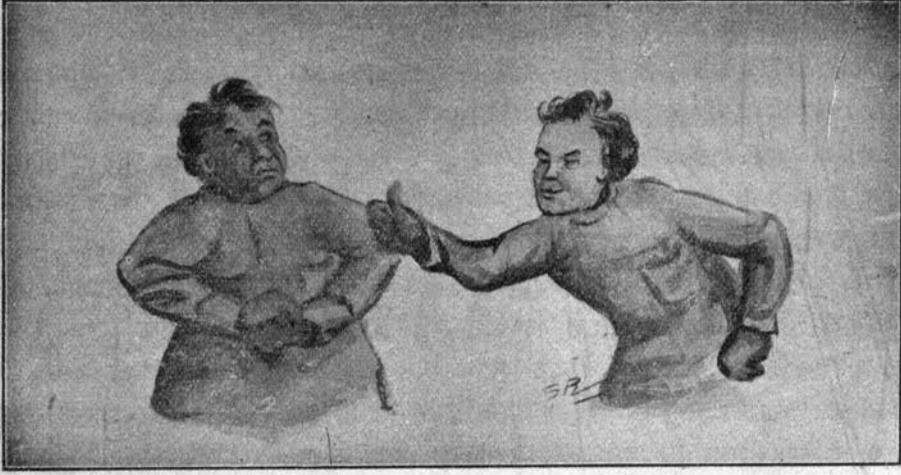
ভূতো ছেলেটি দেখিতে যেমন রোগা এবং বেঁটে, তার হাত পা গুলিও তেমনি লট্‌খটে, সুতরাং পালোয়ানের পালোয়ানী সম্বন্ধে অনেকের যে আশ্চর্য্য ধারণা ছিল, সেই দিনই তাহা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচিল না সেটি শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল।

আর্কিমিডিস্।

প্রায় বাইশ শত বৎসর আগে গ্রীস্ সাম্রাজ্যের অধীন সাইরাকিউস্ নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিসের মত অসাধারণ পণ্ডিত সে কালে গ্রীক্ জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয়ত ছিলই না—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সমান কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। দিন রাত তিনি আপনার পুথিপত্র লইয়া কি যে চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, আর অঙ্ক কষিয়া কষিয়া কত যে আশ্চর্য্য তত্ত্বের হিসাব করিতেন, লোকে তাহার কিছুই বুঝিত না—কেবল দুদশজন পণ্ডিত লোকে পরম আগ্রহে আদর

করিয়া তাহার সংবাদ লইত, আর অবাক হইয়া বলিত, "পণ্ডিতের মত পণ্ডিত যদি কেউ থাকে, তবে সে হ'চ্ছে আর্কিমিডিস্!"

সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো ছিলেন আর্কিমিডিসের বন্ধু। তিনি কেবলই বলিতেন, "এত বড় পণ্ডিত হইয়া তোমার কি লাভ হইল, যদি লোকে তোমার কদর না বোঝে? তুমি কেবল বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব নিয়া থাক; মানুষের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্র করিয়া দেখাও—লোকে বুঝুক তুমি কত বড় পণ্ডিত!" বন্ধুর কথায় আর্কিমিডিস্ মাঝে মাঝে "কেজো জিনিষ" গড়িবার দিকে মন দিতেন। তাহার ফলে নানারকম 'স্ক্রু', জল তুলিবার জন্য প্যাঁচাল 'পাম্প,' জলে-চালান বাতাসে-চালান কতরকম যন্ত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। পাখা টানিবার জন্য দেয়ালে যে চাকার 'পুলি' খাটান থাকে, সেই পুলি জিনিষটাও আর্কিমিডিসের আবিষ্কার। বড় বড় মাল পত্র বোঝাই হইয়া এত যে কলের গাড়ী আর এত যে জাহাজ পৃথিবীময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বড় বড় কারখানায় এত যে ভারি ভারি কল কামান লোহালক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সবখানেই দেখিবে মাল উঠানামার জন্য 'পুলি' না হইলে চলে না। মূর্খ লোকে যখন আর্কিমিডিসের কলকব্জার পরিচয় পাইল, তখন তাহারাও ভাবিতে লাগিল, "লোকটা পণ্ডিত বটে।"

আর্কিমিডিসের জীবনের একটি গল্প তোমরা বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবে। রাজা হীয়েরো এক সেকরার কাছে একটি সোনার মুকুট গড়াইতে দিয়াছিলেন। সেকরা মুকুটটি গড়িয়াছিল ভালই, কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, সে সোনা চুরি করিয়াছে এবং সেই চুরি ঢাকিবার জন্য মুকুটের মধ্যে খাদ মিশাইয়াছে। কোন সহজ উপায়ে এই চুরি ধরা যায় কিনা, জানিবার জন্য তিনি বন্ধু আর্কিমিডিস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর্কিমিডিস্ সব শুনিয়া বলিলেন, "একটু ভাবিয়া বলিব।" ভাবিতে ভাবিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন স্নানের সময়ে কাপড় ছাড়িয়া সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়াছেন, এমন সময় খানিকটা জল উছলিয়া পড়ামাত্র, হঠাৎ সেই প্রশ্নের এক চমৎকার মীমাংসা তাঁহার মাথায় আসিল! তখন কোথায় গেল স্নান! তিনি তৎক্ষণাৎ "Eureka! Eureka!" (পেয়েছি! পেয়েছি!) বলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

যে জিনিষ পাইয়া তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানে এখনও তাহাকে "আর্কিমিডিসের তত্ত্ব" বলা হয়। ভারি জিনিষকে জলে ছাড়িলে তাহার

'ওজন' কমিয়া যায় ; কি পরিমান কমিবে তাহাও হিসাব করিয়া বলা যায়। কোন হাল্কা জিনিষকে জলে ভাসাইলে, তাহার খানিকটা ডোবে, খানিকটা ভাসিয়া থাকে। ঠিক কতখানি ডোবে তাহারও হিসাব আছে। আর্কিমিডিসের তত্ত্বে এই সকল কথারই আলোচনা করা হইয়াছে। আর্কিমিডিস্ রাজাকে বলিলেন, "ঐ মুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোনা লইয়া একটা জলভরা পাত্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। পাত্রের মধ্যে মুকুটটা ডুবাইয়া দিলে কতখানি জল উছলিয়া পড়ে, তাহা মাপিয়া দেখুন, তার পর আবার জল ভরিয়া সেই ওজনের একতাল সোনা ডুবাইয়া দেখুন কতটা জল প'ড়ে। মুকুট যদি খাঁটি সোনার হয়, তবে দুই বারেই ঠিক একই পরিমাণ জল বাহির হইবে। যদি খাদ মিশান থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড় হইবে, সুতরাং তাহাতে বেশী জল ফেলিয়া দিবে।"

কোন কোন চশমার কাচ এমন থাকে যে তাহাতে অনেকখানি সূর্য্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরিয়া আনা যায়। সেই রকম কাচ বেশ বড় করিয়া বানাইলে তাহার মধ্যে রোদ ধরিয়া আগুণ জ্বালান চলে। সরার মত গর্ত্তওয়ালা আরশি দিয়াও এই কাজটি করান যায়। আর্কিমিডিস্ এই রকম আরশিও বানাইয়াছিলেন। শোনা যায়, রোমের যুদ্ধ জাহাজ যখন সাইরাকিউস্ আক্রমন করিতে আসে, তখন তিনি এই রকম আরশি দিয়া কড়া রোদ ফেলিয়া, তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেন। কেবল তাহাই নয়, রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্য সামন্ত লইয়া সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসেন, তখন আর্কিমিডিস্ নগর রক্ষার জন্য নানারকম অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধযন্ত্রের আয়োজন করিলেন। সে সকল যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া রোমীয় সৈন্য বহুদিন পর্য্যন্ত নগরের কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় নাই। তাহার পরে কত যুগ যুগ ধরিয়া দেশে দেশে আর্কিমিডিসের অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা লোকের মুখে শোনা যাইত।

রোমীয় সৈন্যেরা সে সকল যুদ্ধ যন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা পড়িলে বেশ বুঝা যায়, সেগুলি তাহাদের মনে কি রকম ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল। বড় বড় থামের মত চূড়া হঠাৎ দেয়ালের উপর মাথা তুলিয়া হুড়্ হুড়্ করিয়া শত্রুর উপর রাশি রাশি পাথর ছুঁড়িয়া মারে, আবার পর মুহূর্ত্তেই দেয়ালের পিছনে ডুব মারে। বড় বড় কলের ধাক্কায় কড়ি বরগা ছুটিয়া শত্রুর জাহাজে গিয়া পড়ে, দূর হইতে প্রকাণ্ড নখাল সাঁড়াশি চালাইয়া শত্রুর জাহাজ উপড়াইয়া আনে ! এ সকল দেখিয়া রোমের সৈন্য আর রোমের জাহাজ নগর ছাড়িয়া দূরে হটিয়া গেল। মার্সেলাস্ বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া সাইরাকিউস্

দখল করা কাহারও সাধ্য নয়। তোমরা পথঘাট আটকাইয়া এই খানেই বসিয়া থাক। নগরের খাদ্য যখন ফুরাইবে, তখন আপনা হইতেই ইহারা হার মানিবে”। প্রায় তিন বৎসর বিনাযুদ্ধে রোমীয়েরা সাইরাকিউসের চারিদিক ঘেরিয়া রাখিল। তারপর নগরের লোকেদের যখন না খাইয়া মারা যাইবার মত অবস্থা হইল, তখন সাইরাকিউস্ দখল করা সহজ হইয়া আসিল। মার্সেলাস হুকুম দিলেন, “যাও, নগর লুট করিয়া আন। কিন্তু খবরদার, আর্কিমিডিসের কোন অনিষ্ট করিও না”।

আর্কিমিডিস্ তখন কি একটা হিসাব করিতেছেন,—নগরে কোথায় কি ঘটিতেছে,
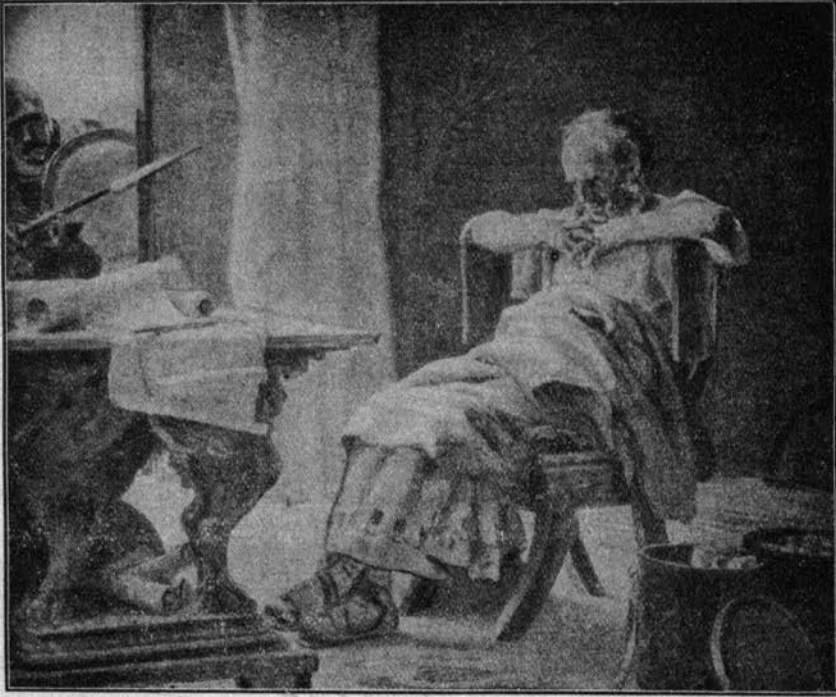
তাঁহার হুঁস্‌ও নাই। কতগুলা অঙ্ক ও রেখা কষিয়া তাহারই চিন্তায় তিনি ডুবিয়া আছেন। রোমীয় সৈন্যেরা সেই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমিডিস্ বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার চিন্তার মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে সেকথা তাঁহার কাণেই গেল না। তিনি একবার খালি হাত তুলিয়া বলিলেন "হিসাবে ব্যাঘাত দিও না।" মূর্খ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তাঁহার জীবনের শেষ হিসাব আর সম্পূর্ণ হইল না—তাঁহারই রক্তধারায় সে হিসাব মুছিয়া ফেলিল! কি তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন, তাহা জানিবারও আর কোন উপায় নাই।

আর্কিমিডিসের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মার্সেলাসের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি পরম যত্নে আর্কিমিডিসের কবরের উপর অতি সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর দুই হাজার বৎসর চলিয়া গেল, মানুষের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানবীর মহাপুরুষের নাম এখনও অমর হইয়া আছে।

বিদ্যুৎ মৎস্য

এক এক রকম জানোয়ারের এক এক রকম অস্ত্র। কেউ শিং দিয়া গুঁতায়, কেউ নখ দিয়া আঁচড়ায়; কেউ দেয় দাঁতের কামড়, কেউ মারে হুলের খোঁচা। কাঙ্গারুর ল্যাজের ঝাপ্‌টা, ঈগলের ধারাল ঠোঁট, অস্ত্র হিসাবে এগুলিও বড় কম নয়। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য্য অস্ত্র আছে এক রকম বা'ন্ মাছের গায়ে। তোমরা কেউ 'ব্যাটারির' 'শক্' (Shock) খেয়েছ কি? কিম্বা খোলা বিদ্যুতের তারে ভুলে হাত দিয়েছ কি? এই মাছকে ধরতে গেলে গায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে।

এই অদ্ভুত মাছকে ইংরাজিতে বলে Electric Eel অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক ঈল্'। বা'ন্ মাছের মত চেহারা, সাপের মত লম্বা, মুখে ধারাল দাঁত,—এক একটি ঈল্ পাঁচ ছয় হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। এই জাতীয় মাছ পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলিতে বিদ্যুতের তেজ দেখা যায় সেগুলি থাকে কেবল আমেরিকার বড় বড় নদীর ধারে কাছে। এক একটা ঈলের এমন আশ্চর্য্য তেজ, তারা বিদ্যুৎ চালিয়ে অন্য মাছদেরত মেরে ফেলেই, এমন কি, বড় বড় জানোয়ারগুলোকেও এক এক সময় তারা অস্থির ক'রে তোলে। গরু ঘোড়া পর্য্যন্ত কত সময়ে জল খেতে নেমে ঈলের পাল্লায় প'ড়ে যন্ত্রণায় লাফালাফি করতে থাকে। সে দেশের লোকেরা রীতিমত বর্শা বল্লম নিয়ে এই মাছ শিকার করে, কারণ কোন রকমে তার গায়ে গা ঠেক্‌লেই

বড় বড় জোয়ান মানুষকেও বাপরে মারে ক'রে চেঁচাতে হয়। একবার কতগুলা ঘোড়া একটা বিলের মধ্যে জল খেতে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় ৪০।৫০টা বড় বড় ঈল এক জায়গায় জড় হ'য়ে ছিল। ঘোড়াগুলো তার মাঝখানে প'ড়েই চীৎকার ক'রে লাথি ছুঁড়ে ডাঙ্গায় পালিয়ে আস্‌ল। কিন্তু একটা ঘোড়া তার মধ্যে একটু বেশী কাহিল হ'য়েছিল, সেটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ঈলগুলাও অবশ্য লাথির চোটে সেখানে বেশীক্ষণ টিক্‌তে পারেনি।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র এরা কেমন ক'রে ব্যবহার করে, আর কেমন ক'রে তাদের শরীরের মধ্যে এতখানি বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা এখনও পণ্ডিতেরা খুব স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারেন নি। মাছটাকে ধ'রে চির্‌লে পরে দেখা যায়, তার শিরদাঁড়ার দুই পাশে পিঠ থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত ছোট ছোট কোষ, তার মধ্যে এক রকম আঠাল রস; এইটিই তার বৈদ্যুতিক অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হ'লে সে কেবল তার শরীরটাকে বাঁকিয়ে ল্যাজ আর মাথা শত্রুর গায়ে ঠেকিয়ে দেয়।

কয়েকবার ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার কর্‌লে মাছটা আপনা থেকেই কেমন নিৰ্জ্জীব হ'য়ে পড়ে—তখন আর তার বিদ্যুতের তেজ থাকে না। কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম

কর্‌লে আবার তার তেজ ফিরে আসে। সব সময়ে যে ইচ্ছা ক'রে সে খামখা অস্ত্র ব্যবহার করে, তা নয়; কোন রকমে ভয় পেলে বা চমকালেও তার গায়ে বিদ্যুৎ খেলে।

এরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আরও কোন কোন মাছের ও অন্য জলজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আফ্রিকায় মাগুর জাতীয় একরকম মাছ আছে, তারও তেজ বড় কম নয়। তার সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্যুতের কোষে ঢাকা। একটা চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে একে রাখলে তবে এর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। দুদিন না যেতেই দেখবে যে আর সব মাছকে মেরে সে সাবাড় করেছে। আফ্রিকার আরবেরা এর নাম বলে "রা'দ্" অর্থাৎ বজ্র মাছ।

বিশ্বাসী বালক

আষাঢ়ের অবসান হলো
নাইকো বারি বিন্দুলেশ,
চাষার মনে নাইকো আশা
কিসে রক্ষা পাবে দেশ।

ভুঁইগুলি সব ফুটি-ফাটা
দেখে মনে হচ্ছে হেন,
দারুণ তৃষায় জলের আশায়
"হাঁ" ক'রে রয়েছে যেন!

আকাশ পানে চে'য়ে চে'য়ে
চাষা কাঁদে সকাল বিকাল,
অভিজ্ঞেরা বুঝে গেছে
এবার হবে ভারি আকাল।

বৃদ্ধেরা সব বুদ্ধি ক'রে
কল্লে ফন্দী মন্দ না,
ঠাকুর বাড়ী গিয়ে সবে
করবে দেবের বন্দনা।

আবাল বৃদ্ধ পুরুষ নারী
চল্লে ছু'টে সকলে,
একটী বালক মস্ত একটা
ছাতা কল্লে বগলে।

হেসে বল্লে সঙ্গী সবে
"নাইকো দেশে বৃষ্টি লেশ,
ছাতা নিয়ে যাচ্ছ কেন
একি অনাসৃষ্টি শেষ!"

বালক বলে "বর মাগিতে
যাচ্ছি যদি জলের তরে,
বৃষ্টি হ'লে কেমন ক'রে
ভিজে ভিজে ফিরব ঘরে ?

বর মাগিতে যাচ্ছি যখন
বর তখন ত ঠিক পাব,
ভারি বৃষ্টি হ'লে ঘরে
কেমন ক'রে ফিরে যাব ?"

বিশ্বাসী বালকের কথা
সত্য হলো একেবারে
প্রার্থনা হলো না ব্যর্থ
বৃষ্টি হলো মুষলধারে।

অবিরাম সে ধারায় ভিজে
সবায় হলো আধ'মরা,
ছাতা মাথায় চল্লো বালক
প্রাণে তার আনন্দ ভরা।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিডি।

অতিবুদ্ধি নাপিতের কথা

এক যে ছিল নিষ্কর্ম্মা নাপিত, তার সারাঘরে ছিল শুধু এক নাপ্‌তানী। নাপ্‌তানীর যেমন ছিল চেহারাখানা, তেমনি ছিল সাধা গলার রকমওয়ারি আওয়াজ। তাকে দেখেই মনে হত লক্ষ্মীঠাকরুণ নাপিতের ঘর থেকে চিরবিদায় নেবার বেলা তাঁর বাহন পেঁচীটিকে তাড়াতাড়িতে সঙ্গে নিতে ভুলে গেছেন।

নাপিত একটি পয়সাও রোজগার কর্‌ত না; সারাদিন কেবল গ্রামময় বুক ফুলিয়ে লোক ঠকিয়ে বেড়াত, আর দিনের শেষে ঘরে ফিরত যেন কেঁচোটি। কেন না, বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই নাপতানীর গালাগালি আর ঝাঁটা চালান স্থুরু হ'ত।

এই রকম রোজই হ'ত, নাপিতেরও এ সব স'য়ে গেছিল। কিন্তু গ্রামের বিশু ফকির পর্য্যন্ত যে দিন কোথা থেকে টাকা পেয়ে হঠাৎ বড়মানুষ হ'য়ে পড়ল, সে দিন নাপিত বাড়ীতে এসে এমনি মার খেল যে, তখনই প্রতিজ্ঞা কর্‌ল আজ সে মর্‌বেই মর্‌বে। বাঘ ভালুকে না খায়, গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বে—এই ভেবে সে কাছের একটা বনে গিয়ে বসে রইল।

রাত্রি অনেক হল, বাঘভালুকের নামগন্ধ নাই। নাপিত তখন খুব বড় একটা বট গাছে উঠ্‌ল, গলায় দড়ি দেবে বলে। কিন্তু মর্‌ব বলা যত সহজ, মরা তার চেয়ে ঢের বেশী শক্ত। গায়ের চাদরটা ডালে বেঁধে, যাই গলায় আট্‌কাতে যাবে, অমনি নাপিতের

গাটা ছম্ ছম্ করে উঠ্ল ; তার মনে হ'ল যেন নাপতানী তাকে ডাক্‌ছে—"আয় রে নাপিত, বাড়ী আয়। রাগ্ করিস না। তোকে আর কখন কিছু বল্‌ব না।" তখন নাপিত আর কি করে ? অগত্যা গাছটার একটা ডালের সঙ্গে নিজের কোমরটা চাদর দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে চুপচাপ ব'সে রইল।

এম্নি ক'রে কত রাত হয়ে গেল বলা যায় না, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে নাপিত চম্‌কে উঠে দেখে কি ! গাছের তলাটা একেবারে রোশনাই হয়ে গেছে ! লাল নীল সব্‌জে সাদা, নানারঙের সব বাতি গাছটার নীচেকার ডালে ডালে ঝুল্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোত্থেকে আপনা আপনি গাছের তলায় একটা চমৎকার বিছানা পাতা হয়ে গেল। রং বেরঙের কাজ করা মখমলের ফরাস ! তার উপর কি সব তাকিয়া বালিশ ! তারপরে, ও বাবা ! হুড়মুড় ক'রে পালে পালে কারা সব আস্‌তে সুরু করল ! হাতীর মত এক একটা গদা পুরুষ—মাথায় তাদের তাদের প্রকাণ্ড পাগড়ী। একটার মাথায় হীরার ফুল, কোমরে সোনার পাটা, জমকালো পোষাক ; সেই বোধ হয় দলের কর্ত্তা, —সভায় এসেই একেবারে মাঝেকার তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে তামাক খেতে সুরু কর্‌ল। আর সব যে যার জায়গায় বসে গেল।

তামাক খেতে খেতে সভার কাজ আরম্ভ হল ! নাপিত দেখছে, সব দেনা পাওনার হিসাব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোত্থেকে ছালায় ছালায় টাকা এসে সভার মাঝে আপনা আপনি স্তূপে স্তূপে ঢালা হয়ে গেল। একজন খাজাঞ্চি তার হিসাব করতে লাগল ! কতক্ষণ হিসাবের খাতা খুলে মাতব্বর বল্‌ল "বিশু ফকীর তার টাকা পেল" ? খাজাঞ্চি বল্‌ল, "আজ্ঞে হাঁ"। তখন মাতব্বর আবার বল্‌ল—"তবে এ গ্রামের হরিচরণ গাঙ্গুলির দু'শ টাকা দেওয়া হয় না কেন ?"

নাপিত নিজ গ্রামের লোকজনের নাম শুনতেই একেবারে কাণ খাড়া ক'রে শুন্‌তে লাগল। খাজাঞ্চি মাথা চুলকিয়ে উত্তর দিল—"আজ্ঞে না, ওটা এখনও দেওয়া হয় নি। দেখি, ওটা কাল দেওয়া যাবে।"

মাতব্বর বল্‌ল, "কালই যাতে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা ক'রো—দেরী করো না।"

রাত থাকতেই সভা ভাঙ্গ্‌ল। নাপিত আর গাছের উপর টিক্‌তে পাচ্ছিল না। গাছ থেকে হড়হড়িয়ে নেমে একদৌড়ে একেবারে বাড়ীতে গিয়ে দেখে, নাপতানী তখনও ঝাঁটা হাতে ব'সে ব'সে ঝিমুচ্ছে।

নাপিত বল্‌ল—"নাপতানি! শিগ্গির তোর গহনা খোল্, বাসন কোসন যা আছে সব বা'র কর। পেটারায় যে টাকা আছে, আমি বা'র করে ফেল্‌ছি।"

নাপতানি এবার তেলেবেগুনে জ্বলে গর্জ্জে উঠ্‌ল—"তবে রে, পোড়ারমুখো হনুমান! টাকা রোজগারের নাম নেই, আবার গহনা নিতে এয়েছিস্? বেরো বাড়ী থেকে। নইলে ঝাঁটা মেরে পিঠ লাল করে দেব।"

নাপিত বল্‌ল—"আরে শোন শোন—কথাটা শুনে নাও—অত চেঁচিও না।"

এই বলে নাপিত নাপ্‌তানীর কাণে কাণে সব কথা বল্‌ল। তারপর দু'জনে তাড়াতাড়ি কাজে লেগে গেল।

তখন প্রায় শেষরাত। নাপিত গোলক পোদ্দারের কাছে গহনাপত্র বেচে সত্তর টাকা যোগাড় ক'রে হরিচরণ গাঙ্গুলির দরজায় গিয়ে হাঁক্‌তে লাগ্‌ল—"গাঙ্গুলি মশায়! গা তুলুন; গাঙ্গুলি মশায়! গা তুলুন একবার।"

হাঁক শুনেই ত বামুনের প্রাণ ধড়ফড় করে উঠ্‌ল। তাকে এত রাতে কে ডাকে! ভয়ে ভয়ে এসে যেই না কবাট খোলা, নাপিত অমনি হরিচরণকে লম্বা প্রণাম করে বস্‌ল। বামুন ত অবাক্!—অতিভক্তি দেখে বেশ কিঞ্চিৎ ভয়ও পেল। কেননা নাপিতকে বামুন বেশ চিন্‌ত। যাই হউক, হরিচরণ জিজ্ঞাসা করল,—"কি হে নিতাই, অসময়ে যে?"

নিতাই বল্‌ল "আজ্ঞে, এমন কিছু নয়। তবে কিনা একটা স্বপ্ন দেখে আপনার কাছে এইছি। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি—আপনি এই পূব দিকে দাঁড়িয়ে দেবতা সাক্ষী করে বলুন দেখি—আপনাকে কত টাকা দিলে আপনি প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে আপনি আজ সকাল থেকে সন্ধ্যার ভেতর যা কিছু পাবেন সব আমাকে দিবেন?"

হরিচরণ বল্‌ল—"নিতাই, তুমি ক্ষেপেছ, না তামাসা করছ?"

নাপিত বল্‌ল "ঠাকুর, আমি ক্ষেপিও নাই, তামাসাও করছি না। ওসব কথা যাক্, এখন সোজাসুজি বলুন দেখি আপনি কত টাকা চান?"

হরিচরণ খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাব্‌ল, তার পরে বল্‌ল—"ভাই, আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। আমার অদৃষ্টে আজ এমন কি জুট্‌তে পারে! আচ্ছা দেখ, যদি বাজি রাখ্‌তেই হয় তবে আমাকে একশ' টাকা দিতে হবে।"

নিতাই হেসে বল্‌ল—"ঠাকুর, একশ' টাকা নয়। এই সত্তর টাকা এনেছি, সব আপনাকে দিচ্ছি।"

বামুন খুসী হ'য়ে তাতেই রাজি হল। গ্রামের গদাই সর্দ্দার ও হিমু মালাকরের সাম্‌নে নিতাই হরিচরণকে সত্তর টাকা দিয়ে দুয়ারে বসে রইল,—বামুন কি পায় না পায় সব সে দেখবে।

এম্‌নি করে সমস্তটা দিন নাপিতের অনাহারে কেটে গেল। কিন্তু কই একটা কণাকড়িও ত কেউ বামুনকে দিয়ে গেল না? নাপিতের বুকটা 'দুর দুর' করতে লাগ্‌ল, তার কপালে ঘাম দেখা দিল। ক্রমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারদণ্ড রাত হয়ে গেল; তখন নাপিতের মুখ একেবারে চুন। বামুন বল্‌ল—"ভাই নিতাই! যা পেয়েছি তুমিই ত দেখেছ। আমার ওপর চটো না।"

নাপিত আর কোন কথা না বলে, বরাবর সেই বনের ভেতর গিয়ে সেই গাছে উঠে বসে রইল।

দুপুর রাতের পর আবার তেমনি সভা বস্‌ল। কথায় কথায় হরিচরণের নাম উঠ্‌ল। নাপিত শুনতে লাগল।

মাতব্বর বল্‌ল—"হরিচরণের টাকা শোধ হয়েছে?"

খাজাঞ্চি জবাব দিল—"আজ্ঞে হাঁ, আজ কতকটা শোধ করেছি। কালতক বাকীটা শোধ হবে।" নাপিত ত অবাক্! কই, একটি পয়সাও ত সে বামুনকে পেতে দেখেনি! মাতব্বর আবার বল্‌ল—"কোন তহবিল থেকে দিলে?"

খাজাঞ্চি বল্‌ল—"তহবিল ত একই। ঐ নিতাই নাপিতের তহবিল থেকেই দিয়েছি—সত্তর টাকা।"

যেই না একথা শোনা, আর অমনি নিতাই নাপিতের মাথা দিয়ে যেন আগুণ ছুটে গেল। বেচারা হাত পা ছেড়ে, গাছ থেকে ধড়াস্ করে পড়্‌ল—একেবারে গাছের তলায়—সভার মাঝখানে। চারিদিকে হুলস্থূল—একি ব্যাপার? দলের পেয়াদারা তখন বল্লে—"এই বেটাই নিতাই নাপিত।"

কিছুক্ষণ পরেই নিতাইয়ের জ্ঞান ফিরে এল; নিতাই উঠেই মাতব্বরের পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল—"আমায় রক্ষা কর, আমার সর্ব্বনাশ করো না।"

মাতব্বর তখন বল্‌ল—"ভাই, আমারা কি করব? আমরা লোকের তহবিল বয়ে বেড়াই; এক জন্মের দেনা-পাওনা আরেক জন্মে মিটাই। আর-জন্মে তুমি হরিচরণের তহবিল থেকে যে দুশ' টাকা কর্জ্জ করেছিলে তা তোমাকেই শোধ করতেই হবে। পরের জিনিসের উপর আমরা কর্ত্তৃত্ব করতে পারি না। তবে যাও

বামুনের কাছে, সে যদি আর অল্প কিছু নিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেয়, আমাদের আপত্তি নেই।”

নাপিত বাড়ী এসেই একেবারে বামুনের চরণতলে পড়ল! বামুন বল্‌ল—“ব্যাপার কি?” নাপিত বল্‌ল—“ব্যাপার আর কি ঠাকুর, আমিত গেছি”! বামুন তার কাছে সব কথা শুনে নাপিতের কাছ থেকে আর পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে তাকে রেহাই দিল।

টাকার জন্য নাপিত তার যথা সর্ব্বস্ব বিক্রী ক’রে একেবারে ফতুর হ’য়ে গেল।

তখন নাপতানী তার চুলে ধ’রে আচ্ছা ক’রে খ্যাংরা মেরে, খুর কাঁচি বগলে দিয়ে বল্‌ল “যা! এখন থেকে রোজগারে মন দে—নইলে তোর্ কপালে খাওয়া নেই।”

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

যুদ্ধের আলো

সেকালে, অর্থাৎ পুরাণে যে কালের কথা বলা হয় সেই কালে, লড়াইটা হ’ত দিনের বেলায়। ভীষ্মপর্ব্বে দশ দিন ধ’রে লড়াই হল; প্রতিদিনই দেখি সন্ধ্যা না হ’তেই শঙ্খধ্বনি ক’রে যুদ্ধ থেমে গেল, তারপর যে যার মত শিবিরে ফিরে গেল। এই রকম, দিনের বেলা লড়াই ক’রে রাত্রে সবাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করত। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে এরকম হবার যো নেই। এখন কি দিন কি রাত, কোন সময়েই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। শত্রু যে কখন কোন্ সুযোগে ঘাড়ে এসে পড়বে তার জন্য সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হয়। সৈন্যেরা যুদ্ধ থামিয়ে সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে শিবিরে ফিরে গেল, এ রকমটি কোন সময়েই হ’তে পারে না। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়েই সৈন্য হাজির রাখতে হয়।

কামানেরও বিশ্রাম নাই। রাত্রের অন্ধকারে ঝড়ে বাদলে যখন তখন সে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে। তার চোখে দেখবার দরকার হয় না, কেবল ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে হিসাব ক’রে সে গোলা ছুঁড়ছে; দিনে রাতে কোন সময়েই শত্রুকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরা খাদ কেটে তারই মধ্যে হয়ত খোলা ময়দানে কত রাত কাটাচ্ছে। সেখানে সারারাত ধ’রে কড়া পাহারা বসান আছে—কোনখানে টুঁ শব্দটি হ’লেই তারা কাণখাড়া ক’রে শোনে। কোথাও কোন ভয়ের কারণ দেখলেই ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক ক’রে দেয়—আর আকাশে তারা-বাজি ছুটিয়ে চারদিক আলো ক’রে দেখে, শত্রু আস্‌ছে কি না!
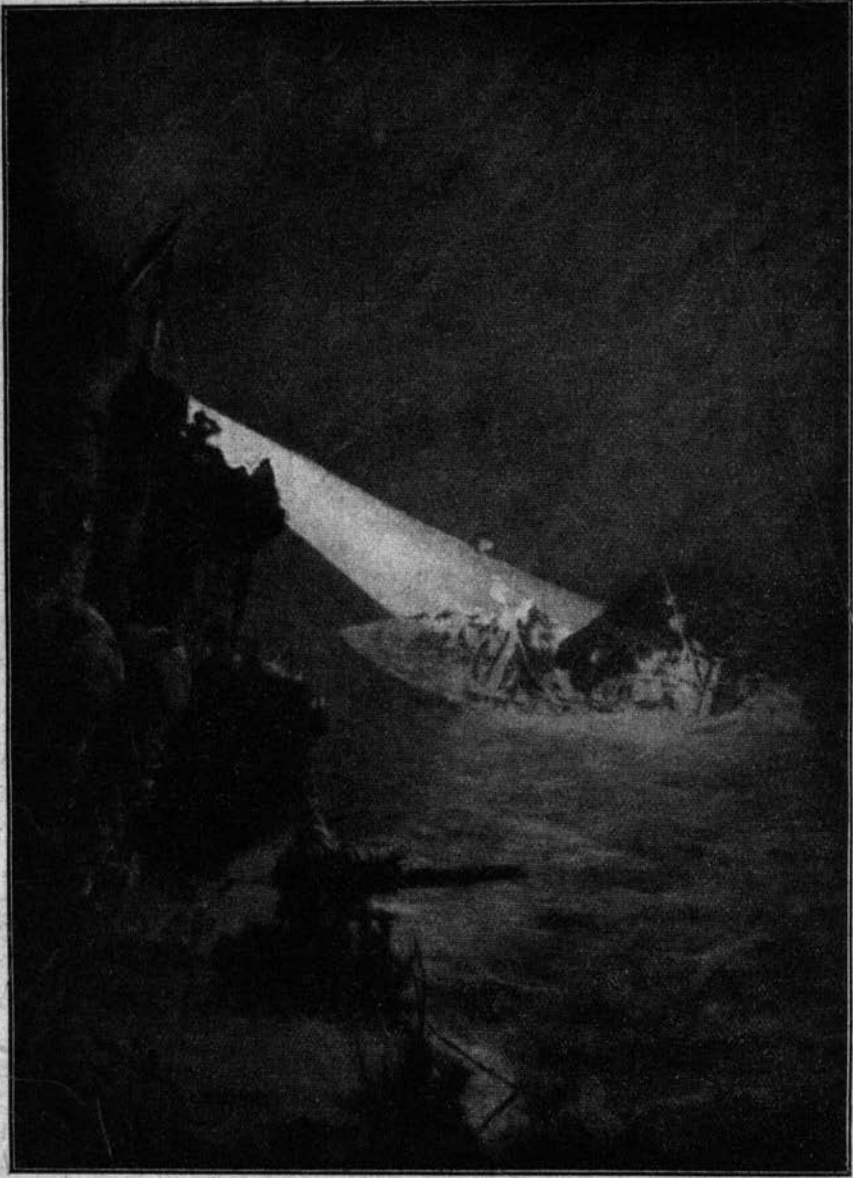
বড় যুদ্ধ-জাহাজের আলোর মুখে ধরা পড়িয়া শত্রুর ফেউ জাহাজের দফা শেষ !

যেমন ডাঙ্গায় তেমনি জলে—আবার আকাশেও তেমনি। কোথাও দিনের অপেক্ষায় কেউ ব'সে থাকে না। কত যুদ্ধের জাহাজ সারারাত সমুদ্রের মধ্যে হাঁ হাঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার "Search light"এর ঝক্‌ঝকে আলো খড়্গের মত অন্ধকার কেটে চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই আলো যেখানে পড়ে সেখানে যেন একেবারে রাতকে দিন ক'রে ফেলে। সেই আলোর মুখে যদি কোন শত্রুজাহাজ পড়ে তবে তার আর লুকোবার যো নাই। সে যে দিকে যাবে, আলো তার পিছন পিছন ঘুরবে। আর, সেই আলোতে পরখ্ ক'রে যুদ্ধ জাহাজ তার উপরে কামান দাগ্‌বে। তখন তার প্রাণভয়ে পালান ছাড়া আর উপায় নাই। অন্ধকার রাত্রে জার্ম্মানদের বোমাওয়ালা "জেপেলিন" বেলুনগুলা যখন আকাশ বেয়ে চোরের মত আস্‌তে থাকে, তখন তার সাড়া পেলেই অম্‌নি বড় বড় আলোর ঝাপ্‌টা চারিদিকে ছুটে বেরোয়—আকাশ হাত্‌ড়ে খুঁজবার জন্য। যুদ্ধের সময় আলোর ব্যবহারটা যতই ভয়ানক হো'ক না কেন, তামাসা হিসাবে আলোটা দেখ্‌তে ভারি সুন্দর। বড় বড় দরবারী ব্যাপারের সময় দশবিশটা জাহাজ একসঙ্গে মিলে যখন আলোর খেলা দেখাতে থাকে, তখন সে এক চমৎকার দৃশ্য হয়।

কিন্তু জাঁকালো ব্যাপারের কথা যদি বল, তবে রাত্রে ডাঙায় লড়াইয়ের সময় যে আলোর খেলা চলে, তার আর তুলনা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার কামান আর বন্দুক, তাদের মুখে মুখে লাল আগুণ ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌ছে। থেকে থেকে রংবেরঙের

তারাবাজি ছুঁড়ে নানা রকম সঙ্কেত চল্‌ছে। মনে কর, জার্ম্মান খাদের উপর তারা ফুট্‌ছে—সাদা লাল, সাদা লাল—তার মানে, "শত্রুসৈন্য এদিকে আস্‌ছে—কামান চালাও"। খানিক পরে হয়ত দেখ্‌বে, লাল সবুজ লাল সবুজ লাল সবুজ—জার্ম্মানরা বল্‌ছে "আমরা কোণঠাসা হ'য়েছি—শীঘ্র উদ্ধার কর"। মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় "ফানুসতারা" আস্তে আস্তে জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে চারদিক আলো ক'রে মাটিতে পড়ছে—

সেই আলোতে লড়াই আবার জমে উঠছে। হয়ত আশে পাশে ভাঙাচোরা গ্রামগুলাতে আগুণ ধ'রে এক এক দিকে আকাশের গায়ে লাল হ'য়ে উঠেছে। তার উপর, থেকে থেকে শত্রুদের চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুতের আলোর মত Search light এসে পড়েছে। উপরে নীচে চারিদিকে বড় বড় গোলা ফাট্‌ছে—এক মুহূর্ত্ত আলোর ঝিলিক্, তারপর পাহাড় প্রমাণ ধোঁয়া। আলোয় আঁধারে ছায়ায় ধোঁয়ায় মিলে কি ভীষণ তামাসা!

ছুট্‌ছে মোটর ঘটর ঘটর ছুট্‌ছে গাড়ী জুড়ী
ছুট্‌ছে লোকে নানান্ ঝোঁকে কর্‌ছে হুড়োহুড়ি
ছুট্‌ছে কত খ্যাপার মত পড়ছে কত চাপা
সাহেব মেমে থম্‌কে থেমে বল্‌ছে—"মামা! পাপা!"
—আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে"!

বর্ষাকালের বৃষ্টিবাদল রাস্তাজুড়ে কাদা
ঠাণ্ডা রাতে সর্দ্দি বাতে মরবি কেন দাদা ?
হোক্‌না সকাল হোক্‌না বিকাল হোক্‌না দুপুর বেলা
থা'ক্‌না তোমার আপিস যাওয়া থা'ক্‌না কাজের ঠেলা—
এই দেখ না চাঁদনী রাতের গান এনেছি কেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে"।

মুখ্যু যারা হ'চ্ছে সারা পড়ছে তারা নাম্‌তা
কেউবা দেখ কাঁচুরমাচুর কেউবা করে আম্‌তা !
কেউবা ভেবে হদ্দ হ'ল কেউবা নাকে চুলকায়
কেউবা ব'সে বোকার মত মুণ্ডু নেড়ে দোল খায় !
তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে গাওনা গলা ছেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" ॥

বেজার হ'য়ে যে যার মত করছ সময় নষ্ট—
হাঁট্‌ছ কত, খাট্‌ছ কত, পাচ্ছ কত কষ্ট !
আসল কথা বুঝছ না যে করছ না যে চিন্তা
শুনছ না যে গানের মাঝে তব্‌লা বাজে ধিন্‌তা ?
পাল্লা ধ'রে গায়ের জোরে গিট্‌কিরি দাও ঝেড়ে—
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্—! দেড়ে দেড়ে দেড়ে" !

বৈশাখমাসের মোগল-পাঠান ধাঁধার উত্তর

প্রথমে দুইজন পাঠান ওপারে গেল, একজন ফিরে এল। আবার দুইজন পাঠান ওপারে গেল, একজন ফিরে এল। তারপর মোগল দুইজন ওপারে গেল; একজন মোগল একজন পাঠান ফিরে এল। তারপর আবার মোগল দুইজন ওপারে গেল, একজন পাঠান ফিরে এল। তারপর দুজন পাঠান ওপারে গেল, একজন ফিরে এল। এখন এপারে মাত্র দু'জন পাঠান রইল, এরা ওপারে গেলেই সকলের পার হওয়া হয়ে গেল।

রামধনু।

পঞ্চম বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩২৪   চতুর্থ সংখ্যা

রামধনু

গভীর কালো মেঘের পরে রঙীন্ ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙীন্ বেশে রঙীন্ ফুলে রঙীন্ প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে কি জানে তার? নাইবা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!
শুনছে সে যে পাখীর ডাকে হরষ কোলাকুলি
ভিজা ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি!

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎ খানি মধুর তারি কাছে॥

বৎসশ্রী

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পুরাকালে, বিদূরথ নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুমতি নামে দুই পুত্র এবং মুদাবতী নামে, পরমসুন্দর এক কন্যা ছিল। রাজা বিদূরথ একদিন শিকার করিতে গিয়া, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। গর্ত্ত এমনই বড় যে, তাহা দেখিয়া রাজা বিদূরথ ভাবিলেন—"ইহা কখনই সাধারণ গর্ত্ত নহে, এটা নিশ্চয় পাতালে যাইবার পথ!"

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে, সুব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্বী আসিয়া উপস্থিত! তখন সেই গর্ত্ত দেখাইয়া, রাজা তাঁহাকে সেটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি রাজা, সকল বিষয়ই আপনার জানা থাকা উচিত। এই গর্ত্তের সংবাদটিও আপনাকে বলিতেছি, শুনুন—এক মহা বলবান দৈত্য পাতালে থাকে; সে পৃথিবীকে জৃম্ভিত (বিদীর্ণ) করে বলিয়া, তাহার নাম হইয়াছে 'কুজৃম্ভ।' পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা সুনন্দ নামক এক ভীষণ মুষল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুষ্ট দানব সেই মুষল চুরি করিয়াছে। যুদ্ধের

সময় সে সুনন্দ মুষল দিয়া শত্রুবিনাশ করে। এই মুষলের সাহায্যেই সে পৃথিবী ভেদ করিয়া, অন্য দানবদিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। দানব কুজৃম্ভ সেই মুষলের দ্বারা পৃথিবী ফুটা করিয়া এই গর্ত্ত করিয়াছে।

"দুষ্ট দানব, মুষলের বলে মুনি ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করে, দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির! আপনি যদি এই দানবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন, তবেই পৃথিবীর সম্রাট হইয়া, সুখে বাস করিবেন। মুষলের একটি আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, যেদিন সেটাকে কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে, সেদিন উহার কোন গুণ থাকিবে না; কিন্তু পর দিনই আবার বলশালী হইবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে যে মুষলের বল থাকে না—দুষ্ট দানব, সে কথা জানে না। আপনাকে সব কথা বলিলাম, এখন যাহা উচিত মনে করেন, করুন।" এই বলিয়া ঋষি প্রস্থান করিলে, রাজাও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া, বিদূরথ, তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া, দানব কুজৃম্ভের কথা এবং তাহার মুষলের কথা, সমস্তই বলিলেন। এই সময়ে রাজকুমারী মুদাবতী, পিতার নিকট উপস্থিত থাকায় তিনিও সমস্ত বিষয় শুনিতে পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, রাজকুমারী সখীদিগের সহিত উপবনে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে, দুরাচার কুজৃম্ভ, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এই দুঃসংবাদ পাইয়া, রাজা বিদূরথের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পুত্র দুই জনকে ডাকিয়া, বলিলেন—"তোমরা শীঘ্র যাও। নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তীরে যে গভীর গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্ত দ্বারা পাতালে গিয়া, পাপিষ্ঠ কুজৃম্ভকে বধ করিয়া, রাজকুমারীকে উদ্ধার কর।"

পিতার আদেশে, ক্রুদ্ধ রাজপুত্রদ্বয়, অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত, গর্ত্তের নিকটে গেলেন। এবং দানবের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া, পাতালে গেলে পর, কুজৃম্ভের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল! অনেক দিন যুদ্ধের পর, মায়াবী দানবের কৌশলে, রাজপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট হইল; অবশেষে কুমার দুইজনও বাঁধা পড়িলেন!

এই সংবাদ পাইয়া, রাজা যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যে এই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া, রাজকুমারদিগের এবং মুদাবতীকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যাদান করিব।"

এই ঘোষণা শুনিয়া, রাজা ভনন্দনের পুত্র, মহাবীর বৎসশ্রী, বিদূরথের সভায় আসিয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"মহারাজ! অনুমতি পাইলে, আমি এখনই দুরাচার

কুজৃম্ভকে বধ করিয়া, আপনার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পারি।"

রাজা ভনন্দন ছিলেন বিদূরথের পরম বন্ধু। বিদূরথ তখনই মিত্রপুত্র বৎসপ্রীকে অলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন—"বৎসপ্রি! তুমি আমার পুত্রের তুল্য। যাও—যদি আমার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পার, তবে যথার্থ মিত্রপুত্রের কার্য্যই করিবে।"

বৎসপ্রী, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সেই গর্ত্ত দিয়া পাতালে গেলেন। সেখানে গিয়া, ধনুকে টঙ্কার দিবামাত্র, সমস্ত পাতালপুরী কাঁপিয়া উঠিল! দুর্ম্মতি দানবও, সেই টঙ্কারশব্দ শুনিয়া, ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে, আসিয়া উপস্থিত! তখন সেখানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা অতি ভীষণ। ক্রমাগত তিন দিন দারুণ সংগ্রামের পরও যখন কোন পক্ষের জয় হইল না, তখন দুষ্ট দানব, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মুষল আনিবার জন্য অন্তঃপুরে চলিল।

অন্তঃপুরে প্রতিদিন সেই দেবনির্ম্মিত মুষলের পূজা হইত। রাজকুমারী মুদাবতী, মুষলের ক্ষমতার কথা জানিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি তিনি মাথা নীচু করিয়া তাহা স্পর্শ করিতেছিলেন। দানব যখন মুষল হাতে লইল, তখনও মুদাবতী, পূজার ভান করিয়া, বার বার তাহা স্পর্শ করিতেছিলেন।

দানব মুষল লইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্পর্শে তাহার বল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে মুষল ব্যর্থ হইতে লাগিল। সৌনন্দ মুষল ব্যর্থ হইতে দেখিয়া দুষ্ট দানব একেবারে দমিয়া গেল। সে অন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুত্রের সহিত আর সে পারিয়া উঠিল না। অবশেষে বৎসপ্রী, আগ্নেয় অস্ত্র মারিয়া, তাহাকে বধ করিলেন। দানব কুজৃম্ভের মৃত্যুতে, পাতালে নাগকুলের মহা আনন্দ হইল। আকাশ হইতে দেবতাগণ বৎসপ্রীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর, নাগরাজ অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করিলেন। রাজকুমারী মুদাবতী মুষলের ক্ষমতা ব্যর্থ করিবার জন্য যে বার বার উহা স্পর্শ করিয়াছিলেন, সেজন্য নাগরাজ অনন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সৌনন্দ মুষলের নামে রাজকুমারীকে 'সুনন্দা' নাম দিলেন।

ইহার পর বৎসপ্রী, রাজকুমারী ও রাজপুত্র দুইজনকে লইয়া, রাজা বিদূরথের নিকট গেলেন। বিদূরথ যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! তারপর, বৎসপ্রীর সহিত মুদাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বৎসপ্রী, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, স্ত্রীর সহিত, রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বানিয়া ও ব্রাহ্মণ

হিন্দুস্থানী গল্প

কোন গ্রামে, নিতান্ত দরিদ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। সারা জীবন ভিক্ষা করিয়া তিনি এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন একটু লোভী, তাই ভাবিতেন—"টাকাটা ঘরে পড়িয়া থাকিলে হয়ত বা কোন দিন চুরি হইয়া যাইতে পারে। তাহার চাইতে যদি সুদে খাটাইতে পারি, তবেই ভাল—দু'চার দিনেই টাকাটা বাড়িয়া যাইবে আর সুদ দিয়া সংসার চালাইতে পারিব।"

সেই গ্রামেই একজন মাতব্বর "বানিয়া" (বেনে) থাকিত। সে অল্প সুদে টাকা আনিয়া বেশী সুদে খাটায় এবং বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। এই বানিয়া ব্রাহ্মণের টাকা ধার লইল। ব্রাহ্মণ জানিতেন, বানিয়া বড় লোভী—ধার নিয়া সহজে কারও টাকা দিতে চায় না। কিন্তু—টাকা চুরি হইবার ভাবনা দূর হইবে, অথচ মাসে মাসে সুদ পাওয়া যাইবে—এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ বানিয়াকে টাকা ধার দিলেন। কিছুকাল তাঁহার বেশ সুখেই কাটিয়া গেল—নিয়মমত সুদ পান, তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলিয়া যায়।

কয়েক বৎসর পরে, হঠাৎ বেশী টাকার প্রয়োজন হইলে, ব্রাহ্মণ বানিয়ার নিকট তাঁহার আসল হাজার টাকা চাহিলেন। কিন্তু অর্থপিশাচ বানিয়া, সে কি হাজার টাকা দিতে চায়! নানা রকম ওজর আপত্তি দেখাইয়া সে ব্রাহ্মণকে বিদায় করিল। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণ আবার চাহিলেন; বানিয়ার মুখে সেই একই কথা—বড় দুঃসময়, এখন কি করিয়া টাকা দেই, ইত্যাদি। ক্রমে ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন! তিনি নিতান্ত গরীব, বানিয়া অবস্থাপন্ন; সুতরাং নালিশ করিয়াও টাকা আদায় করিবার আশা নাই! ব্রাহ্মণ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।

গ্রামে একটি দেবমন্দির ছিল। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগে মহাদেব, অপর ভাগে গণেশের মূর্ত্তি। নিরুপায় ব্রাহ্মণ টাকার জন্য প্রতিদিন গণেশের পূজা আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলা পূজা করিলে, পূজারিকে টাকা দিতে হয়, পূজার উপকরণের জন্য পয়সা খরচ করিতে হয়। গরীব ব্রাহ্মণ এত খরচ কি করিয়া করিবেন! সুতরাং প্রতিদিন গভীর রাত্রে মন্দিরে গিয়া, গোপনে তিনি গণেশের নিকট হত্যা দিয়া প্রার্থনা করিতেন—"হে গণপতি! আমি বিপন্ন, গরীব ব্রাহ্মণ! তুমি দয়া করিয়া এই বানিয়ার

নিকট হইতে আমার টাকাটা আদায় করিয়া দাও।" তাহার পর হঠাৎ একদিন বানিয়া, নিজেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া পাঁচশত টাকা দিয়া গেল। কিন্তু বাকি পাঁচশ টাকা আর কিছুতেই আদায় হইল না—গণেশের পূজায়ও ব্রাহ্মণ কোন ফল পাইল না।

ব্রাহ্মণ তখন গণেশকে ছাড়িয়া মহাদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন। গণেশের মূর্ত্তিটি ছিল বড় সুন্দর। কাঠের তৈরী, লাল টুক্‌টকে রং—গজানন লম্বোদর, পেটটি তাঁর খুবই বড়—কিন্তু ফাঁপা। লোকে বিশ্বাস করিত, গণেশের এই ফাঁপা পেটের মধ্যে অনেক ধনরত্ন আছে। লোভী বানিয়ার মনেও সেই ধারণাই ছিল। শুধু তাহাই নহে, সে মনে মনে ইহাও ভাবিত যে, কি করিয়া গণেশের পেটের ধনটা সংগ্রহ করা যায়! দেবতার ভয় বড় ভয়! ইচ্ছা থাকিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত বানিয়া, ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ভরসা পাইল না। কিন্তু শেষে কিছুতেই আর লোভ

সামলাইতে না পারিয়া, একদিন গভীর রাত্রে সে গণেশের মন্দিরে গেল। চারিদিক নীরব

লোকজনের সাড়া শব্দটি নাই! এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়! গণেশের ফাঁপা পেটে লোভী বানিয়া মারিল এক লাথি! যাই লাথি মারা, আর অমনি গোটা পা খানি, পেট ফুটা করিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া, আট্‌কাইয়া গেল। কত চেষ্টা, কত টানাটানি—কিছুতেই আর পা বাহির হয় না। ভোর বেলা পূজারি আসিয়া যখন তাহাকে এরূপ অবস্থায় ধরিবে, তখন কি উপায় হইবে? এই দুর্ভাবনায় বানিয়া অস্থির হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণও ওদিকে সে সময়ে বাকি পাঁচশ টাকার জন্য, মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ মনে হইল মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া, গম্ভীর স্বরে মহাদেব যেন ডাকিলেন—"গণেশ!" পাশের ঘর হইতে গণেশ উত্তর দিলেন—"মহারাজ!" মহাদেব বলিলেন—"ইয়া ব্রাহ্মণকা হাজার রূপিয়া দেলা দেও।" গণেশ বলিলেন—"হুজুর! পাঁচশ রূপিয়া ত দেলা দিয়া, আওর পাঁচশকা ওয়াস্তে ইয়া বানিয়াকা পাঁও পাক্‌ড়া।"

এই কথা শুনিয়া বানিয়ারত চক্ষু স্থির! হাতযোড় করিয়া গণেশের কত স্তুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর! দোহাই তোমার, আমাকে ছাড়িয়া দাও—কালই আমি ব্রাহ্মণের পাঁচশ টাকা সুদে আসলে শোধ করিয়া দিব।" স্তুতি মিনতির সঙ্গে সঙ্গে পাটাও অবশ্যি টানাটানি করিয়াছিল। যাহাহউক, ঘটনাক্রমে হঠাৎ বানিয়ার পা বাহির হইয়া আসিল। আর কি সে সেখানে থাকে—উর্দ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একেবারে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত!

বলা বাহুল্য, তাহার পরদিনই ব্রাহ্মণ তাঁহার বাকি পাঁচশ টাকা সুদে আসলে ফিরিয়া পাইলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ভুবনেশ্বর

ছেলেবেলায় পুরী যাবার পথে রেলগাড়ী থেকে দেখেছিলাম, গাছপালার মাঝখানে ভুবনেশ্বরের মন্দির মস্ত কালো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার আশে পাশে ছোট বড় কতগুলো মন্দির মায়ের পাশে ছেলের মত তাকে ঘিরে রয়েছে। অনেকদিন পরে এবার সেই মন্দিরকে কাছে গিয়ে দেখবার সুযোগ ঘটলো।

বিকালে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আমরা গরুর গাড়িতে চড়লাম। খোলা মাঠের উপর দিয়ে, ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, লালমাটির রাস্তা ধরে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্

করে চলতে চলতে সন্ধ্যার সময় আমরা ভুবনেশ্বরের কাছে একটা গ্রামে পৌঁছলাম, সেখানে আমাদের জন্য বাড়ী ঠিক ছিল।

সকালে উঠে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে শুনলাম যে তিনদিন আগে একটা গোসাপকে গোখুরো সাপে তাড়া করে নিয়ে দুটোতেই কূয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছে। গোসাপটা তখনই মরে গেল কিন্তু গোখুরো সাপটা বেঁচে রইল। তিনদিন জলে পড়ে থেকে সাপটা কাহিল হয়ে পড়েছে দেখে, চাকররা সাহস করে কূয়োর মধ্যে একটা বালতি নামিয়ে দিল। তারপর অনেক কষ্টে সাপটাকে বাগিয়ে সেই বালতি করে তাকে তুললো। তুলেই কিন্তু ছেড়ে দিল—তাদের বিশ্বাস সে গোখুরো সাপ যে মারবে, সে নির্ব্বংশ হবে।

আরেকদিন একটা গোসাপ ঘরে ঢুকে এসে ভারি উৎপাত করেছিল—তাকে তাড়া করতেই সে দেয়াল বেয়ে ঘরের চালে উঠে গেল। কাছে যেতেই সে এমন খ্যাঁক খ্যাঁক

করে তেড়ে এল, যে সেখান থেকে তাকে নামাতে কারো ভরসা হ'ল না। দিব্যি নিশ্চিন্তমনে সে চালের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর দু তিন দিন ধরে, যখন তখন ডেলা ডেলা মাটি ফেলে আমাদের জ্বালাতন করে তুলল।

হনুমানের উৎপাতও বড় কম নয়। ঘরের কাছেই একটা গাছে দুটি আম দেখলাম; এমন মস্ত আম সচরাচর দেখা যায় না। খানিক পরেই কয়েকটা হনুমান এসে গাছের উপর পড়ল। সকলে হৈ চৈ করে উঠ্‌ল, অমনি তারা একটি আম বগলে করে—দে ছুট্। আরেকটা আম মাটিতে ফেলে গেল, কুড়োতে গিয়ে দেখি সেটাও খিম্‌চিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে।

ভুবনেশ্বর আর খণ্ডগিরির মাঝামাঝি পথে আমাদের বাড়ীটা ছিল। প্রথমে ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে গেলাম—মস্ত উঁচু পাথরের দেয়ালে ঘেরা প্রকাণ্ড পাথরের উঠান, তার মধ্যে ছোট বড় কত যে মন্দির তার ঠিকানা নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটি এর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তার গড়নটা ঘণ্টার মতন, আগাগোড়া পাথরে তৈরী, আর তাতে যে কি সুন্দর খোদাই করা কাজ! দেব দেবীর মূর্ত্তি তো আছেই, তা ছাড়া কত অসংখ্য হাতী, ঘোড়া, রাক্ষস, মানুষ, পাখী, সাপ, মাছ, ফুল, পাতার ছবি—সে সব দু'এক দিনে ভাল করে দেখা হয় না। দুঃখের বিষয় মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল বলে ভিতরের ঠাকুর দেখতে পাইনি। তবে শুনেছি যে ওর ভিতরে বেদীর উপর একটা ঝাঁঝরি পাথরে বসান মহাদেব আছেন, যখন তাঁর মাথায় জল ঢালা হয়, তখন নাকি ঐ ঐ ঝাঁঝরি পাথরটা সব জল শুষে নেয়।

অন্যান্য মন্দিরগুলির গড়নও ঠিক বড় মন্দিরটার মত। তার মধ্যে অন্নপূর্ণার মন্দিরটির খোদাই কাজ বড় সুন্দর লাগল।

একটা অন্ধকার কোণে হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড কালো কুচ্‌কুচে পাথরের তৈরী গনেশের গোলগাল মূর্ত্তি। আরেক জায়গায় পার্ব্বতীর মূর্ত্তি, তার নাক ভেঙ্গে গিয়েছে কিন্তু গহনার প্রত্যেকটি মুক্তো, শাড়ির প্রত্যেকটি ফুল কি সুন্দর করে বানিয়েছে! একটা ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ষাঁড়, সমস্তটা নাকি একটা আস্ত পাথর খুদে বানিয়েছে। ষাঁড়টা বসে আছে, তার সামনে ছোট একটি গাছ। ওখানকার লোকে বলে যখন প্রলয়ের সময় আসবে, তখন ষাঁড়টা উঠে ঐ গাছটা খাবে।

পরদিন উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখতে গেলাম। পাশাপাশি দুটি পাহাড়, তাদের গায়ে পাথর খুদে কত ঘর দালান গুহা তৈরী হয়েছে। সেখানকার দৃশ্য কি সুন্দর! নির্জ্জনে

বসে ভগবানের নাম করবার উপযুক্ত জায়গাই বটে। একটা গুহাঘরের ভিতর দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। একটা গুহার নাম "ব্যাঘ্রগুম্ফা"—ঠিক যেন একটা বাঘ হাঁ করে আছে,—মুখের হাঁ'টাই হ'ল গুহার দরজা। আরেক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড পাথর ছাদের মত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে, তার তলায় একটা সমতল পাথর ঘরের মেজের মত বিছান রয়েছে ; এটা হ'ল "হাতিগুম্ফা"। এখানে দাঁড়িয়ে পাথরের গায়ে কি লেখা আছে তাই দেখছি, এমন সময় পাণ্ডা বল্ল, "কাল বেলা চারটার সময় এখানে একটা বড় বাঘ এসে গরু মেরেছে।" অমনি আমাদের দলের দু'চারজন বল্লেন, "বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি"। আশে পাশে যে রকম জঙ্গল তাতে বাঘ লুকিয়ে থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে পড়লাম।

নামতে গিয়ে দেখি সামনে একটা সাপ ! আমাদের সাড়া পেয়ে সাপটা করল কি, যে পাথরটায় পা দিয়ে আমাদের নামতে হবে, ঠিক তারই তলায় গিয়ে ঢুকে রইল—অনেক খোঁচাখুঁচি করাতেও বেরোল না। আমাদের পায়ে জুতো ছিল না, কাজেই তখন বড়রা ছোটদের কোলে নিয়ে ছুটে সে জায়গাটা পার হয়ে এলাম। আমরা চলে আসবার পরে কয়েক দিন পর্য্যন্ত ঐ বাঘটা নাকি রোজ রাত্রে বেরিয়ে নানা রকম উৎপাত করত।

পরদিন আমরা একদল চলে এলাম। আর যাঁরা রইলেন তাঁরা আরেক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঘের সামনে পড়ে গেলেন। তাঁরা অনেক জন আছেন দেখে বাঘটা ভয় পেল কিনা জানি না—সে কিছু না বলে, আস্তে আস্তে রাস্তা পার হয়ে সুড়্ সুড়্ ক'রে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এখানে এরকম বাঘের অত্যাচার প্রায়ই হয়। একবার একটি ছোট্ট ছেলেকে চিতা বাঘে ধরেছিল। ছেলের মা অমনি তার হাতের মোটা কাঁসার বালা দিয়ে বাঘকে মারতে মারতে চীৎকার করতে লাগল। গোলমাল শুনে লোকজন এসে পড়ল—ততক্ষণে কিন্তু, মা তার ছেলেকে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

ফড়িঙে জোলা

তার নাম ছিল 'ফড়িং'; লোকে তাকে 'ফড়িঙে জোলা' ব'লে ডাক্‌ত। চেহারাখানাও তার ফড়িংএরই মতন ছিল;—হাত পা কাঠির মত; মাথাটা নারকেলের মালার মত, শরীরটা যেন বাঁশের মত। বুদ্ধিটা তার একটু মোটা গোছের ছিল, তাই তাকে তাঁত চালান ছাড়া অন্য কোন কাজ কর্‌তে দেওয়া হ'তো না। সংসারে তার আর কেউ ছিল না—কেবল ছিল এক দুষ্টু সৎমা।

একদিন হয়েছে কি,—যাই সে ডান হাতে সর্‌-র্‌-ৎ ক'রে মাকু চালিয়েছে,—আর অমনি একটা মাছি এসে তার বাঁ হাতের তেলোর মধ্যে ব'সেছে। মাকুও, পড়্‌বি তো পড়্‌ একেবারে মাছির ঘাড়ের উপর। মাছি তো একেবারে চ্যাপ্টা হ'লো,—কিন্তু এদিকে ফড়িঙের যা অবস্থা! সে তো অহঙ্কারে আর ঘাড় নামায়ই না! অনেকক্ষণ বুক ফুলিয়ে ব'সে থেকে শেষটায় বল্ল, "মাকুও সকলে চালাতে পারে, মাছিও সকলে মার্‌তে পারে;—কিন্তু মাকুও চালাবে আর মাছিও মার্‌বে, একি যে-সে লোকের কাজ? আর আমি তাঁত চালাচ্ছি নে; আজই আমি রাজার বাড়ী গিয়ে সেখানে পালোয়ানীর চাক্‌রি নেবো।" তারপর, সে তার সৎ-মার কাছে ছুটে গিয়ে হাজির হ'লো আর বল্ল, "মা, আমি চল্লাম! এক ঠেলায় মাকুও চালাতে পারে আর মাছিও মার্‌তে পারে যে, তার আর তাঁত চালান পোষায় না; আমি রাজবাড়ীর পালোয়ান হব।"

ফড়িংএর সৎ-মা ভাবলে, "আপদ গেল! ছেলেটাকে এতদিনে দূর ক'রে বাঁচ্‌লাম। তবে, এ যাতে আর না ফিরে আসে তার বন্দোবস্ত কর্‌তে হচ্ছে।" ফড়িংকে সে বল্ল, "আহা, বাছা আমার এত কষ্ট ক'রে পথ হেঁটে যাবে; সঙ্গে কিছু খাবার না দিলে কেমন ক'রে চল্‌বে? একটু সবুর কর বাবা, খানকতক রুটি বানিয়ে সঙ্গে দিচ্ছি।"

দুষ্টু সৎ-মার মতলব ভাল ছিল না। সে নানা রকম বিষ দিয়ে কতগুলো রুটি বানিয়ে, তাতে খুব সুগন্ধ মসলার গুঁড়ো মাখিয়ে দিল। ফড়িংও সেই রুটি তার গামছায় বেঁধে নিয়ে চল্ল।

রাজবাড়ী পৌঁছেই ফড়িং সটান রাজার সাম্‌নে গিয়ে হাজির! রাজামশাইকে তিন হাত লম্বা সেলাম ক'রেই সে বল্ল, "মহারাজ, আমার নাম রাম সিং পালোয়ান। আমার মত ওস্তাদ শিকারী মেলা ভার। শুনলাম মহারাজের একজন পালোয়ানের দরকার,

তাই আমি চাক্‌রি করতে এলাম।" রাজামশাই বল্লেন, "বেশ কথা! আজ থেকে তুমি আমার পালোয়ান হ'লে।"

যাই না একথা বলা, অম্‌নি রাস্তায় একটা হৈ চৈ গোলমাল শোনা গেল। লোকজন ছুটাছুটি করছে আর বল্‌ছে, "হাতী পালাল," "মেরে ফেল্‌ল," "পালা পালা"। রাজার পাগ্‌লা হাতীটা কেমন ক'রে জানি ছুটে বেরিয়েছে, আর কেউ তাকে ধর্‌তে পার্‌ছে না। কত পালোয়ান, কত শিকারী হার মেনে গেছে; কত লোক মরেছে, কত লোক জখম হয়েছে;—হাতী কিন্তু আর ধরা পড়ে না। তখন রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "পালোয়ান জী, এবারে তোমার কেরামতিটা ভাল ক'রে দেখাও; না হ'লে যে
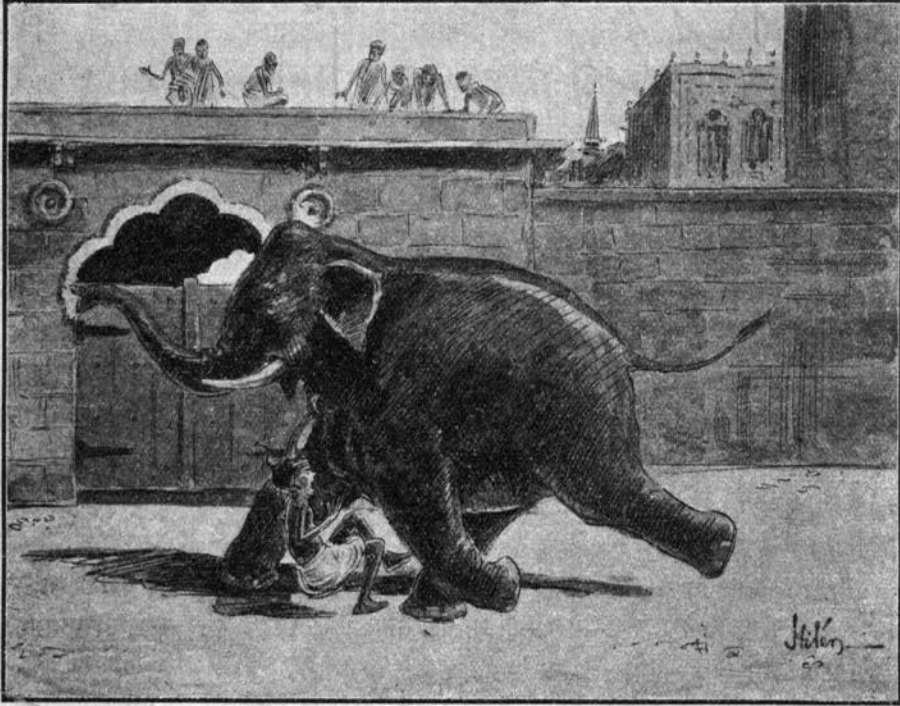
সর্ব্বনাশ হবে। এ হাতীকে যদি মারতে পার, তবে বুঝ্‌ব তুমি বড় পালোয়ান; আর তোমাকে আমার জামাই করব।"

রাজার জামাই হবার কথা শুনেই ফড়িং তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হাতী মার্‌তে চল্‌লো। কিন্তু হাতীর চেহারা দেখেই তার চক্ষুস্থির! যেমন ভীষণ তার চেহারা, তেম্নি ক্ষেপা ক্ষেপেছে সে। ফড়িং তো তার পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি ফেলে দে দৌড়! কিন্তু পাগ্‌লা হাতীর কাছে কি আর পালিয়ে বেঁচে রক্ষা পাওয়া যায়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাতী তাকে কোণঠাসা কর্‌ল। তখনই, তাকে মেরেই ফেল্‌ত, ভাগ্যিস্ রুটির গন্ধ তার নাকে গেছিল। সেই সুগন্ধ রুটি সে এক মুহূর্ত্তেই খেয়ে শেষ ক'রে, আবার ফড়িংকে তাড়া কর্‌ল। ফড়িং তো ভয়ে আধ-মরা! শেষটায় আর উপায় না দেখে সে হাতীর পায়ের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌তে গেল, কিন্তু গোদা পায়ের গুঁতো খেয়ে সে একেবারে চিৎপটাং!

ফড়িংএর বড় ভাগ্যের জোর। যেই সে হাতীর পায়ের গুঁতো খেয়ে পড়েছে, আর অম্‌নি হাতীও সেই রুটির বিষের ঝোঁকে ধপাৎ ক'রে ম'রে পড়েছে। ফড়িংও তাড়াতাড়ি উঠে মরা হাতীর উপর চ'ড়ে বসেছে!

চারিদিকে বাড়ীর ছাতের উপর যে সব লোক তামাসা দেখ্‌ছিল, তারা তো অবাক! সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল, রাম সিং পালোয়ান ওস্তাদ বটে! দেখ্‌লে না, কেমন এক ঢুঁ মেরে হাতীটাকে মেরে চিৎপটাং ক'রে ফেল্‌ল!"

বাড়ী ফিরে এসেই ফড়িং রাজাকে এক মস্ত সেলাম ঠুকে বল্‌ল, "মহারাজের আশীর্ব্বাদে হাতীটাকে তো মেরেছি; এখন সেই জামাই হবার কথা যে বলেছিলেন—"

রাজামশাই বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তুমি জামাই হবার উপযুক্ত বটে, কিন্তু আরো একটি সামান্য কাজ আছে সেটা ক'রে না দিলে তোমায় আমার জামাই করি কি ক'রে? দক্ষিণে যে গ্রাম আছে, সেখানে একটা বাঘ এসে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ ক'রেছে। সেটাকে তোমার মার্‌তেই হবে।"

ফড়িং বেচারা আর কি করে? কোমরে একখানা ছোরা বেঁধে নিয়ে, মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে বাঘ মার্‌তে চল্‌ল। দক্ষিণে গ্রামের ধারেই মস্ত জঙ্গল; তার ভিতরে বাঘ থাকে। জঙ্গলে ঢুকেই বাঘের সঙ্গে ফড়িঙের দেখা। ফড়িং তো বাঘ দেখেই আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর্‌বার অবসর পেল না,—তিন লাফে একেবারে একটা গাছের আগায়! বাঘও মানুষের লোভ ছাড়্‌বে কেমন ক'রে? সে গাছের গোড়ায় অপেক্ষা ক'রে ব'সে রইল।

ফড়িংকে দেখে বাঘের জিভে যত জল আসে, ফড়িঙের চোখে জল আসে তার চাইতেও বেশী। সে খালি ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্ছে। দুদিন যায়, তিন দিন যায়, বাঘ আর নড়ুবার নামই করে না। এদিকে ফড়িং তো আর গাছের উপর থাক্তে পারে না; তার হাত পা অবশ হয়ে গেছে, গা ঝিম্ ঝিম্ কর্ছে, কাণ ভোঁ ভোঁ কর্ছে, মাথা ঘুর্ছে, চোখ ঝাপ্সা হ'য়ে এসেছে। শেষটায় সে হাত পা ছেড়ে দিয়ে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল; কিন্তু মাঝপথে দুটো ডালের মাঝখানে পা আট্কে গিয়ে সে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। বাঘ যত ভাব্‌ছে, "আহা, এই বুঝি পড়ে," ততই তার মুখের হাঁ'টা বড় হয়ে যাচ্ছে, আর জিভ দিয়ে বেশী ক'রে জল পড়ুছে। ঠিক এই সময়েই ফড়িঙের কোমরে বাঁধা ছোরাখানা টপ্ করে নীচে প'ড়ে গেল;—আর, পড়ুবিতো পড় একেবারে বাঘের গলার ভিতরে। বাঘ কত ছট্‌ফট্ কর্‌ল, কত ওয়াক্ ওয়াক্ কর্‌ল, ছোরা আর কিছুতেই বেরোয় না—তখন সে রক্ত বমি কর্‌তে কর্‌তে ম'রে গেল।

তখন যে ফড়িঙের আহ্লাদ! সে তাড়াতাড়ি নেবে এসে বাঘের গলার ভিতর থেকে ছোরাখানা বের কর্‌ল; তার পর বাঘটাকে রাজার কাছে টেনে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু সেটাকে নড়াতেও পার্‌ল না। তখন সে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ল, "মহারাজ, এই দেখুন বাঘ মেরেছি;—এই ছোরাখানা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বাঘের গায়ে বড় গন্ধ, তাই সেটাকে জঙ্গলেই ফেলে এসেছি; আপনি একবার দেখবেন চলুন।"

অম্‌নি চারিদিকে ধূম পড়ে গেল;—রাম সিং পালোয়ানের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। চারিদিকে বাজনা বাঁশী, লোক জন, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ফড়িং রাজার জামাই হয়ে গেল। এবারে কিন্তু এক বিষম বিপদ এল;—এবারে হাতীও নয়, বাঘও নয়;—এ হচ্ছে এক বিদেশী রাজা; সঙ্গে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত, ঘোড়া, লোক লস্কর, অস্ত্র শস্ত্র।

সকলে মিলে ঠিক কর্‌ল যে রাম সিং যাবে সেই রাজার সঙ্গে লড়ুতে। কিন্তু ফড়িং এর তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। সে এত লোকজন কখনও দেখেনি; তার উপর যখন শুনতে পেল তাদের রাজা এক মস্ত যোদ্ধা, তখন যে তার কি অবস্থা হ'লো, সে কি আর বল্‌ব!

সে আর একটুও অপেক্ষা না করে সেই রাত্রিতেই চুপচাপ বেরিয়ে পড়ুল। সঙ্গে কেবল কয়টি সোণার বাসন নিল। কিন্তু বিদেশী রাজাকে এড়িয়ে যাবার জো নাই। তিনি সহরের চারিদিক ঘেরাও করেছেন, আর পশ্চিমের রাস্তার দু'ধারে সারি সারি সৈন্য সাজিয়ে রেখেছেন। দরকার হ'লেই তারা শত্রুকে আক্রমন কর্‌বে।

অমাবস্যার রাত্রে ফড়িং চুপি চুপি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। হঠাৎ তার মনে হ'লো যেন, কে জানি তার দিকে আস্‌ছে। সে তো ভয়ে আধমরা! খানিক দূর গিয়ে তার আবার মনে হ'লো যে কে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। ভয়ে তার হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল, আর সোণার বাসন ঝন্ ঝন্ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। তখন সে প্রাণের ভয়ে দে দৌড়।

এদিকে কিন্তু বাসন পড়ার আওয়াজকে অস্ত্রের আওয়াজ মনে ক'রে শত্রু সৈন্যেরা রাস্তার দু'ধার থেকে দৌড়ে এসেছে। উত্তরের লোকেরা দক্ষিণের লোকেদের মনে কর্‌ল, 'এরাই শত্রু', দক্ষিণের লোকেরা উত্তরের লোকেদের মনে কর্‌ল 'এরাই শত্রু।' তখন তারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়ে দিল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেরে কেটে প্রায় সব লোক শেষ হ'য়ে গেল। ভোর বেলা যখন তারা ভুল বুঝতে পার্‌ল, তখন খুব অল্পই লোক বাকি। তারা মনের দুঃখে এ দেশ ছেড়ে পালাল।

ফড়িংও তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসে বল্‌ল, "ভারি না শত্রু; তাদের মার্‌তে আর সময় লাগে কত?" রাজামশাই এত খুসী হলেন যে তিনি তখনই ফড়িংকে রাজ্যের ভার দিয়ে দিলেন। সে দিন থেকে সকলেই ফড়িংকে রাজা রাম সিং বাহাদুর' বল্‌ত।

শ্রীসুবিনয় রায়।

পুঁটু রাণীর স্বপ্ন

ছোট্ট পুঁটী, পা দুখানি ছড়িয়ে দিয়ে, দুয়ার ধারে,
দেখ্‌ছে বসে নূতন ছবি, বাবা এনে দেছেন তারে।
দেখ্‌ছে বসে, ভূতের ছানা, ড্যাব্‌ড্যাবে তার চক্ষু দুটি,
যায় পালিয়ে ভয়ে ভয়ে, ভোরের বেলায়, গুটিসুটি।
কত রাজা রাণীর ঘটা! রাজার মেয়ে মনের সুখে
হীরে মাণিক ঝল্‌মলিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাসি মুখে।
কেউ বা বাঁধে চুলের গোছা, কেউ শুয়েছে সোণার খাটে,
রাজকন্যা কেউবা বিকোয় ভাঙ্গা হাঁড়ি লোকের হাটে।
নীল আকাশে মেঘের মত ঐ যে পরী আস্‌ছে ভেসে,
দুঃখী মেয়ের দুঃখ মুছে, রাখ্‌বে তারে পরীর দেশে।

ফড়িংকে দেখে বাঘের জিভে যত জল আসে, ফড়িঙের চোখে জল আসে তার চাইতেও বেশী। সে খালি ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। দুদিন যায়, তিন দিন যায়, বাঘ আর নড়্‌বার নামই করে না। এদিকে ফড়িং তো আর গাছের উপর থাক্‌তে পারে না; তার হাত পা অবশ হয়ে গেছে, গা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে, কাণ ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে, মাথা ঘুর্‌ছে, চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে। শেষটায় সে হাত পা ছেড়ে দিয়ে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল; কিন্তু মাঝপথে দুটো ডালের মাঝখানে পা আটুকে গিয়ে সে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। বাঘ যত ভাব্‌ছে, "আহা, এই বুঝি পড়ে," ততই তার মুখের হাঁ'টা বড় হয়ে যাচ্ছে, আর জিভ দিয়ে বেশী ক'রে জল পড়্‌ছে। ঠিক এই সময়েই ফড়িঙের কোমরে বাঁধা ছোরাখানা টপ্ করে নীচে প'ড়ে গেল;—আর, পড়্‌বিতো পড় একেবারে বাঘের গলার ভিতরে। বাঘ কত ছট্‌ফট্ কর্‌ল, কত ওয়াক্ ওয়াক্ কর্‌ল, ছোরা আর কিছুতেই বেরোয় না—তখন সে রক্ত বমি কর্‌তে কর্‌তে ম'রে গেল।

তখন যে ফড়িঙের আহ্লাদ! সে তাড়াতাড়ি নেবে এসে বাঘের গলার ভিতর থেকে ছোরাখানা বের কর্‌ল; তার পর বাঘটাকে রাজার কাছে টেনে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু সেটাকে নড়াতেও পার্‌ল না। তখন সে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌ল, "মহারাজ, এই দেখুন বাঘ মেরেছি;—এই ছোরাখানা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন। বাঘের গায়ে বড় গন্ধ, তাই সেটাকে জঙ্গলেই ফেলে এসেছি; আপনি একবার দেখবেন চলুন।"

অম্‌নি চারিদিকে ধূম পড়ে গেল;—রাম সিং পালোয়ানের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। চারিদিকে বাজনা বাঁশী, লোক জন, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে ফড়িং রাজার জামাই হয়ে গেল। এবারে কিন্তু এক বিষম বিপদ এল;—এবারে হাতীও নয়, বাঘও নয়;—এ হচ্ছে এক বিদেশী রাজা; সঙ্গে অসংখ্য সৈন্যসামন্ত, ঘোড়া, লোক লস্কর, অস্ত্র শস্ত্র।

সকলে মিলে ঠিক কর্‌ল যে রাম সিং যাবে সেই রাজার সঙ্গে লড়্‌তে। কিন্তু ফড়িং এর তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। সে এত লোকজন কখনও দেখেনি; তার উপর যখন শুন্‌তে পেল তাদের রাজা এক মস্ত যোদ্ধা, তখন যে তার কি অবস্থা হ'লো, সে কি আর বল্‌ব!

সে আর একটুও অপেক্ষা না করে সেই রাত্রিতেই চুপচাপ বেরিয়ে পড়্‌ল। সঙ্গে কেবল কয়টি সোণার বাসন নিল। কিন্তু বিদেশী রাজাকে এড়িয়ে যাবার জো নাই। তিনি সহরের চারিদিক ঘেরাও করেছেন, আর পশ্চিমের রাস্তার দু'ধারে সারি সারি সৈন্য সাজিয়ে রেখেছেন। দরকার হ'লেই তারা শত্রুকে আক্রমন কর্‌বে।

অমাবস্যার রাত্রে ফড়িং চুপি চুপি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। হঠাৎ তার মনে হ'লো যেন, কে জানি তার দিকে আস্‌ছে। সে তো ভয়ে আধমরা! খানিক দূর গিয়ে তার আবার মনে হ'লো যে কে যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। ভয়ে তার হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল, আর সোণার বাসন ঝন্ ঝন্ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। তখন সে প্রাণের ভয়ে দে দৌড়।

এদিকে কিন্তু বাসন পড়ার আওয়াজকে অস্ত্রের আওয়াজ মনে ক'রে শত্রু সৈন্যেরা রাস্তার দু'ধার থেকে দৌড়ে এসেছে। উত্তরের লোকেরা দক্ষিণের লোকেদের মনে কর্‌ল, 'এরাই শত্রু', দক্ষিণের লোকেরা উত্তরের লোকেদের মনে কর্‌ল 'এরাই শত্রু।' তখন তারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়ে দিল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেরে কেটে প্রায় সব লোক শেষ হ'য়ে গেল। ভোর বেলা যখন তারা ভুল বুঝতে পার্‌ল, তখন খুব অল্পই লোক বাকি। তারা মনের দুঃখে এ দেশ ছেড়ে পালাল।

ফড়িংও তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসে বল্‌ল, "ভারি না শত্রু; তাদের মার্‌তে আর সময় লাগে কত?" রাজামশাই এত খুসী হলেন যে তিনি তখনই ফড়িংকে রাজ্যের ভার দিয়ে দিলেন। সে দিন থেকে সকলেই ফড়িংকে রাজা রাম সিং বাহাদুর' বল্‌ত।

শ্রীসুবিনয় রায়।

পুঁটু রাণীর স্বপ্ন

ছোট্ট পুঁটী, পা দুখানি ছড়িয়ে দিয়ে, দুয়ার ধারে,
দেখ্‌ছে বসে নূতন ছবি, বাবা এনে দেছেন তারে।
দেখ্‌ছে বসে, ভূতের ছানা, ড্যাব্‌ড্যাবে তার চক্ষু দুটি,
যায় পালিয়ে ভয়ে ভয়ে, ভোরের বেলায়, গুটিসুটি।
কত রাজা রাণীর ঘটা! রাজার মেয়ে মনের সুখে
হীরে মাণিক ঝল্‌মলিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাসি মুখে।
কেউ বা বাঁধে চুলের গোছা, কেউ শুয়েছে সোণার খাটে,
রাজকন্যা কেউবা বিকোয় ভাঙ্গা হাঁড়ি লোকের হাটে।
নীল আকাশে মেঘের মত ঐ যে পরী আস্‌ছে ভেসে,
দুঃখী মেয়ের দুঃখ মুছে, রাখ্‌বে তারে পরীর দেশে।

ভাব্‌ছে পুঁটু আপন মনে, এমন যদি সত্যি হ'ত !
হ'তাম যদি রাণী কিম্বা রাজার মেয়ে, ছবির মত !
আমাদের এই ছোট ঘরটি হয়ে যেত মস্ত বাড়ী,
রাজার বাড়ী নেমন্তন্নে যেতাম চড়ে সোণার গাড়ী !
কি মজাটাই হ'ত তবে ! পরীর মেয়ে পরীর ছেলে,
খেল্‌ত এসে আমার সাথে, ছোট্ট তাদের পাখ্‌না মেলে।
পুঁটু রাণী ব্যস্ত ভারি খেলার ঘরে, পুতুল নিয়ে,
জানতে সে তাই পারলে নাকো ঘুম যে এল কোথায় দিয়ে।
ঘুমের মাসি ঘুমের পিসী, পুঁটুর দুটি চোখের ফাঁকে,
কি মন্ত্র যে পড়ল তারা, করল কি যে, বল্‌বে তা কে ?

খেলার পুতুল রইল কোথা, সব যে গেল কোথায় ভেসে,
পুঁটু রাণী পড়ল যেন কোন রাজ্যের দেশে এসে !
ফুল পাতা আর আলোর মাঝে, ছেলে মেয়ে দলে দলে,
ঝক্‌মকে সব পোষাক প'রে নেচে নেচে যাচ্ছে চলে।
'এস এস' ডাক্‌ল তারা পুঁটুর দুটি হাতে ধ'রে ;
বল্ল পুঁটু 'কি ক'রে যাই, মা যদি ভাই মানা করে ?
একটুখানি দাঁড়াও, আমি দৌড়ে মাকে আসি ব'লে।'
মুচ্‌কি হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্ল তারা 'যাই তাহ'লে।'
ঘড়ঘড়িয়ে আস্‌ছে ছুটে আট ঘোড়ার ঐ সোণার গাড়ী,
রাজার ছেলে রাজার মেয়ে, হাওয়া খেয়ে, ফেরেন বাড়ী ;
পুঁটুর দেখা পেয়েই পথে, ডাকেন তারে হাত বাড়িয়ে,
ভয়েই পুঁটু জড়সড়, মাথা নীচু, রয় দাঁড়িয়ে ;
'দাঁড়াবার ভাই সময় যে নাই' বলেন তাঁরা গাড়ী থেকে,
চল্ল ছুটে আটটা ঘোড়া, ধুলোয় ধুলোয় আকাশ ঢেকে।
কোথায় ধুলো ? চাঁদের আলো চারদিকেত পড়ল ছেয়ে,
ফুলের গন্ধ আস্‌ল ভেসে ঝুরু ঝুরু বাতাস বেয়ে।
কে গায় গান ঐ ? কেই বা বাজায় এমন বাঁশী এমনি ক'রে ?
মাঠে মাঠে, বনে বনে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ল ভ'রে।
ফুলের মাঝে ফুলের মত পরীর ছেলে পরীর মেয়ে,
ঐ যে হাসে হেলে দুলে, ঐ যে নাচে গেয়ে গেয়ে !
আরও কাছে, আরও কাছে, পুঁটুর চারিধারে ঘিরে,
নাচ্‌ল তারা, গাইল তারা, ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে ;
বল্ল তারা 'পুঁটুরাণি ! পুঁটু রাণীই' সবে বলে,
কর্‌ব তোমায় পরীর রাণী ; কি বল ভাই, রাজি হ'লে ?
হাওয়ার মত ফিন্‌ফিনে আর রূপার মত ঝিক্ ঝিকে,
দুখান ডানা জুড়ে দিব, তোমার কাঁধে দুই দিকে ;
থাক্‌বে তুমি পরীর দেশে, রাণীর মত কতই সুখে।'
পুঁটু কহে ধীরে ধীরে, সজল চোখে, হেঁট মুখে,

'মাকেও তবে নিয়ে আসি ? মা যে মোরে খুঁজ্‌বে ঘরে ?'
বলে তারা 'তাও কি হয় ? এস এস, শীঘ্র ক'রে।'
যেতে পুঁটুর মন সরে না, ডাকছে তারা বারে বারে,
'ভোর না হ'তে মোদের খেলা সাঙ্গ হবে, জান না রে ?
আস্‌বে যদি শীঘ্র এস। এলে না ভাই ? যাই তবে।
কে জানে সে কোন দেশেতে আবার কবে দেখা হবে !
যায় গো চ'লে, যায় যে তারা, মিছেই তাদের কথা কওয়া !
হাবা মেয়ে রইল চেয়ে, হল না তার রাণী হওয়া !

পেটুক

"হরিপদ ! ও হরিপদ !"

হরিপদর আর সাড়া নেই। সবাই মিলে এত চেঁচাচ্ছে, হরিপদ আর সাড়াই দেয় না। কেন, হরিপদ কালা নাকি ? কাণে কম শোনে বুঝি ? না, কম শুনবে কেন—বেশ দিব্যি পরিষ্কার শুন্‌তে পায়। তবে, হরিপদ কি বাড়ী নেই ? তা কেন ? হরিপদর মুখভরা ক্ষীরের লাড়ু ফেল্‌তেও পারে না গিলতেও পারে না। কথা বল্‌বে কি ক'রে ? আবার ডাক শুনে ছুটে আস্‌তেও পারে না—তাহ'লে যে ধরা পড়ে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি লাড়ু গিল্‌ছে আর জল খাচ্ছে ; আর যতই গিল্‌তে চাচ্ছে, ততই গলার মধ্যে লাড়ুগুলো আঠার মত আট্‌কে যাচ্ছে। বিষম খাবার যোগাড় আর কি !

এটা কিন্তু হরিপদর ভারি বদভ্যাস ! এর জন্য কত ধমক, কত শাসন, কত শাস্তি কত সাজাই যে সে পেয়েছে, তবু ত তার আক্কেল হ'ল না। তবু সে লুকিয়ে চুরিয়ে পেটুকের মত খাবেই। যেমন হরিপদ তেমনি তার ছোট ভাইটি। এদিকে পেটরোগা, দুদিন অন্তর অসুখ লেগেই আছে, তবু হ্যাংলামি তার যায় না।

সেই যে এক বিষম পেটুকের গল্প শুনেছিলাম—সে একদিন এক বড় নেমন্তনের দিনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, "আজ আমি নেমন্তনে যাব না"। সবাই বল্‌লে "কি ভয়ানক ! তুমি এমন ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা কর্‌ছ কেন" ? কিন্তু সে কারও কথা শুনল না, ঘরের

মধ্যে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল, আর সকলকে বলে দিল "ভাই, তোমরা আমার ঘরের বাইরে তালা লাগিয়ে দাও"। পেটুক মশায় ঘরের মধ্যে বন্ধ আছেন, কিন্তু মনটাকে ত আর বন্ধ ক'রে রাখা যায় না—মনটা তার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই নেমন্তনের জায়গায়। সে ভাব্‌ছে—"এতক্ষণে বোধ হয় আসন পেতেছে আর পাত পড়েছে—এইবারে বোধ হয় খেতে ডাক্‌ছে। কি খেতে দিচ্ছে? লুচি নিশ্চয়ই? লুচি আর বেগুণ ভাজা দিয়ে গেছে—এবার ডাল তরকারি ছক্কা সব আস্‌ছে। তা আসুক, আমি ত আর যাচ্ছি না।—এইবারে কি মাছের কালিয়া?—তারপরে মাংস বুঝি?—তা হো'ক না—আমি ত আর যাচ্ছি না? মাংসটা না জানি কেমন রেঁধেছে! সেবারে ওদের বাড়ী রান্না অতি চমৎকার হয়েছিল। অবিশ্যি এখনও সময় আছে—কিন্তু থাকলেই বা কি? আমি ত যাচ্ছি না। যাক্, এতক্ষণে টক দেওয়া হ'য়েছে—এইবার দই সন্দেশ রাবড়ি—আর রসগোল্লা! ঐ যা ফুরিয়ে গেল ত"! ব'লেই একলাফে জানালা টপকিয়ে—হাঁপাতে হাঁপাতে সে নেমন্তনের জায়গায় গিয়ে হাজির!—

আমাদের হরিপদ'র দশাও ঠিক তাই। যে দিন শাস্তিটা একটু শক্ত রকমের হয় তারপর কয়েকদিন ধ'রে তার প্রতিজ্ঞা থাকে, "আর এমন কাজ করব না"। যখন অসময়ে অখাদ্য খেয়ে, রাত্রে তার পেট কামড়ায় তখন সে কাঁদে আর বলে "আর না—এই বারেই শেষ!" কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার যেই সেই। তাই সবাই বলে—"কাবু হ'লেই 'আর গাব খাব না', আর তাজা হ'লেই 'গাব খাব না ত খাব কি'?"। এই ত কিছু দিন আগে পিসীমার ঘরে দই খেতে গিয়ে তারা জব্দ হ'য়েছিল—কিন্তু তবু ত লজ্জা নেই!—

হরিপদ'র ছোট ভাই শ্যামাপদ এসে বল্ল "দাদা শীগ্গির এস। পিসীমা এইমাত্র এক হাঁড়ি দই নিয়ে তাঁর খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন"। দাদাকে এত ব্যস্ত হ'য়ে এ খবরটা দেবার অর্থ এই যে, পিসীমার ঘরে যে শিকল দেওয়া থাকে, শ্যামাপদ সেটা হাতে লাগাল পায় না—তাই দাদার সাহায্য দরকার হয়। দাদা এসে আস্তে আস্তে শিকলটি খুলে, আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটের তলায় দইয়ের হাঁড়ি থেকে এক খাব্‌লা তুলে নিয়ে, খপ্ ক'রে মুখে দিয়েছেন। মুখে দিয়েই চীৎকার! কথায় বলে "ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে," কিন্তু হরিপদর চেঁচান তার চাইতেও সাংঘাতিক! চীৎকার শুনে মা মাসি দিদি পিসী যে যেখানে ছিলেন সব "কি হ'ল" "কি হ'ল" ব'লে দৌড়ে এলেন। শ্যামাপদ বুদ্ধিমান ছেলে, সে দাদার চীৎকারের নমুনা শুনেই এক দৌড়ে ঘোষেদের পাড়ায় গিয়ে

হাজির ! সেখানে অত্যন্ত ভাল মানুষের মত তার বন্ধু শান্তি ঘোষের কাছে সে পড়া বুঝিয়ে নিচ্ছে। এদিকে হরিপদ'র অবস্থা দেখেই পিসিমা বুঝেছেন যে হরিপদ দই ভেবে তাঁর চূণের হাঁড়ি চেখে বসেছে ! তারপর হরিপদ'র যা সাজা ! এক সপ্তাহ ধ'রে সে না পারে চিবাতে না পারে গিল্‌তে ! তার খাওয়া নিয়েই এক মহা হাঙ্গাম ! কিন্তু তবু ত তার লজ্জা নেই—আজ আবার লুকিয়ে কোথায় লাড়ু খেতে লেগেছে !

* * * * *

খানিক বাদে মুখখানি ধুয়ে মুছে হরিপদ ভাল মানুষের মত এসে হাজির ! হরিপদর বড় মামা বল্লেন, "কিরে ! এতক্ষণ কোথায় ছিলি" ? হরিপদ বল্ল, "এইত, উপরে ছিলাম"। "তবে, আমরা এত চেঁচাচ্ছিলাম—তুই জবাব দিচ্ছিলি না যে" ? হরিপদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বল্‌ল, "আজ্ঞে, জল খাচ্ছিলাম কিনা——" "শুধু জল ? না কিছু স্থলও ছিল"। হরিপদ শুনে হাসতে লাগল—যেন তার সঙ্গে ভারি একটা রসিকতা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মেজমামা মুখখানা গম্ভীর ক'র এসে হাজির ! তিনি ভিতর থেকে খবর এনেছেন যে হরিপদ একটু আগেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর থেকেই প্রায় দশ বারো খানা ক্ষীরের লাড়ু কম পড়ছে। তিনি এসেই হরিপদর বড় মামার সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরাজিতে ফিস্‌ফাস্‌ কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "বাড়ীতে ইঁদুরের যে রকম উৎপাত, ইঁন্দুর মার্‌বার একটা কিছু বন্দোবস্ত না করলে আর চল্‌ছে না'। চারদিকে যে রকম প্লেগ্‌ আর ব্যারাম—এই পাড়াশুদ্ধ ইঁদুর না মার্‌লে আর রক্ষা নেই"। বড় মামা বল্লেন, "হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে—দিদিকে বলেছি, সেঁকো বিষ দিয়ে লাড়ু পাকাতে—সেইগুলো পাড়াময় ছড়িয়ে দিলেই ইঁদুরবংশ নির্ব্বংশ হবে" ! হরিপদ জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "লাড়ু কবে পাকান হবে" ? বড় মামা বল্লেন, "সে এতক্ষণে হয়ে গেছে—সকালেই টেঁপিকে দেখছিলাম একতাল ক্ষীর নিয়ে দিদির সঙ্গে লাড়ু পাকাতে বসেছে"। হরিপদর মুখখানা আম্‌সির মত শুকিয়ে এল—সে খানিকটা ঢোক গিলে বল্ল, "সেঁকো বিষ খেলে কি হয় বড়মামা" ? "হবে আবার কি ? ইঁদুরগুলো মারা পড়ে, এই হয়"। "আর যদি মানুষে ওই লাড়ু খেয়ে ফেলে"। "তা, একটু আধটু যদি খেয়ে ফেলে ত নাও মর্‌তে পারে—গলা জল্‌বে, মাথা ঘুরবে, বমি হবে, হয়ত হাত পা খিঁচবে"। "আর যদি একেবারে এগারোটা লাড়ু খেয়ে ফেলে" ? বলে হরিপদ "ভ্যাঁ" করে কেঁদে ফেল্ল। তখন বড় মামা হাসি চেপে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "বলিস্‌ কিরে ! তুই খেয়েছিস্‌ নাকি" ? হরিপদ কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, "হ্যাঁ বড়মামা—তার মধ্যে

সাতটা খুব বড় বড় ছিল। তুমি শীগ্গির ডাক্তার ডাক, বড়মামা—আমার কি রকম গা ঝিম ঝিম আর বমি বমি করছে"।

মেঝমামা দৌড়ে গিয়ে তাঁর বন্ধু রমেশ ডাক্তারকে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে প্রথমেই খুব একটা কড়া রকমের তিতো ওষুধ হরিপদকে খাইয়ে দিলেন। তারপর তাকে কি একটা শুঁকতে দিলেন, তার এমন ঝাঁঝ যে, বেচারার দুই চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে লাগ্ল। তারপর তাঁরা সবাই মিলে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে তাকে ঘামিয়ে অস্থির ক'লে তুল্লেন। তারপর আর একটা ভয়ানক উৎকট ওষুধ খাওয়ান হ'ল, সে এমন বিস্বাদ আর এমন দুর্গন্ধ যে খেয়েই হরিপদ ওয়াক্ ওয়াক্ ক'রে বমি করতে লাগ্ল!

তারপর ডাক্তার তার পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে গেলেন। তিনদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠ্তে পারবে না, চিরেতার ঝোল আর সাগু খেয়ে থাক্বে। হরিপদ বল্ল, "আমি উপরে মার কাছে যাব"। ডাক্তার বল্লেন, "না। যতক্ষণ বাঁচবার আশা আছে ততক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে কাজ নেই। ও আপনাদের এখানেই থাক্বে"। বড় মামা বল্লেন, "হাঁ! মার কাছে যাবে, না আরো কিছু? মাকে এখন ভাবিয়ে তুলে তোমার লাভ কি? তাঁকে এখন খবর দেবার কিছু দরকার নেই"।

তিন দিন পরে যখন সে ছাড়া পেল তখন হরিপদ আর সেই হরিপদ নেই—সে একেবারে বদলিয়ে গেছে! তার বাড়ীর লোকে সবাই জানে হরিপদর ভারি ব্যারাম হয়েছিল—তার মা জানেন যে বেশী পিঠে খেয়েছিল ব'লে হরিপদর পেটের অসুখ হ'য়েছিল—হরিপদ জানে সেঁকো বিষ খেয়ে সে আরেকটু হ'লেই মারা যাচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি, তা জানে কেবল হরিপদর বড়মামা আর মেজমামা, আর জানে রমেশ ডাক্তার—আর এখন জানলে তোমরা, যারা "সন্দেশ" পড়ছ।

প্রলয়ের ভয়

পুরাণে আমরা প্রলয়ের কথা পড়েছি। কবে প্রলয় হ'য়েছিল, আবার কবে হবে, কেমন ক'রে প্রলয় হয়, এই সবের নানা রকম বর্ণনাও তাতে আছে। প্রলয়ের সময়ে সমস্ত সৃষ্টি যে জলে ডুবে যাবে একথাও বার বার ক'রে বলা হ'য়েছে। আশ্চর্য্য এই যে, নানান্ দেশে নানান্ জাতির ইতিহাসে প্রলয়ের প্রায় একই ধরণের বর্ণনা আছে।

অন্তত এ কথাটা অনেক দেশের অনেক পুরাণেই শোনা যায় যে, একবার প্রলয় হ'য়ে এই পৃথিবীটা ডুবে গেছিল। তাতে সমস্ত জীবজন্তু প্রায় ধ্বংস হ'য়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, একথাটার মধ্যে একটুখানি সত্যিকারের ইতিহাস আছে। যাঁরা ভূতত্ত্ববিদ, অর্থাৎ যাঁরা পাথর পাহাড় ঘেঁটেঘুঁটে পৃথিবীর পুরান কথার সংবাদ নিয়ে ফেরেন, তাঁরা বলেন যে, মানুষের জীবনে বড় বড় রোগের মত, পৃথিবীর জীবনেও এক একটা বড় বড় "সঙ্কট যুগ" দেখা গিয়েছে। যুগে যুগে বড় বড় দেশের জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, গ্রীষ্মের দেশ হিমের হাওয়ায় বরফে ঢেকে গিয়েছে, আর দুরন্ত শীতের দেশে বরফ ঠেলে সবুজ ঘাস আর বন জঙ্গল দেখা দিয়েছে। যেখানে দেশ ছিল, সেখানে কত সাগর হ'য়েছে,—আবার, কত কত সাগর ফুঁড়ে নূতন দেশ মাথা তুলেছে। আর, মাঝে মাঝে এক একটা বন্যা এসে পাহাড় ধুয়ে পৃথিবী ধুয়ে দেশকে-দেশ সাফ ক'রে দিয়েছে। এই রকম ছোট বড় কত প্রলয় এই পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—আমরা এখনও পুরাণের মধ্যে, গল্পের মধ্যে তারই একটু আভাষ পাই, আর পাহাড়ে পর্ব্বতে পাথরের স্তরে তার নানা রকম পরিচয় দেখি।

একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "এই যে সূর্য্য, এ চিরকাল এমন থাকবে না। একদিন এরও তেজ ফুরিয়ে যাবে—এও তখন নিভে যাবে।" এই কথা শুনে একজন ভীতু-গোছের ভদ্রলোক তাঁকে চিঠি লেখেন যে, "মহাশয়, আপনি যে রকম বিপদের কথা বল্লেন, তা শুনে আমার বড় ভয় হ'য়েছে। সে রকম প্রলয়টা কবে হবে, আর আমার ছেলে পিলেদের জন্য তা হ'লে কি রকম ব্যবস্থা করলে তারা বাঁচতে পারে—আমায় একটু জানাবেন কি"? জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত তার উত্তরে লিখলেন, "আপনার এত ব্যস্ত হবার কোনই কারণ নেই—আপনার ছেলেরা যদি লাখ বছরও বেঁচে থাকে, তবু এ সূর্য্যকে আজ যেমন দেখছে তখনও তেমনই দেখবে—তেজ ফুরাতে আরও অনেক দেরি আছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!" লোকে বড় বড় ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প আগুনের উৎপাত দেখে, তা থেকে প্রলয় জিনিষটা কি রকম, তার একটা আন্দাজ করে। বাস্তবিক, ছোট খাট প্রলয় পৃথিবীর উপর দিয়ে সব সময়েই চলেছে। কিন্তু আজ যে প্রলয়ের কথা বলব সেটা কিছু সত্যিকার প্রলয় নয়—লোকে প্রলয়ের হুজুকে যে নানা রকম মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করে তারই কথা।

অপরিচিত জিনিষ দেখলেই তার সম্বন্ধে মানুষের ভয় বিস্ময় বা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জিনিষ সর্ব্বদাই দেখতে পাই, তাতে মন এমন অভ্যস্ত হ'য়ে

যায় যে সেটাতে আর কোন রকম আশ্চর্য্য বোধ হয় না। মনে কর, এই সূর্য্য যদি প্রতি দিন না উঠে হঠাৎ এক একদিন ঐ রকম ভয়ানক আগুণের মত মূর্ত্তি নিয়ে হাজির হ'ত, তা হ'লে অধিকাংশ লোকেই যে একটা প্রলয় কাণ্ড হবে মনে ক'রে ভয়ে অস্থির অস্থির হ'ত তা বুঝতেই পার। চাঁদকেও যদি দুদশ বছরে ক্বচিৎ এক আধবার দেখা যেত তবে লোকে না জানি কত আগ্রহ ক'রে কত আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকে দেখ্‌ত, আর নাজানি সেটা আমাদের চোখে কি সুন্দর লাগত।

ধূমকেতুগুলো যদি মাঝে মাঝে এক আধটা না এসে ঐ চন্দ্র সূর্য্যেরই মত নিতান্ত সাধারণ জিনিষ হ'ত, তবে তাদের ঐ ঝাপ্‌সা ঝাঁটার মত চেহারা দেখে ভয় পাবার কোনই কারণ থাকত না। কিন্তু তারা কিনা হঠাৎ কেমন ক'রে খবর না দিয়ে আসে যায়, মানুষের কাছে তাই তাদের এত খাতির! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই ধূমকেতুকে একটা অলক্ষণ কিম্বা উৎপাত ব'লে মনে করে। ধূমকেতু যখন আসে, তখন
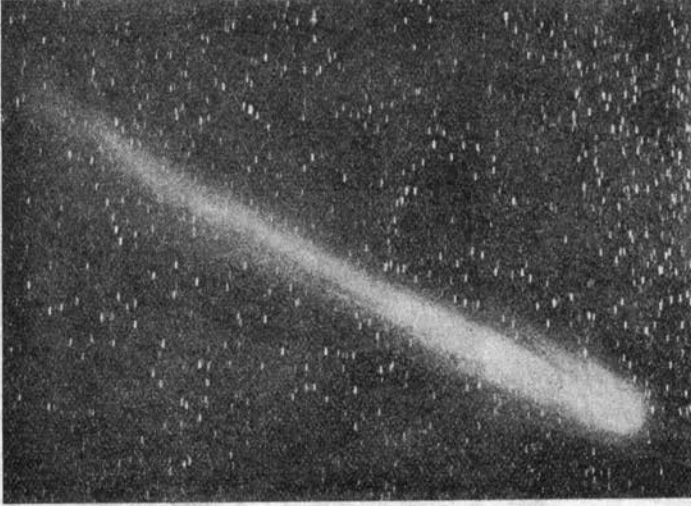
যার যা কিছু বিপদ আপদ সবের জন্যই ওই ধূমকেতুকেই লোকে দোষী করে। সে সময়ে রোগ মৃত্যু যুদ্ধ বিদ্রোহ সবই "ঐ ধূমকেতুর জন্য"। সুতরাং ধূমকেতু এসে পৃথিবী ধ্বংস করবে এই ভয়টা মানুষের মধ্যে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় বড় দুর্ঘটনাকে যে মানুষ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপিয়েছে তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। নানা দেশের ইতিহাসে নানা সময়কার ধূমকেতুর যে রকম অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকে তাদের কি রকম ভয়ের চোখে দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে গুজব

শুনেছিলাম যে কোথাকার এক "পাগ্‌লা ধূমকেতু" নাকি পৃথিবীর দিকে আস্‌ছে—আর কোন্ জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছেন যে সে অমুক তারিখে এই পৃথিবীকে এমন ঢুঁ লাগাবে যে তখন কেউ বাঁচে কি না সন্দেহ। এই খবরটা নিয়ে তখন চারিদিকে খুব একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে যখন "হ্যালির ধূমকেতু" এসে দেখা দেয়, তখন কেউ কেউ গুণে দেখিয়েছিলেন যে ঐ ধূমকেতুর ঝাঁটার মত লেজটা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। ঐ লেজের বাড়ি খেলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে, তাই নিয়ে কাগজে পত্রে খানিকটা তর্কাতর্কিও হ'য়েছিল, কিন্তু সময় হ'লে দেখা গেল যে, তাতে পৃথিবীর ত কিছু হ'লই না, বরং লেজটাই ছিঁড়ে টুটুক্‌রো হ'য়ে গেল। সুতরাং ধূমকেতুর ধাক্কা লেগে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনাটা কোন কাজের কল্পনা নয়, কারণ ধূমকেতুর লেজটা এমনই

অসম্ভব রকম হাল্কা যে পৃথিবীর সঙ্গে গুঁতোগুঁতি কর্‌তে গেলে তারই বিপদ হবার কথা। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীকে কোনদিন কোন ধূমকেতুর মাথাটার ভিতর দিয়ে

যেতে হয় তাহ'লে অবস্থাটা কেমন হয়, ঠিক বলা যায় না। সম্ভবত তখন খুব একটা জমকালো গোছের উল্কাবৃষ্টি হবে।

উল্কাবৃষ্টি জিনিষটা আমি কখন চোখে দেখিনি, কিন্তু তার যে বর্ণনা শুনেছি সে ভারি চমৎকার। আকাশে মাঝে মাঝে তারার মত এক একটা কি যেন হঠাৎ ছুট দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়--দেখে লোকে বলে "তারা খস্‌ল"; কিন্তু আসলে সে তারা নয়—উল্কা। ঐ রকম উল্কা যদি মাঝে মাঝে এক আধটা না হ'য়ে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজার আকাশের উপর দিয়ে ছুটে যায়—তখন তাকে বলে "উল্কাবৃষ্টি"। এর মত জমকালো ব্যাপার অতি অল্পই আছে। আমরা আকাশে যে সব গ্রহনক্ষত্র দেখি তারা সবাই ভাল মানুষের মত স্থির হ'য়ে থাকে, তারা ওরকম পাগলের মত ছুটাছুটি করে না। সুতরাং হাজার হাজার উল্কাকে অমন ভাবে ছুটাছুটি করতে দেখলে হঠাৎ মনে কেমন ভয় হয়—যদি দুচারটা ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহ'লে অবস্থাটা কি রকম হবে! কিন্তু আসলে তেমন ভয় পাবার কিছুই নেই। উল্কাগুলির প্রায় সমস্তই পৃথিবীতে পড়বার ঢের আগেই বাতাসের ঘষায় আপনা হ'তেই জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। যদি না জ্বল্‌ত, তবে আমরা তাদের দেখতেই পেতাম না; কারণ, একে তারা অধিকাংশেই নিতান্ত ছোট, তার উপর তাদের নিজেদের কোন আলো নেই; কেবল মরবার সময় যখন তারা আপন "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে" জ্বলে মরে, তখন তার সেই শেষ আলোতে আমরা তাদের একটুক্ষণ দেখি মাত্র। যা হোক, ভয়ের কারণ নাই বা থাকুক, একেবারে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে একথা ভাবতেও খুব আশ্চর্য্য লাগে! ব্যাপারটা চোখে দেখতে আরও আশ্চর্য্য, তাতে আর সন্দেহ কি?

আরেকটি ভয়ানক জমকালো ব্যাপারের কথা না বল্‌লে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায়—সেটি হচ্ছে সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিষটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনও ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটা পূর্ণ হ'য়ে আস্‌তে থাকে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকাণ্ড কালো ছায়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে পাহাড় নদী সব গ্রাস ক'রে ছুটে আস্‌তে থাকে—যখন বনের পশু আর আকাশের পাখী পর্য্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে কেউ চীৎকার ক'রে আর্ত্তনাদ করে, তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠ্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষত

যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য, যাদের কাছে সূর্য্যের এই হঠাৎ-নিভে-যাওয়ার কোনই অর্থ
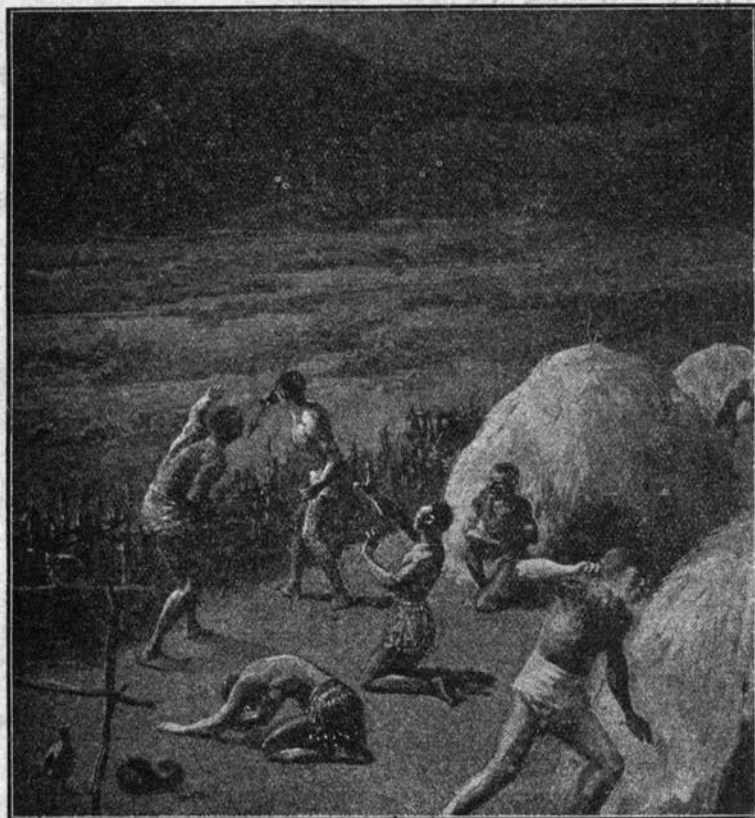
নেই, তারা যে তখন পাগলের মত অস্থির হ'য়ে বেড়াবে, এ ত খুবই স্বাভাবিক। তারাও প্রলয় বল্‌তে ঠিক এই রকমই একটা কিছু কল্পনা করে—এমনই একটা অদ্ভুত বিরাট গম্ভীর ব্যাপার—যার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে মানুষের মনকে একেবারে দমিয়ে অবশ ক'রে দেয়!

হাসির গল্প

আমাদের পোষ্টাপিসের বড় বাবুর বেজায় গল্প করিবার সখ। যেখানে সেখানে সভায় আসরে নিমন্ত্রণে তিনি তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার খুলিয়া বসেন। দুঃখের বিষয় তাঁর ভাণ্ডার অতি সামান্য—কতগুলি বাঁধা গল্প, তাহাই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সব জায়গায় চালাইয়া দেন। কিন্তু একই গল্প বার বার শুনিতে লোকের ভাল লাগিবে কেন? বড় বাবুর গল্প শুনিয়া আর লোকের হাসি পায় না। কিন্তু তবু বড় বাবুর উৎসাহও তাহাতে কিছুমাত্র কমে না।

সেদিন হঠাৎ তিনি কোথা হইতে একটা নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া মুখুজ্জেদের মজলিসে শুনাইয়া দিলেন। গল্পটা অতি সামান্য কিন্তু তবু বড় বাবুকে খাতির করিয়া সকলেই হাসিল। বড় বাবু তাহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন গল্পটা খুব লাগসই হইয়াছে। সুতরাং, তার দুদিন বাদে যদু মল্লিকের বাড়ী নিমন্ত্রণে বসিয়া তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া আবার সেই গল্প শুনাইলেন। দু একজন, যাহারা আগে শোনে নাই, তাহারা শুনিয়া বেশ একটু হাসিল। বড় বাবু ভাবিলেন গল্পটা জমিয়াছে ভাল।

তারপর ডাক্তার বাবুর ছেলের ভাতে তিনি আবার সেই গল্পই খুব উৎসাহ করিয়া শুনাইলেন। এবারে ডাক্তার বাবু ছাড়া আর কেহ গল্প শুনিয়া হাসিল না, কিন্তু বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটিকুটি।

তারপরেও যখন তিনি আরও দু তিন জায়গায় সেই একই গল্প চালাইয়া দিলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম চটিয়া গেল। বিশু বলিল, "না হে, আর ত সহ্য হয় না। বড়বাবু ব'লে আমরা এতদিন স'য়ে আছি—কিন্তু ওঁর গল্পের উৎসাহটা একটু না কমালে আর চল্‌ছে না"।

দুদিন বাদে, আমরা দশবারোজনে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় বড়বাবুর নাদুস্-নুদুস্ মূর্ত্তিখানি দেখা দিল। আমরা বলিলাম, "আজ খবরদার! ওঁর গল্প শুনে কেউ হাস্‌তে পাবে না। দেখি উনি কি করেন"। বড়বাবু বসিতেই বিশু বলিয়া উঠিল, "নাঃ, বড়বাবু আজকাল যেন কেমন হ'য়ে গেছেন। আগে কেমন মজার মজার সব গল্প বল্‌তেন। আজকাল, কৈ? কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন"। বড়বাবু একথায় ভারি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর গল্প আর আগের মত জমে না, একথাটি তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেম, "বটে? আচ্ছা রোস। আজ তোমাদের এমন গল্প শোনাব, হাসতে হাসতে তোমাদের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে"। এই বলিয়া তিনি তাঁহার

সেই মামুলি পুঁজি হইতে একটা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গল্প বলিলে কি হইবে? আমরা কেহ হাসিতে রাজি নহি—সকলেই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বিশু বলিল, "নাঃ, এ গল্পটা জুৎসই হ'ল না"। তখন বড়বাবু তাঁহার সেই পুঁজি হইতে একে একে পাঁচ সাতটি গল্প শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের মুখ পেঁচার মত আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল! তখন বড়বাবু ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "যাও যাও! তোমরা হাসতে জান না—গল্পের কদর বোঝ না—আবার গল্প শুন্‌তে চাও! এই গল্প শুনে সেদিন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত হেসে গড়াগড়ি—তোমরা এসব বুঝবে কি?" তখন আমাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সে কি বড়বাবু? আমরা হাস্‌তে জানিনে? বলেন কি! আপনার গল্প শুনে কতবার কত হেসেছি, ভেবে দেখুন ত। আজকাল আপনার গল্পগুলো তেমন খোলে না—তা হাসব কোত্থেকে? এই ত, বিশুদা' যখন গল্প বলে তখন কি আমরা হাসিনে? কি বলেন?"

বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন "বিশু? ও আবার গল্প জানে নাকি? আরে, একসঙ্গে দুটো কথা বল্‌তে ওর মুখে আটকায়, ও আবার গল্প বল্‌বে কি?" বিশু বলিল "বিলক্ষণ! আমার গল্প শোনেন নি বুঝি?" আমরা সকলে উৎসাহ করিয়া বলিলাম—"হাঁ হাঁ একটা শুনিয়ে দাও ত"। বিশু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল "এক ছিল রাজা"—শুনিয়া আমাদের চার পাঁচ জন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে কি মজারে, কি মজা! এক ছিল রাজা! হাঃ হাঃ হাঃ হা"।

বিশু বলিল "রাজার তিন ছেলে"—

শুনিবামাত্র আমরা একসঙ্গে প্রাণপণে এমন সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম যে, বিশু নিজেই চমকাইয়া উঠিল। সকলে হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম—কেহ বলিল "দোহাই বিশুদা, আর হাসিও না"—কেহ বলিল "বিশু বাবু রক্ষে করুন—ঢের হ'য়েছে"। কেহ কেহ এমন ভাব দেখাইল যেন হাসিতে হাসিতে তাহাদের পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে।

বড় বাবু কিন্তু বিষম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "এসব ওই বিশুর কারসাজি। ওই আগে থেকে সব শিখিয়ে এনেছে। নইলে, ও যা বল্‌লে তাতে হাসবার মত কি আছে বাপু?" এই বলিয়া তিনি রাগে গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

সেই সময় হইতে বড় বাবুর গল্প বলার সখটা বেশ একটু কমিয়াছে। এখন আর তিনি যখন তখন কথায় কথায় হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসেন না।

তিমির খেয়াল

রুশিয়ার দুরন্ত শীতে মানুষে যখন নির্জ্জন পথে চলাফিরা করে, তখন অনেক সময় নেকড়ে বাঘের পাল তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহারা যে বন্ধুভাবে চলে না, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। তাহাদের দূরে রাখিবার জন্য মানুষে অস্ত্র শস্ত্র বন্দুক লইয়া পথে বাহির হয়, এবং পারতপক্ষে একলা কেহ সে সকল পথে যাওয়া আসা করিতে চায় না।

সমুদ্রের পথে যখন বড় বড় জাহাজ চলাফিরা করে তখনও অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহাদের আশে পাশে নানা জাতীয় মাছ ও হাঙ্গর ঘুরিয়া বেড়ায়। জাহাজ হইতে কত জিনিষ কত সময়ে জলেফেলা হয়, তাহার মধ্যে তরকারীর খোসা, মাংসের বা হাড়ের টুকরা, নষ্ট খাবার প্রভৃতি কিছু জলে পড়িবামাত্র তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সব খাইয়া ফেলে। ঐ খাবারের লোভেই তাহারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কেবল মাছ কেন, কত পাখীকেও অনেক সময় দেখা যায়, মাঝসমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল উড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের অনেকে আসে কেবল কৌতুহল মিটাইবার জন্য, অনেকে আসে খাবার লোভে অথবা বিশ্রামের আশায়। কিন্তু খামখা বিনা কারণে কেহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে না।

কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের উপকুলের কাছে এক জায়গায় ছোট খাট—অর্থাৎ মোটে বারো হাত লম্বা—একটি তিমি আছে, তার বাড়ীর কাছ দিয়া যত জাহাজ চলাফিরা করে, সকলের সঙ্গেই সে আত্মীয়তা

করিতে আসে। এই রকম সে কত বছর করিয়া আসিতেছে, কেন করে তাহা কেহ জানে না। জাহাজ হইতে যে সকল খাবার জিনিষ জলে ফেলা হয়, তাহার কোনটাই তার খাদ্য নয়—জাহাজের লোকেদের দ্বারা তার কোন রকম উপকার হওয়াও সম্ভব নয়—অথচ সে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একবার খানিক দেখা না করিয়া ছাড়ে না। শুধু দেখা নয়, আধ ঘণ্টাখানেক অনায়াসে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ভাবে চলে, যেন সে জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইতে চায়। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে গা ঘষিয়া, আর ঢেউয়ের ফেণায় ডিগবাজি খাইয়া সে নানা রকমে মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সেখানকার নাবিকেরা সকলেই এই অদ্ভুত তিমির কথা জানে। তাহারা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছে "পেলোরাস্ জ্যাক্"—'পেলোরাস্' ওই জায়গাটার নাম। এই তিমির সম্বন্ধে সে দেশে অনেক রকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। একবার নাকি কোন্ জাহাজ হইতে কে একজন লোক "জ্যাক্"কে গুলি করিয়াছিল—তারপর অনেক দিন তাহাকে দেখা যায় নাই। আবার সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই জাহাজটার কাছে আর কখনও আসে নাই। নিউজিল্যাণ্ড মাওরিদের দেশ— তাহারা এই তিমিকে দেবতার মত ভক্তি করে। এমন কি সে দেশের গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইস্তাহার দিয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কেউ যেন "জ্যাকে"র কোন রকম অনিষ্ট না করে।

ও বাবা !

পড়্‌তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র্ ঘড়র্ নাক ডাকান ধূম ?
সখ যে বড় বেজায় দেখি—দিনের বেলায় ঘুম !
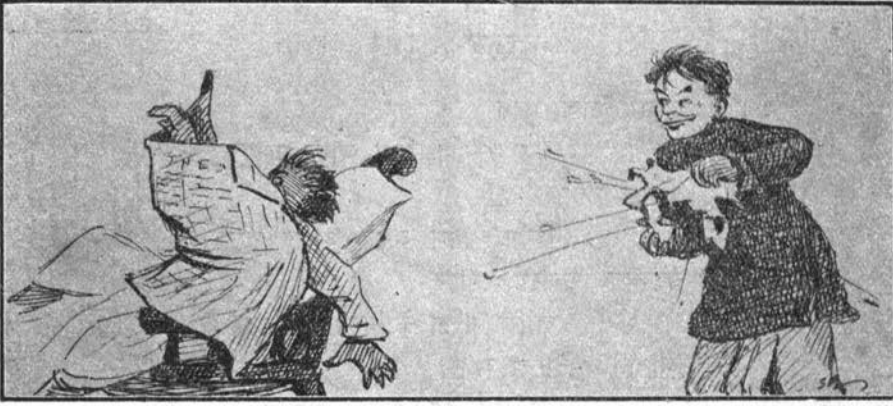
বাতাস পোরা এই যে থলি দেখ্‌ছ আমার হাতে,
দুড়ুম ক'রে পিট্‌লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়্‌বে কূপোকাৎ
লাগাও তবে—ধূমধড়াক্কা! ক্যাবাৎ! ক্যাবাৎ!
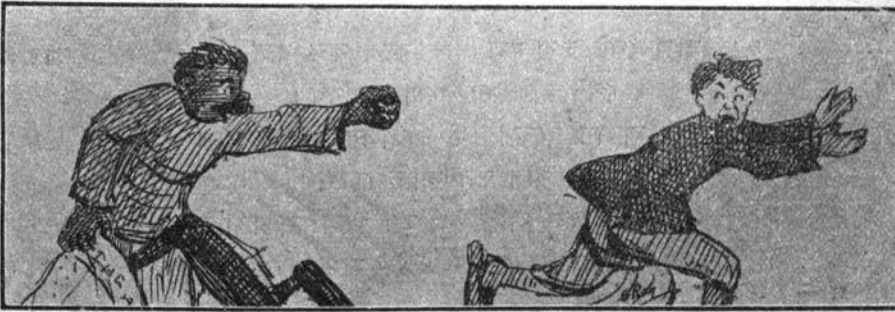
ও বাবারে! এ কেরে ভাই? মারবে নাকি চাঁটি?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি! সব করেছে মাটি!
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আস্‌ছে আমায় তেড়ে—
আর কেন ভাই? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে!

নূতন ধাঁধা

১। লম্বা ছুঁচাল মুখে
থুতু ফেলি বিশ হাত দূরে।
বছরে বছরে তাই
ফিরি আসি হাতে হাতে ঘুরে।
জলেতে ডুবায়ে মোরে
ল্যাজ ধ'রে টানিবে আমার,
আবার গুটালে ল্যাজ
দেখিবে সে কেমন বাহার।

২। সমস্ত পাইলে ভাই থাকে বেশ সুখে
মাথা ছাড়ি বনে বনে কাটাইল দুখে।
মাঝ বাদে কেয়াবাৎ ফল খাও তেড়ে
পশ্চিমে সহর দেখ শেষটুকু ছেড়ে।

৩। সারা পেট ভরা জল করে কত কল কল
পেট বুঝি ওঠে মোর ফেঁপে।
রুদ্ধ বাতাস বুকে ঠেলিয়া উঠিছে মুখে
প্রাণ পণে তবু আছি চেপে।
মাথায় মারিলে বাড়ি মুখ খুলে তাড়াতাড়ি
ফঁস্ ফঁস্ তেড়ে উঠি ক্ষেপে।
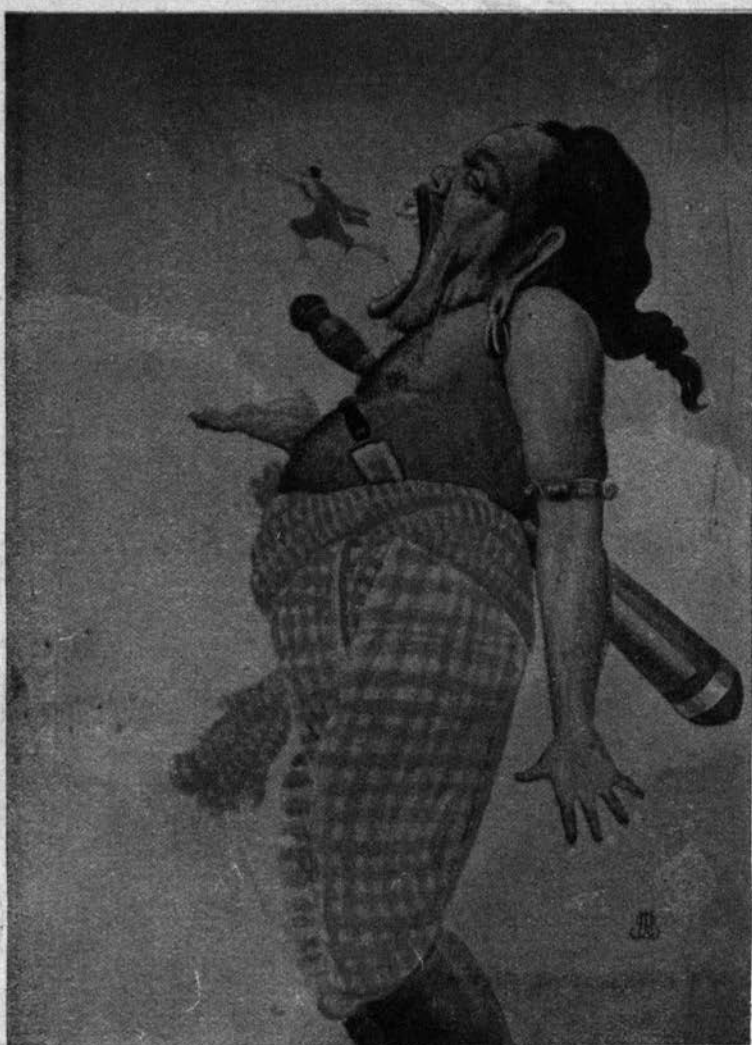
বৃত্রাসুরের হাইতোলা

(১৫২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম বর্ষ ভাদ্র, ১৩২৪ পঞ্চম সংখ্যা

আমিও ফুটে উঠি

আছি আমি অন্ধকারে এ ঘোর বিজন বনে ;
ফুলের মত ফুট্‌ব ব'লে সাধ হ'য়েছে মনে।
কর্‌ছে পাখী ডাকাডাকি, ভোম্‌রা করে গান ;
মলয়পবন দিচ্ছে দোলন আকুল ফুলের প্রাণ।
চারি দিকে উঠ্‌ল জেগে কুসুম রাশি রাশি ;
ছড়িয়ে প'ল আলোক সাথে, তা'দের বিমল হাসি।
আকাশ ব'য়ে নূতন আলো আস্‌ছে ধরায় নামি';
ক্ষুদ্র হৃদয় রুদ্ধ ক'রে আর্ রব না আমি।
নবীন অরুণ কিরণ দিয়ে দাও এ আঁধার টুটি';
মনের সুখে হাসি মুখে আমিও ফুটে উঠি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা গিল্‌গামী

(অসুরের রাজধানী প্রাচীন নিনেভা সহরে পাথরে খোদাই করা লেখার মধ্যে এই গল্পটি পাওয়া গিয়াছে)

বহুকাল পূর্ব্বে প্রলয়কালে জলপ্লাবনে পৃথিবী যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন বাঁচিয়া রহিলেন শুধু—সামাস্‌। পরমধার্ম্মিক সামাস্‌কে দেবতারা অনুগ্রহ করিয়া বাঁচাইলেন। দেবতার কৃপায় তিনি অমর হইয়া দেবলোকে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ধার্ম্মিক সামাসেরই বংশধর ছিলেন—রাজা গিল্‌গামী। গিল্‌গামী বহু পূর্ব্বে সুরক্ষিত উরুক্‌দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মত সাহসী ও বলবীর্য্যশালী যোদ্ধা সে সময়ে অন্য কেহ ছিল না। গিল্‌গামীর শারীরিক সৌন্দর্য্যও ছিল অসাধারণ—তেমন সৌন্দর্য্য মানুষে সম্ভবে না। তাঁহার এই সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্যের জন্যই প্রজারা নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশীভূত থাকিত। প্রজারা দিবারাত্রি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিত—"আমাদের উরুকের রাজা গিল্‌গামীর মত জ্ঞানী, ন্যায়বান্‌ ও ক্ষমতাশালী পৃথিবীতে আর নাই—আমাদের মত সুখী কে ?"

দেবতাদিগের মধ্যে 'ইস্তার' ছিলেন সৌন্দর্য্যের রাণী। একদিন গিল্‌গামী রাজবাড়ীর বাগানে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে দেবী ইস্তার হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"গিল্‌গামি ! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, তুমি আমাকে বিবাহ কর ; তোমার সুখ সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না—পৃথিবীর রাজা রাজড়া সবাই মাথা নীচু করিয়া তোমাকে সম্মান করিবেন এবং তোমার বশীভূত হইবেন।"

এই কথা শুনিয়া গিল্‌গামী ইস্তারের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বলিলেন—"দেবি ! আপনি আমাকে যে সম্মান দেখাইলেন, মানুষ সে সম্মান পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু তবু আপনাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না। আপনি এখন আমাকে ভালবাসেন—সত্য। কিন্তু আমি সামান্য মানুষমাত্র—হয়ত কিছুদিন পরে আবার আমাকে ঘৃণা করিবেন এবং আমার অনিষ্ট করিতেও ছাড়িবেন না।"

ইহা শুনিয়া ইস্তার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার মেজাজটি ছিল ভারী কড়া, তাঁহার ইচ্ছামত কাজে কেহ বাধা দিলে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি দেবলোকে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার পিতা 'আনুকে' বলিলেন—"বাবা ! গিল্‌গামী আমার অপমান করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। গিল্‌গামীর রাজ্য ধ্বংস করিয়া তাহাকেও বধ করিতে পারে—এমন একটা ভীষণ 'বৃষাসুর' সৃষ্টি করিয়া আমাকে দিন।"

আনু ভাবিয়া দেখিলেন, গিল্‌গামী এমন কিছু গুরুতর অন্যায় কাজ করেন নাই, যাহার দরুণ তাঁহাকে সাজা দিতে হইবে—সুতরাং তিনি কেন কন্যার অন্যায় আব্দার শুনিবেন ? পিতাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ইস্তার রাগে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আমার কথা যদি না শুনেন, এখনই আমি সৃষ্টি নাশ করিয়া ফেলিব !" তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দেবরাজ আনু কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভয়ঙ্কর বিকটাকৃতি একটা বৃষাসুর প্রস্তুত করিয়া দিলেন—তার পায়ের খুরগুলি পিতলের আর মাথায় সাংঘাতিক পিতলের শিং।

উরুকরাজ্য বিনাশ করিবার জন্য ইস্তার এই ভীষণ বৃষাসুরকে পাঠাইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজা গিল্‌গামী শুনিতে পাইলেন যে, ভয়ঙ্কর একটা ষাঁড় আসিয়া তাঁহার রাজ্য ছারখার করিয়া দিল ! প্রজাদিগের দারুণ ভয় ও বিপদের কথা শুনিয়া গিল্‌গামী বর্ম্ম আঁটিয়া, অস্ত্র লইয়া একাকী এই বৃষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন।

ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে, জলাজায়গায় একটা গর্ত্তের মধ্যে এই দানব ষাঁড় থাকিত। কালবিলম্ব না করিয়া গিল্‌গামী সেখানে গিয়া উপস্থিত ! গর্ত্তের মুখে গিয়া তাঁহার হাতীর দাঁতের তৈরী শিঙ্গাটি ফুঁকিলেন। শিঙ্গার শব্দ শুনিবামাত্র দানব বৃষ রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে বাহিরে আসিল। তাহার নাক মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইতেছে—তাহার পায়ের চাপে মাটি কাঁপিয়া উঠিল !

গিল্‌গামীকে দেখিয়াই শিং নীচু করিয়া তাঁহাকে বেগে আক্রমণ করিল। গিল্‌গামী ত্রস্ত একপাশে সরিয়া গিয়া তলোয়ার দিয়া ষাঁড়ের পায়ে আঘাত করিলেন। আক্রমনের বেগে দুষ্ট ষাঁড় খানিকদূর অগ্রসর হইয়া গেল কিন্তু ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহার পিছন পিছন তাড়া করিয়া গিল্‌গামী ক্রমাগত তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বৃষাসুর জব্দ হইল না ; রাগে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিল। তখন গিল্‌গামী হাতের তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া ষাঁড়ের পিতলের শিং দুটা ধরিয়া ফেলিলেন এবং প্রচণ্ড বলে তাহাকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া এক মোচড়ে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে বধ করিলেন।

বৃষাসুরকে পরাজয় করিয়া গিল্‌গামী রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে প্রজাদিগের মধ্যে মহা আনন্দ উৎসবের ধুম্ পড়িয়া গেল ! রাজা গিল্‌গামীর কিন্তু চিন্তা দূর হইল না ! কারণ, তিনি জানিতেন যে প্রতিহিংসাপরায়ণ ইস্তার তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দিবেন না।

সেইদিন রাত্রিতে আহারাদির পর গিল্‌গামী নিদ্রা গেলে, স্বপ্নে ইস্তার তাঁহাকে দেখা দিলেন। কি ভীষণ তাঁহার চেহারা! রাগে যেন ফাটিয়া যাইতেছেন! গিল্‌গামী তাঁহার

দিকে তাকাইতেই ভরসা পাইলেন না। ইস্তার বলিলেন—"আমার বৃষাসুরকে মারিয়া

মনে করিও না যে তুমি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছ! এবারে তোমাকে আমি অন্য উপায়ে জব্দ করিব। তোমার যে সৌন্দর্য্যের বড় অহঙ্কার কর, সেই সৌন্দর্য্য আমি নষ্ট করিব। তুমি জাগিয়া দেখিবে—তোমার গায়ের রং ঘুটঘুটে কাল হইয়া গিয়াছে, আর তোমার চেহারা এমনই বিকট ও কুৎসিৎ হইয়াছে যে তোমাকে দেখিলেই লোক ভয়ে ও ঘৃণায় দূরে পলায়ন করিবে।" এই বলিয়া দেবী ইস্তার অন্তর্হিত হইলেন।

তখনই গিল্‌গামীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন—সত্যসত্যই তাঁহার চেহারা অতি কদাকার ঘুটঘুটে কাল একটা বাঁটুল লোকের মত হইয়াছে। কোথায় বা তাঁর সেই সৌন্দর্য্য আর কোথায় বা তাঁর সেই বীরপুরুষের মত সুদীর্ঘ সুঠাম দেহ!

গিল্‌গামী শোকে দুঃখে ও নিরাশায় পাগলের মত হইয়া, রাজবাড়ী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বনে চলিয়া গেলেন—ভাবিলেন, নির্জ্জন বনে লুকাইয়া থাকিয়া লোকের চক্ষু এড়াইবেন।

দিনের পর দিন তিনি বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং শেষে ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরভূমি ছাড়িয়া মরুভূমির ভিতর দিয়া ক্রমে তিনি মাস্তুপর্ব্বতে যাইবার অন্ধকার পথে গিয়া উপস্থিত! সে পথের মুখে অতি ভয়ঙ্কর প্রহরী! তাহাদের মানুষের মত মুখ কিন্তু শরীর বিছার মত! কি ভীষণ জন্তু—তাহাদের দৃষ্টিতে মানুষ মরিয়া যায়! ইহাদিগকে দেখিয়াই গিল্‌গামী ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাকে দেখিয়া এই বিছামানুষগুলির মনে দয়া হইল। তারপর তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদের দলপতি বলিল—"গিল্‌গামি! তোমার পূর্ব্বের সুন্দর ও শক্তিশালী দেহ কি করিয়া ফিরিয়া পাইবে তাহা বলিয়া দিতেছি—পৃথিবীর অপর প্রান্তে শান্তি দ্বীপে সৌন্দর্য্যের ঝরণা আছে। সেই ঝরণার মন্ত্রপূত জলে ডুব দিলে তোমার সব ফিরিয়া পাইবে।"

গিল্‌গামী বলিলেন—"দোহাই তোমাদের! সেই পথ আমায় বলিয়া দাও, আমি এখনই সেখানে যাইব।"

বিছামানুষের দলপতি বলিল—"প্রথমে তোমাকে এই ভীষণ অন্ধকার মাস্তুপর্ব্বত পার হইতে হইবে। অন্ধকারে পথ চিনিয়া পর্ব্বত পার হইতে পারিলে, সমুদ্রের তীরে অতি সুন্দর এক গভীর বন পাইবে। সে বন পার হইয়া সমুদ্রের রাণী 'সবিতুকে' আরাধনা করিও, তিনিই তোমাকে উপায় বলিয়া দিবেন।"

কৃতজ্ঞচিত্তে বিছামানুষদের নিকট বিদায় লইয়া গিল্‌গামী পর্ব্বতে চড়িলেন এবং সেই ভীষণ অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। তখন যদি সাহায্যের জন্য তাঁহার বংশের আদিপুরুষ সামাসের নিকট প্রার্থনা না করিতেন তবে আর তিনি জীবিত থাকিতেন না। যাহা হউক, সামাসের অনুগ্রহে হঠাৎ আকাশে একটি আগুনের বাণ জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাকে যে দিকে যাইতে হইবে, বাণের মুখটি সেই দিকটাই দেখাইয়া দিতেছে।

তখন, অগ্নিবাণ সম্মুখে রাখিয়া গিল্‌গামী পাহাড়ে উঠিলেন এবং ক্রমে পাহাড় অতিক্রম করিবামাত্র পুনরায় সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন, সম্মুখেই সেই বন এবং বনের ভিতর দিয়া, পৃথিবী ঘিরিয়া যে বিরাট সমুদ্র রহিয়াছে, সেই সমুদ্র দেখা যাইতেছে।

গিল্‌গামী মনের আনন্দে দেখিতে দেখিতে বন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিছামানুষের উপদেশ মত তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন— "হে দেবি সবিতু! দয়া কর—দোহাই তোমার! সমুদ্র পার করিয়া দাও, নতুবা সমুদ্র-তীরে প্রাণত্যাগ করিব।"

গিল্‌গামীর করুণ প্রার্থনা শুনিয়া দেবীর মনে দয়া হইল, তিনি বলিলেন— "গিল্‌গামি! কি করিয়া তুমি সমুদ্র পার হইবে? মানুষের পক্ষে কি তা কখনও সম্ভব? এক সাধু সামাস্ ভিন্ন অন্য কোন মানুষ এপর্য্যন্ত পার হইতে পারে নাই। যদি বা পার হও তবু ওপারে যে ঘুর্ণিপাক আছে তাহাতে পড়িলে তোমার মরণ নিশ্চিত! সামাসের একজন মাঝি আছে, সে ছাড়া অন্য কেহ তোমাকে পার করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া দেবী সবিতু, সামাসের মাঝি "উর্‌বেলের" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ডাকিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঢেউএর উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে ছোট একটি কাল রঙের নৌকা আসিয়া উপস্থিত। নৌকায় একটিমাত্র মাঝি—তার সমস্ত শরীর একটা আলখাল্লা দিয়া ঢাকা। দেবীকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া গিল্‌গামী নৌকায় চড়িলেন। ক্রমাগত চল্লিশ দিন দুইজনে নৌকা বাহিয়া চলিতে চলিতে সমুদ্রের পরপারে সেই ভীষণ ঘুর্ণিপাকের নিকটে গিয়া উপস্থিত! যাহা হউক, মাঝি উর্‌বেলের আশ্চর্য্য কৌশলে গিল্‌গামী বিপদ্ পার হইলেন—ঘুর্ণিপাক পিছনে পড়িয়া রহিল।

ঘূর্ণিপাক পার হইয়া ক্রমে দূরে একটি দ্বীপ দেখা গেল। সেই দ্বীপের নিকটে গেলে সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ একব্যক্তি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তীরে আসিলেন এবং দুই হাত বাড়াইয়া গিল্‌গামীকে বলিলেন—"এস পুত্র! শান্তি দ্বীপে তোমার শুভাগমন হউক। অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া, বহু বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া এখানে আসিয়াছ—শীঘ্রই তাহার পুরস্কার পাইবে।"

লোকটিকে দেখিয়াই গিল্‌গামী চিনিতে পারিলেন যে ইনিই সামাস্। তখন একলাফে তীরে উঠিয়া বলিলেন—"পিতা! আপনার আশ্বাসবাণী শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এখন শীঘ্র আমাকে সৌন্দর্য্যের ঝরণা দেখাইয়া দিন, সে জলে ডুব দিয়া আমার এই বিকট চেহারাটাকে দূর করি।"

সামাস্ বলিলেন—"ব্যস্ত হইও না! আগে একটু নিদ্রা যাও; দেবতার কৃপায় তোমার শরীরে বল ফিরিয়া আসুক।" এই বলিয়া, মন্ত্রবলে তিনি গিল্‌গামীকে ঘুম পাড়াইয়া তাঁহার মাথার কাছে কিছু খাবার রাখিয়া দিলেন।

ক্রমাগত ছয় দিন ছয় রাত্রি ঘুমাইয়া গিল্‌গামী জাগিলেন এবং সেই মন্ত্রপড়া খাদ্য আহার করিবামাত্র তাঁহার শরীরে পুনরায় সিংহের মত বল ফিরিয়া আসিল। তখন সামাস্ আসিয়া তাঁহার হাতদুখানি ধরিয়া তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের ঝরণার নিকট লইয়া গেলেন। সেই ঝরণার জলে ডুবিবামাত্র গিল্‌গামীর পূর্ব্বদেহ সৌন্দর্য্য ও শক্তি লইয়া ফিরিয়া আসিল!

গিল্‌গামীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হাঁটু গাড়িয়া সামাস্‌কে বলিলেন—"পিতা! আপনার অনুগ্রহে আমার দুর্দ্দশার শেষ হইল! আমি কতদূর কৃতজ্ঞ হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ!"

সামাস্ বলিলেন—"উদ্যোগী পুরুষ লক্ষ্মীলাভ করে—দেবতার কৃপায় এবং নিজের সাহসের বলে তুমি তোমার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছ! সুতরাং আমাকে ধন্যবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন দেশে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় পরমসুখে রাজত্ব কর।"

উরবেলের সাহায্যে পুনরায় সমুদ্র পার হইয়া এবং সামাসের কৃপায় অন্ধকার মাসুপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিল্‌গামী বিছামানুষদের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা কত খুসী হইল! তাঁহাকে সুন্দর পোষাক পরাইয়া, মাথায় রাজমুকুট দিয়া, আশ্চর্য্য তেজস্বী ঘোড়ায় চড়াইয়া বিদায় দিল।

রাজা গিলিগামী দেশে ফিরিয়া আসিলে, প্রজাদের আনন্দের সীমা রহিল না। দেশে আসিয়াই সকলের আগে তিনি নানা রকমে পূজা করিয়া দেবী ইস্তারকে সন্তুষ্ট করিলেন—দেবীর রাগ দূর হইল! দেবতা মনুষ্য সকলের সম্মান লাভ করিয়া রাজা গিল্‌গামী বহু বৎসর উরুক্ দেশে পরমসুখে রাজত্ব করিলেন।

পুরাকল্পীয় রামায়ণ

(পদ্মপুরাণ)

রাজা হইবার পর এক দিন রাম সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মানন্দন মহামুনি বসিষ্ঠ দেব, শম্ভু নামে জনৈক মুনির সহিত রাজসভায় আসিয়া রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর, রাবণ-যুদ্ধের ব্যাপার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তার পর দ্বিজবর শম্ভু দুই একটি বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ রাম রাবণকে বধ করিয়া পরে কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি ঘটনার কথা বলিলেন। ইহাতে রাম অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করায় জাম্ববান বলিলেন—"প্রভু! শম্ভুমুনি যাহা বলিলেন তাহা পুরাকল্পীয় রামায়ণের কথা। সুতরাং আপনার ঘটনার সহিত মিলিতেছে না। আমিও ব্রহ্মার মুখে ঐ রামায়ণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

সুমনা নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল, তাহার রাজার নাম ছিল, সাধ্য। তিনি বড় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। অযোধ্যার রাজা দশরথ সুমনানগর জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া শত অক্ষৌহিনী সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক মাস যাবৎ যুদ্ধ করিয়া দশরথ সাধ্যকে পরাস্ত করিলেন। তখন সাধ্যপুত্র ভূষণ আসিয়া দশরথের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভূষণ—রূপে, গুণে ও পরাক্রমে বাস্তবিকই পৃথিবীর ভূষণ, অর্থাৎ অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা দশরথের মনে স্নেহ ও দয়া হইল, তিনি আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন—"এমন সুন্দর বালকের শরীরে আমি কিরূপে অস্ত্রের আঘাত করিব? আহা! আমারও ঠিক এইরূপ সুন্দর একটি পুত্র ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, বাছা আমার ভল্লুকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বালককে দেখিয়া আমার সেই পুত্রের কথা মনে পড়িতেছে!"

রাজা দশরথের মনে এইরূপ দয়ার আবির্ভাব হওয়াতে তিনি ভূষণের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া, তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং সাধ্যের বাড়ীতে এক মাস বন্ধুভাবে

বাস করিলেন। ভূষণকে যতই দেখেন ততই দশরথের মনে পুত্রমুখ দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে! অবশেষে একদিন সাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, কি করিলে

তোমার ভূষণের মত পুত্র লাভ করিতে পারি?" সাধ্য বলিলেন—"মহারাজ! আপনি বিষ্ণুর পূজা করুন—তিনি সন্তুষ্ট হইলে আপনাকে আমার ভূষণের মত পরমসুন্দর ও গুণবান্ পুত্র দিবেন।"

রাজা দশরথ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সাধ্যের পরামর্শমত পুত্রলাভের জন্য বিষ্ণুর উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে, বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া দশরথকে দেখা দিয়া বলিলেন—"আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।" দশরথ বলিলেন—"প্রভু! দয়া করিয়া আমায় চারিটি পুত্র দান করুন।" এই সংবাদ পাইয়া দশরথের চারিটি রাণী—কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা আর সুবেশা—যজ্ঞস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কৌশল্যা বলিলেন—"এই দেবতা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন

তবে ইনিই আমার পুত্র হইয়া জন্ম লউন। বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া যজ্ঞীয় পায়সে প্রবেশ করিলেন।

তখন দশরথ সেই পায়স চারি ভাগ করিয়া রাণীদিগকে খাইতে দিলেন। ক্রমে রাজার চারি পুত্র জন্মিল—কৌশল্যার পুত্র রাম, সুমিত্রার পুত্র লক্ষণ, সুরূপার পুত্র ভরত আর সুবেশার পুত্র শত্রুঘ্ন! ক্রমে শিশুরা বড় হইয়া উঠিল; মহামুনি বসিষ্ঠদেব তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইলেন, যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন—দেখিতে দেখিতে সকলেই পৃথিবীর সকল রকম বিদ্যায় নিপুণ হইল।

পুত্রদিগের বিবাহের কন্যা সন্ধানের জন্য দশরথ নানা দেশের রাজাদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন। এক দূত কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মহারাজ! বিদর্ভ-দেশের রাজা বিদেহের একটি কন্যা আছে, সেটিকে তিনি যজ্ঞ করিয়া পাইয়াছেন; তেমন সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা আর নাই। এই কন্যাই আপনার রামের উপযুক্ত"।

এই সংবাদ শুনিয়া দশরথ মহামুনি বসিষ্ঠ প্রভৃতিকে সেখানে পাঠাইলেন। তাঁহারা কন্যা দেখিয়া, লগ্নপত্র স্থির করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলে দশরথও মহা সমারোহে মিথিলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সবই ঠিক, এমন সময়ে বিবাহের পূর্ব্বদিন নারদ মুনি মিথিলায় উপস্থিত হইয়া বিদেহরাজকে বলিলেন—"তোমার কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয় বিবাহ, সুতরাং ইহা স্বয়ংবর নিয়মে হওয়া উচিত; নতুবা বড়ই দোষের কথা হইবে।" বিদেহরাজ সে কথা দশরথকে বলিলেন, দশরথও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন বিদেহ দূত পাঠাইয়া নানা দেশের রাজাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রণ করার পরে তিনি ভাবিলেন—"হায়! কি করিলাম? রামকে কন্যা দিব বলিয়া কথা দিয়াছি, লগ্নপত্র স্থির হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আবার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিতে গেলাম কেন?"

এই দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি বিদেহরাজের ঘুম হইল না। তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন —"তোমার কোন ভাবনা নাই, রামই সীতার স্বামী হইবে! তুমি আমার এই পিণাক ধনুটি লও। ধনুতে গুণ পরান নাই। যে ব্যক্তি ইহাতে গুণ পরাইতে পারিবে তাহাকেই তুমি সীতা দিবে—এই প্রতিজ্ঞা কর।" এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন সেই ধনুখানি বিদেহরাজ সভায় রাখাইলেন। তারপর, দেবতা গন্ধর্ব্ব

হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মান্যগণ্য বলবীর্য্যশালী রাজাগণ একে একে সকলেই স্বয়ংবরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদেহরাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিলে, প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া ধনুকে গুণ পরাইতে বহু চেষ্টা করিয়াও ধনু বাঁকাইতে পারিলেন না। তারপর সূর্য্য আসিয়া অনেক টানাটানির পর একেবারে হয়রান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পবনদেবের শরীরে অসাধারণ শক্তি; কিন্তু তিনিও ধনুকের গুঁতা খাইয়া একেবারে চিৎপাৎ!

এই সময়ে সহস্রবাহু বাণাসুর, অনেক অসুর সঙ্গে লইয়া স্বয়ং প্রহ্লাদের সহিত সভায় আসিয়া উপস্থিত! দেবতাদিগের চেষ্টা বিফল হইলে অসুররাজ বাণ তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিয়া ধনুর নিকটে গেলেন; কিন্তু ধনুকে গুণ পরান দূরে থাকুক তিনি সেটাকে মাটি হইতে দুই আঙ্গুলের বেশী তুলিতেই পারিলেন না। ইহার পর বলি, প্রহ্লাদ প্রভৃতি আরও অনেক অসুর হার মানিল।

তারপর আসিলেন ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশ্বামিত্র ছিলেন ভারী তেজস্বী। বিশ্বামিত্র ধনু লইয়া অতি কষ্টে নোয়াইলেন কিন্তু এক আঙ্গুলের জন্য গুণ পরাইতে পারিলেন না। বিশ্বামিত্রের পরে আর কোন ব্রাহ্মণ চেষ্টা করিতে ভরসা পাইলেন না। ইহার পর ক্ষত্রিয় রাজারা একে একে সকলেই পরাজয় মানিলে রাম ধনু স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া হাতে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া সভার সকলে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন—"দেখ, দেখ বালকের স্পর্দ্ধা দেখ!" তাহার পর রাম অনায়াসে ধনুতে গুণ পরাইয়া এমন ভীষণ টঙ্কার দিলেন যে সকলের কাণে তালা লাগিয়া গেল! তখন বিদেহরাজ রামকে সীতা দান করিলেন।

এ অপমান রাজাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রামের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাম তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া, সীতাকে লইয়া সকলের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এদিকে ভারতের মা কেকয়রাজের কন্যা সুবেশা, রাম রাজা হইয়াছেন শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দশরথকে বলিলেন—"আমাকে যে বর দিবে বলিয়াছিলে, সে বর এখন দাও—রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাক্ আর ভরত রাজা হউক।" দশরথের মত সত্যবাদী লোক প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারেন না।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাত্রা করিলেন। সেই রাম বনে গিয়া রাক্ষস

বধ প্রভৃতি অদ্ভুত কাজ সকল করিলেন। রামায়ণে যেরূপ সীতাহরণ প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেই রামেরও সেইরূপ ঘটিল।

তারপর রাম, যেখানে সুগ্রীবের বাড়ী ছিল সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গেলেন। সেখানে আম গাছের ডালে ধনুর্ব্বাণ ঝুলাইয়া গাছের তলায় আশ্রয় লইলেন—সঙ্গে একমাত্র লক্ষ্মণ! সেই গাছের ডালে বসিয়া একটা বানর আম খাইতে খাইতে গান করিতেছিল। রাম সেই বানরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কাহার লোক? তোমার নাম কি?" বানর বলিল—"আমার নাম হনুমান, আমি সুগ্রীবের লোক।" এই বলিয়া, রামকে প্রণাম করিয়া সে সুগ্রীবের নিকট গিয়া তাঁহার সংবাদ দিল।

সুগ্রীব তাড়াতাড়ি জল ও ফল মূল লইয়া রামের নিকট গেল এবং অনেক সমাদর করিয়া রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?" সুগ্রীবের কথায় রাম লক্ষ্মণকে দিয়া সীতাহরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলাইলেন।

সুগ্রীব বলিল—"ইতিমধ্যে রাবণ এক রমণীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি যাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে, এইখানে এই অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া গিয়াছেন, দেখুন দেখি অলঙ্কারগুলি আপনার স্ত্রীর কিনা?" অলঙ্কারগুলি দেখিয়া, সীতার বলিয়া চিনিতে পারিয়া রাম অনেক কান্নাকাটি করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই রাবণ কোন দিকে গিয়াছে?" সুগ্রীব বলিল—"সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।"

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়া তাহার দুর্দ্দান্ত ভাই বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবের রাজ্য উদ্ধার করিলেন। তারপর সুগ্রীবের দল বল লইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া বলিলেন—"লঙ্কা কোথায়? সীতা কোথায়? আর আমার শত্রু সে রাবণই বা কোথায়?"

তারপর রামের অনুমতি লইয়া হনুমান সাগর পার হইয়া লঙ্কায় গেল। এবং অশোক বনের মধ্যে সীতার সন্ধানে যাইয়া লোকজন মারিয়া ঘর বাড়ী পোড়াইয়া আবার রামের নিকট ফিরিয়া আসিল।

তখন সকলের মনে ভাবনা হইল—সমুদ্রলঙ্ঘন কি করিয়া করা যায়? অনেক চিন্তার পর রাম মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। রামের পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দর্শন দিয়া বলিলেন—"আমার পিণাক ধনু আছে; সেই ধনু সেতুর মত করিয়া সমুদ্রের উপরে রাখ এবং তাহার উপর দিয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাও।" এই বলিয়া, স্মরণ করিবামাত্র পিণাক ধনু আসিয়া উপস্থিত হইলে উহা রামকে দিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

রাম পিণাক ধনু লইয়া লঙ্কার দিকে সমুদ্রের উপরে ফেলিলেন। ষাটপরার্দ্ধ বানর ও রামলক্ষ্মণ ভরসা করিয়া ধনুর উপর চড়িলেন, ধনুকের ডগাটি একেবারে সমুদ্রের অপর পারের তীরে গিয়া লাগিল। তাঁহারা ধনুর উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে পরপারে গেলেন। অতিকায় নামক এক রাক্ষস রাবণকে গিয়া এই সংবাদ দিল। রাবণ বলিল—"ভালই হইয়াছে ; আমাদের প্রচুর খাদ্য জুটিয়াছে !"

এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা হইলে, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বমান প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাগণ অনেক বানরসৈন্য লইয়া নিকটস্থ এক বাগানে গিয়া ফল মূল খাইল, বাগান ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিল এবং প্রহরী রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া লঙ্কার দিকে ছুটিল। সেখানে গিয়া ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া, সকলকে বধ করিয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল ! এই সংবাদ শ্রবণে রাবণ ইন্দ্রজিৎকে ডাকিয়া হুকুম দিল—"বানরদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক যোদ্ধা, কত মায়ামন্ত্র জানে ! সে আকাশে লুকাইয়া অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন হনুমান ও জাম্বমান ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে এক লাফে আকাশে উঠিল এবং পর্ব্বতের চূড়া দিয়া প্রহার করিতে করিতে ইন্দ্রজিৎকে মাটিতে ফেলিল ; লক্ষ্মণ আসিয়া সাংঘাতিক বাণ দ্বারা তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন !

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর অতিকায় ও মহাকায় নামে দুই রাক্ষস আসিয়া অনেক বানর-সৈন্য বধ করিল এবং লক্ষ্মণকে বাণাঘাতে ব্যথিত করিল। তারপর রাম ও সুগ্রীবের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া শেষে হনুমান ও জাম্বমানের হাতে ধরা পড়িল। তারপর রাক্ষস দুটাকে বাঁধিয়া রামের নিকট উপস্থিত করিলে, রাম অতিকায়কে বলিলেন—"তুমি রাবণকে গিয়া বল যে, সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে আমি যুদ্ধ করিয়া সমস্ত রাক্ষস বধ করিব।" অতিকায় দম্ভ করিয়া বলিল—"আপনাকে আমরা একটুও ভয় করি না। আপনি কি মনে করিয়াছেন কেবল বলে রাবণকে বধ করিবেন ? তাহা কোন মতেই পারিবেন না। লঙ্কার দরজায় ঐ যে দেখিতেছেন মহাদেবের মূর্ত্তি আছে, ঐ মূর্ত্তিকে বাণ মারিয়া কাটিতে না পারিলে রাবণের মৃত্যু হইবে না। আপনি যদি একটিমাত্র বাণ মারিয়া ঐ কাঠের মূর্ত্তিকে পাঁচ ভাগে কাটিয়া ফেলিতে পারেন তবেই বুঝিব আপনি বাস্তবিকই বলবান্"।

দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস বুঝিল না যে রাম সামান্য মানুষ নহেন। তাহার কথা শুনিয়া রাম তখনই ধনুকে বাণ যুড়িয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসদুটার চক্ষের সম্মুখেই রামের বাণ সেই মূর্ত্তির উপরে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ মূর্ত্তি ফাটিয়া পাঁচ খণ্ড হইয়া গেল ! এই অদ্ভুত

ব্যাপার দেখিয়া রাক্ষস দুইজন রামের শরণ লইয়া বলিল—"মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বালক পুত্রগুলিকে রক্ষা করিবেন।" রাম "আচ্ছা, তাহাই হইবে" বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা লঙ্কাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর বানরেরা লঙ্কার প্রথম প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলে রাবণ আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল ও রামের সঙ্গে তাহার ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে রামের বাণে জর্জ্জরিত ও রক্তাক্ত হইয়া পলায়ন করিল।

পরদিন বিভীষণ রাবণকে কত বুঝাইল—সীতাকে ফিরাইয়া দিন। কিন্তু রাবণ কিছুতেই শুনিল না! বরং রাগিয়া বিভীষণকে এমন অপমান করিল যে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইল। রাম তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বার বার পরাজয় করিয়াও কিছুতেই রাবণকে মারিতে না পারিয়া বিভীষণের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর বিভীষণ, কিরূপভাবে বাণ মারিলে রাবণ মরিবে তাহা ইঙ্গিতদ্বারা দেখাইয়া দিলে, রাম সেইরূপ বাণ মারিবামাত্র রাবণের মৃত্যু হইল।

তারপর আসিল কুম্ভকর্ণ। এই দুরন্ত রাক্ষস রামকে নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে এক শত বাণ মারিয়া রাম তাহাকে বধ করিলেন! তারপর বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া রাম অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলেন এবং রাবণের পুষ্পক রথে চড়িয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজা হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

নন্দরাণী

গ্রামের মেয়েরা সব কূয়োর ধারে জল আন্‌তে এসেছে, আর বিয়ের কথা বলাবলি করছে। একজন বল্‌ল, "কাল আমার মামা আস্‌বেন;—সঙ্গে ক'রে কত যে সুন্দর কাপড় চোপড় কত যে গহনা আন্‌বেন, তার আর ঠিকই নাই!"

আরেকজন বল্‌ল, "আমার খুড়-শ্বশুর আস্‌ছেন;—তিনি যে কত রকমের মিঠাই আন্‌বেন, তা' আর কি বল্‌ব!"

আরেকজন বল্‌ল, "আমার খুড়ো আস্‌বেন ;—তাঁর সঙ্গে কত রকমের দামী গহনা আস্‌বে ;—দেখে তোমাদের তাক্ লেগে যাবে।"

নন্দরাণী বেচারা কিছুই বল্‌তে পার্‌ছে না, কারণ তার যে কেউ নাই ;—বিয়ে দেবে কে ? তবু সে আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারল না ;—সে বল্ল, "হ্যাঁ, আমারও মামা আস্‌ছেন ;—আর অনেক কাপড়, অনেক গহনা, অনেক মিঠাই আন্‌ছেন।"

একটা দুষ্টু ডাকাত লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শুন্‌ছিল ; সে নন্দরাণীর কথা শুনে মনে ভাব্‌ল, "বেশ ত ! মেয়েটি দেখ্‌তে শুনতেও বেশ, চালাকও আছে ;—এর কেন আমার সঙ্গে বিয়ে হয় না ?" এই না ভেবে, সে অনেক গহনাপত্র, মিঠাই মণ্ডা নিয়ে নন্দরাণীর বাড়ীতে হাজির হয়ে বল্‌ল, "আমি যে তোমার মামা হই। ছেলেবেলা তোমাকে দেখেছিলাম ; এখন কত বড় হয়েছ ;—চিন্‌বারই যো নাই আর। তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছে ; আমার সঙ্গে চল, আমিই সব বন্দোবস্ত করেছি। এই নাও তোমার কাপড়, গহনা আর কিছু মিঠাই।"

নন্দরাণীর তো আনন্দ আর ধরে না ! নূতন কাপড় প'রে, যা' কিছু তার জিনিষ ছিল সব সঙ্গে নিয়ে, সে ডাকাতের সঙ্গে চল্‌ল ;—মনে কর্‌ল যে সত্যিই তার মামার সঙ্গে যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে একটা দাঁড়কাক গাছের ডালে ব'সে ভাঙ্গা গলায় বল্‌তে লাগ্‌ল,

"নন্দরাণী ভাবে বুঝি যায় মামা বাড়ী,
এতো মামা নয়, ডাকাতের সর্দ্দার ধাড়ী।

নন্দরাণী বল্‌ল, "মামা ! কাকটা কি বল্‌ছে ?"

ডাকাত বল্ল, "দূর বোকা ! এদেশের কাকেরা এই রকম ক'রেই ডাকে।"

কিছুদূর গিয়ে একটা ময়ূর নন্দরাণীকে দেখে বল্‌ল,

"নন্দরাণী ভাবে বুঝি যায় মামা বাড়ী,
এতো মামা নয়, ডাকাতের সর্দ্দার ধাড়ী।"

নন্দরাণী বল্‌ল, "মামা ! ময়ূর কি বল্‌ছে ?"

ডাকাত বল্‌ল, "দূর বোকা ! এদেশের সব ময়ূরই এই রকম করে ডাকে।"

আরও কিছুদূর গিয়ে একটা শেয়াল বল্‌ল,

"নন্দরাণী ভাবে বুঝি যায় মামা বাড়ী,
এতো মামা নয়, ডাকাতের সর্দ্দার ধাড়ী।"

নন্দরাণী বল্‌ল, "মামা! শেয়াল কি বল্‌ছে?"

ডাকাত বল্‌ল, "দূর বোকা! এদেশের সব শেয়ালই এই রকম ক'রে ডাকে।"

এম্‌নি ক'রে তারা ডাকাতের বাড়ীতে এসে পৌঁছিল।

বাড়ী এসেই ডাকাত বল্‌ল, "দেখ্; আমি তোর মামা টামা কেউ নই;—আমি ডাকাত। তোর সঙ্গে কাল আমার বিয়ে হবে;—আমি তাই ভোজের আয়োজন কর্‌তে যাচ্ছি। ততক্ষণ তুই আমার মায়ের কাছে থাক্‌বি।"

নন্দরাণী কত আপত্তি, কত কান্নাকাটি কর্‌ল, ডাকাত কিছুতেই শুন্‌ল না; তার মায়ের কাছে নন্দরাণীকে রেখে সে বেরিয়ে চ'লে গেল। ডাকাতের মা যেমন বিশ্রী দেখ্‌তে, তেম্‌নি রাগী, দুষ্টু আর বুড়ী থুড়্থুড়ী। নন্দরাণীকে দেখেই বুড়ী জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হ্যাঁরে, তোর মাথায় এত চুল হ'লো কি ক'রে রে? আমি এত তেল, এত ওষুধ, মাথায় লাগালাম, তবু আমার টেকো মাথা চুলে ভরল না, আর তোর কিনা মাথা থেকে পা অবধি লম্বা চুল! শীগ্গির বল্ কি ক'রে এত চুল হ'লো, নইলে তোকে মেরেই ফেল্‌ব।"

নন্দরাণী বল্‌ল, "ছেলেবেলায় মা আমার মাথাটা ঢেঁকিতে কুট্‌তেন, আর এক এক ঘায়ে এক এক আঙ্গুল ক'রে চুল বেড়ে যেত। আপনিও ক'রে দেখুন, দেখ্‌বেন কি মজা হয়!"

বুড়ীর আর দেরী সইল না; সে একেবারে ছুটে গিয়ে মাথাটা ঢেঁকির নীচে রাখ্‌ল, আর নন্দরাণীও সুযোগ বুঝে এক ঘায়ে মাথা গুঁড়ো ক'রে দিল।

তারপর মরা বুড়ীকে লাল সাড়ী পরিয়ে, চর্‌কার কাছে বসিয়ে দিয়ে বুড়ীর পোষাক নিজে প'রে, ডাকাতের ঘরে যত গহনাপত্র, হীরে মাণিক ছিল, সব পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে চম্পট দিল।

পথে যেতে যেতে ডাকাতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, কিন্তু বুড়ীর পোষাক প'রে, পিঠ কুঁজো ক'রে, মুখ নীচু ক'রে যাচ্ছিল ব'লে ডাকাত তাকে চিন্‌তে পারেনি। ডাকাত তখন একটা জাঁতা চুরি ক'রে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল,—তা' দিয়ে বিয়ের ভোজের জন্য গম পেষা হবে। বাড়ীর দরজায় এসে সে দেখ্‌ল যে চরকার কাছে, লাল কাপড় প'রে, দরজার দিকে পিছন ফিরে কে ব'সে আছে। সে তাড়াতাড়ি বল্‌ল, "নন্দরাণী, এই ভারি পাথরটা নামাতে হবে; একবার আমার সাহায্য কর্ তো।" কেউ কোন উত্তর দিল না। আরও দুতিন বার সে ঐ কথা বল্‌ল; কিন্তু তখনও উত্তর না পেয়ে সে

ভয়ানক চটে গেল,—আর পাথরটা সেই লাল কাপড় পরা মানুষটিকে ছুঁড়ে মার্‌ল।
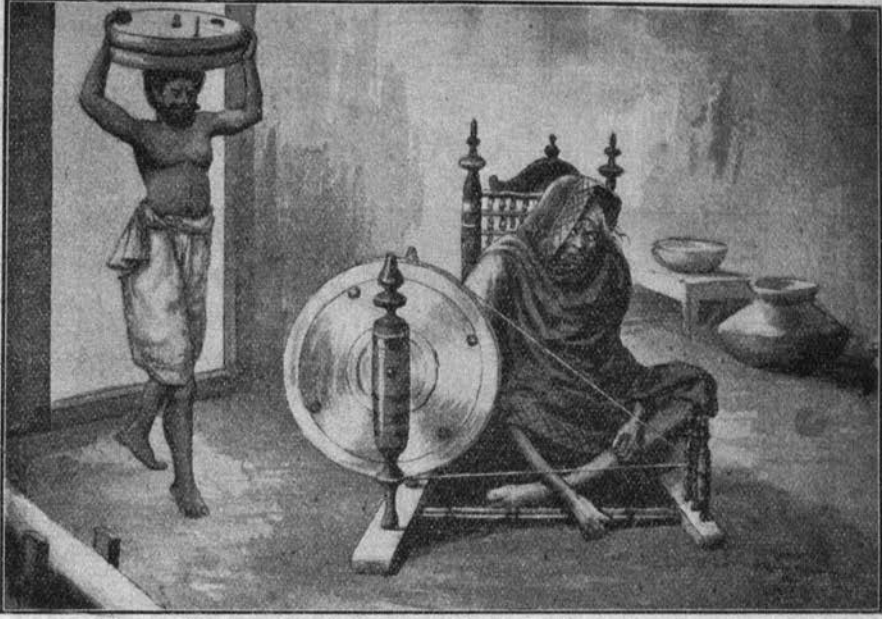
কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ! এ যে তার বুড়ী মা; পাথরের ঘা খেয়ে যে একেবারে ম'রে পড়ে গেল!

ডাকাত আগে কান্নাকাটি কর্‌ল, তারপর ভাব্‌ল, কেঁদে আর কি হবে, বিয়ের জোগাড় করা যাক্। এই ভেবে সে বৌয়ের গহনাপত্র বের কর্‌তে গেল;—কিন্তু, একি সর্ব্বনাশ!—নন্দরাণী তো সব গহনা, সোনা, হীরে, মাণিক নিয়ে চ'লে গেছে! তার সিন্দুক যে একেবারে খালি!

বিয়ের দিন অন্য ডাকাতেরা সকলে ভোজ খেতে এল; কিন্তু যার বাড়ীতে এসেছে সেই যে নাই! সে লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে বাড়ী থেকে কোন্ দূর দেশে চম্পট দিয়েছে, আর প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে যে আর কখনও ডাকাতি কর্‌বে না।

শ্রীসুবিনয় রায়।

পাখীর ডিম

পাখীর ডিম সংগ্রহ করা অনেক লোকের সখ আছে। তাঁদের মধ্যে অনেক বড়লোক আছেন, খুব বেশী দাম দিয়ে দুষ্প্রাপ্য ডিম তাঁরা সংগ্রহ ক'রে থাকেন। কোন কোন জাতের পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে ; তাদের ডিম অনেক সময় হাজার হাজার টাকায় ডিম-সংগ্রাহকের কাছে বিক্রী হয়ে থাকে।

জীবন্ত পাখীর মধ্যে কণ্ডরের (শকুন জাতি এক রকম খুব বড় পাখী) ডিম অত্যন্ত

বেশী দামে বিক্রী হয়, কারণ কণ্ডর পাখীরা খুব উঁচু খাড়া পাহাড়ে, হাজার হাজার ফুট উঁচুতে বাসা বেঁধে থাকে,—আর তার স্বভাবটাও বড় শান্ত শিষ্ট নয়। কাজেই কণ্ডরের বাসা দেখা গেলেও সেখান থেকে ডিম চুরি করে আনা বড় সহজ কথা নয়। হাজার টাকা দিলেও কোন বুদ্ধিমান লোক অমন কাজ করতে যাবে না।

অক্ নামে এক জাতের পাখী এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। অক্ পাখীকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, উত্তর আমেরিকার আইসল্যাণ্ড দ্বীপে। এই অকের ডিম অত্যন্ত বেশী দামে বিক্রী হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এক সাহেব একটা অকের ডিম ৩৩০৲ টাকায় বিক্রী করেছিলেন ;—এখন সে ডিমের দাম ৩০,০০০৲ টাকারও বেশী হবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আর দুটি ডিম ১২৫০৲ টাকা হিসাবে বিক্রী হয়েছিল। পাওয়েল নামে স্কটল্যাণ্ডের এক সাহেব ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দুটি ডিম ভাগ্যক্রমে ২৪৲ টাকায় কিনে ফেলেছিলেন। তার দু'সপ্তাহ পরেই তিনি এক একটি ডিম ৩৬০০৲ টাকায় বিক্রী ক'রেছিলেন। অক্ পাখীর লোপ পাওয়ার বিশেষ কারণ এই যে তার উড়বার শক্তি ছিল না, আর ডাঙ্গার উপর সে তাড়াতাড়ি চলতে পারত না। যে দ্বীপে অক্ পাখী বাস করত সেখানে তিমি-শিকারীরা দলে দলে গিয়ে অনায়াসে
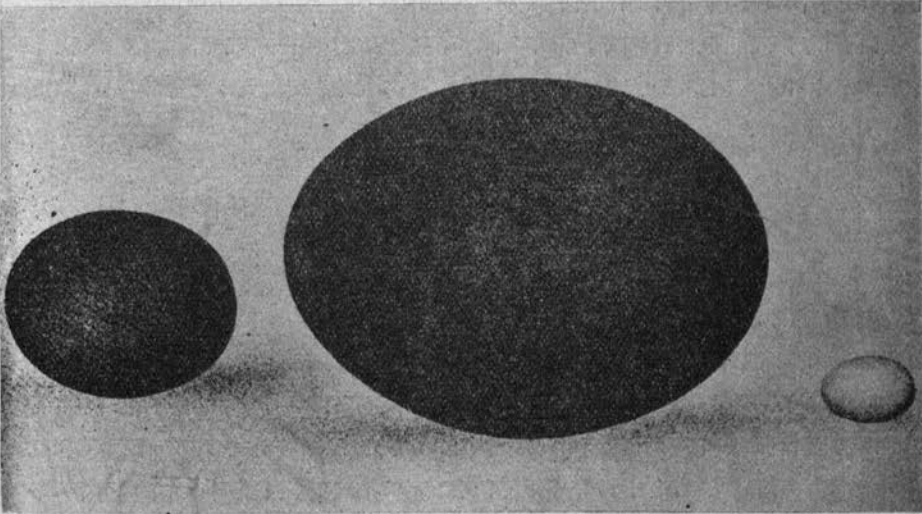
তাকে মেরে তার মাংস খেতো ;—অকের মাংস নাকি বড়ই সুস্বাদ আর নরম ছিল।

অকের পালকও বেশী দামে বিক্রী হ'তো। ঐ দ্বীপে আরেক জাতের পাখী ছিল, তারও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। সে পাখীর ডিম আরও দুষ্প্রাপ্য ;—তার এক একটির দাম প্রায় ১৫০০৲ টাকা।

আফ্রিকার মাডাগাস্কার দ্বীপে 'ইপিয়র্ণিস্' পাখীর (সে পাখী কয়েকশ' বৎসর হ'লো লোপ পয়েছে) ডিম অত্যন্ত বড় আকারের হ'তো। যে ছবিটা দেওয়া হয়েছে, তার প্রথমে একটা উটপাখীর ডিম, তারপর ইপিয়র্ণিসের ডিম, তারপর হাঁসের ডিম দেখান হয়েছে। ইপিয়র্ণিসের ডিম প্রায় এক ফুট লম্বা। এর ডিমের দামও অত্যন্ত বেশী।

নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের কিউই পাখীও আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, আর তার ডিমও ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে আস্‌ছে। কিউই পাখী খুব কম ডিম পাড়ে, আর সংখ্যায়ও তারা খুব কমই আছে। তাদের যত্ন করে রক্ষা করা হয় বটে, কিন্তু আশঙ্কা হয় যে অল্প দিনের মধ্যেই এ পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

ডিম সংগ্রাহকেরা অনেক জীবিত পাখীর ডিমের জন্যও খুব বেশী দাম দিয়ে থাকেন ;—যেমন, সোণালী ঈগল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপের তালচোঁচ, কালিফর্ণিয়ার শুকপাখী ;—আরও অন্য অনেক পাখী, যাদের বাসা থেকে ডিম সংগ্রহ করাতে প্রাণের ভয় আছে, কিম্বা অন্য কোন বিশেষ মুস্কিল আছে।

চীনদেশে হুতোমপেঁচার ডিম বেশ ভাল দামে বিক্রী হয় ;—বিশেষতঃ, যদি সে ডিম দস্তুর মতন পচা হয়। যত বেশী পচা হয়, ততই নাকি সে ডিম খেতে তাদের ভাল লাগে !

শ্রীসুবিনয় রায়।

নানা কথা

সেকালের চিঠি

মানুষ কবে থেকে প্রথম লিখতে শিখেছে, এ কথা বলা বড় শক্ত ;—কিন্তু পাঁচ হাজার বৎসর আগেও যে লোকে লিখ্‌তে জান্‌ত এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যেতে পারে, কারণ সে সময়কার লেখা পুরানো ভাঙা সহরের ভগ্নাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। সে সময়ে কাদার উপর আঁচড় কেটে লেখা হ'তো ; কমলা লেবুর মত আকারের এক তাল কাদার উপর লিখে, সেটাকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হ'তো। ব্যাবিলনিয়া দেশের বিস্‌মিয়া সহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই রকম অনেক লেখা পাওয়া গেছে। তখনও অক্ষরের স্থষ্টি হয় নি,—সে দেশে ছবি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা

হ'ত। লোকে যখন আরও লিখ্‌তে শিখ্‌ল, তখন বিস্কুটের মত গোল চাকৃতির দু'পিঠে লেখা আরম্ভ হ'লো। ঐ গোল চাকৃতি ক্রমে আকার বদ্‌লিয়ে শেষে চারকোণা চাকৃতির চলন আরম্ভ হ'লো। সাধারণ লেখার জন্য চারকোণা চাকৃতির চলন হলো বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ আকারের চাকৃতি ব্যবহার হ'তে লাগ্‌ল। ইস্কুলের ছেলেরা বরাবরই গোল চাকৃতি ব্যবহার করত; আর সওদাগরেরা তাদের জিনিষের গায় দামের টিকিট বেঁধে দেবার জন্য ডিমের মত আকারের চাকৃতি ব্যবহার কর্‌ত,তার গায়ে একটা ছেঁদা থাকৃত।

সেকালের লোকেরা যে চিঠি লিখ্‌ত, তার জন্য তারা খামও ব্যবহার কর্‌তে শিখেছিল। চারকোণা কাদার চাকৃতির উপর চিঠি লিখে সেটাকে রোদে শুখিয়ে নিয়ে তার উপর মশলা মাখিয়ে আবার কাদা দিয়ে লেপে দিত। সেই কাদার উপর নিজের নামের ছাপ লাগিয়ে ঠিকানা
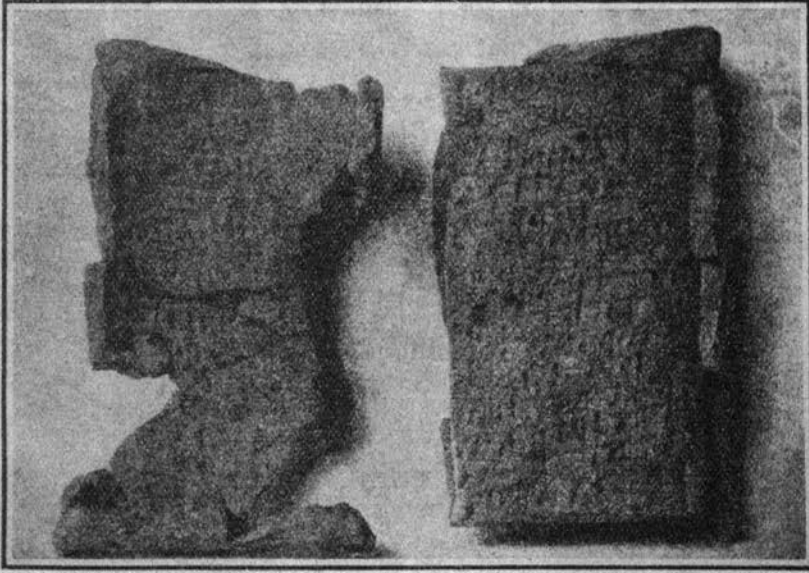
লিখে, রোদে সেটাকে শুকিয়ে নিত। ছবিতে দেখ একটা চিঠি আর তার ভাঙা খামখানা।

সকলের চেয়ে পুরাণো লেখাতে কেবল ছবি ছিল। তারপর লোকে এক একটি ছবির বদলে এক একটি বিশেষ আকারের অক্ষর বসাতে আরম্ভ কর্‌ল। তারপর ক্রমে ক্রমে ভাষার শব্দ ধ'রে কথা লিখ্‌বার মত অক্ষরের সৃষ্টি হ'ল।

য়োকোহামা মোরগ
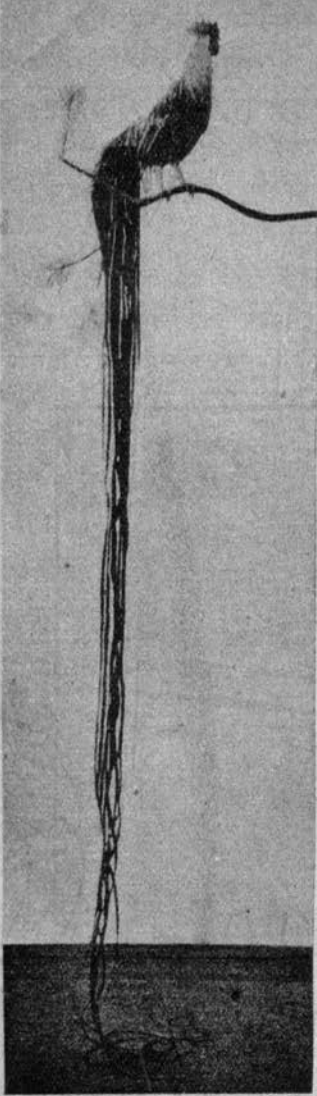
মোরগের লেজ ৮।১০ হাত লম্বা, এ কথাটা সহজে কেমন বিশ্বাসই হয় না! কিন্তু এটা অতি সত্যি কথা। ছবির দিকে চেয়ে দেখ—উঁচু ডালের উপর মোরগটি বসে রয়েছে আর তার লেজটি ঝুঁকে মাটি পর্য্যন্ত পড়েছে। এটা কিন্তু তৈরী লেজ নয়—সত্যি-সত্যি লেজ। এই মোরগ জাপান দেশের; সে দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে জন্মে না। সাধারণ মোরগ যেমন দেখ্‌তে, ছবিতে দেখ, এটাও ঠিক তেমনই—শুধু লম্বা লেজটি ইহার বিশেষত্ব। জাপানীরা সব কাজেই অসাধারণ ওস্তাদ, সুতরাং তারা চেষ্টা করে যে তাদের দেশে এরূপ মুরগী জন্মাবে সেটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। জাপানীরা এই মোরগকে "য়োকোহামা ফাউল" বলে। এই অদ্ভুত পাখীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে!
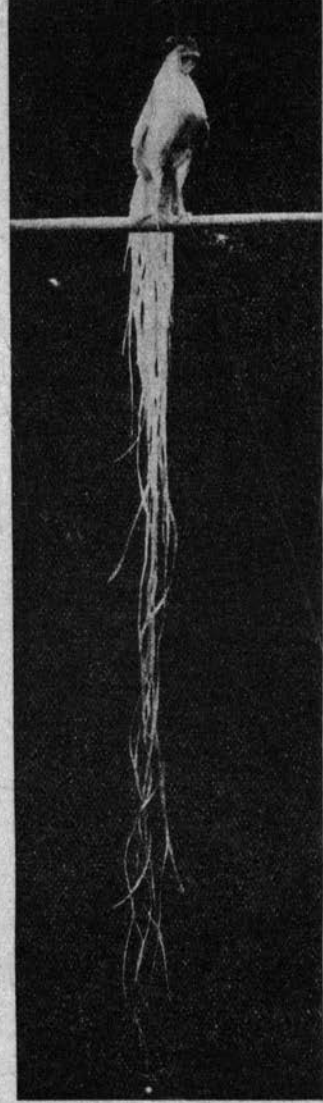
জাপানের অন্তর্ভুক্ত টোসা প্রদেশে লোকে এই মোরগ প্রচুর পরিমাণে পোষে। একবার এই দেশের রাজা ভাবলেন—মুকুটের চূড়ায় পালক পরবেন। আর তাঁর সৈন্যেরা বল্লমের মাথায় নিশানের বদলে পালক বাঁধবে এবং রাজা যখন সেজেগুজে বাইরে বেরুবেন তখন সৈন্যেরাও সেই পালকবাঁধা বল্লম হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাবে। সৈন্যদের মধ্যে তখন রেষারেষি বেধে গেল—কে তার বল্লমে সব চেয়ে লম্বা পালক বাঁধতে পারে।

তখন তারা ঠিক করল যে এই মোরগের পালকই বাঁধা হবে—সুতরাং মোরগের লম্বা পালকের খুব কাটতি আরম্ভ হলো। মোরগওয়ালারা এমন করে পাখীগুলির যত্ন করতে লাগ্‌ল যাতে তাদের লেজ বেশী লম্বা হয়। এই লম্বা লেজগুলি ভয়ানক দামে বিক্রী হতো এবং এক একটা লেজ ১২ বা ১৪ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হতো। আজকালকার মোরগপালকেরা তেমন যত্নও কর্‌তে পারে না আর সে কাজে তত সময় দিতে পারে না—সুতরাং ছবির মোরগটার যেমন ৮।১০ হাত লম্বা লেজ, তেমন হলেই এরা এখন সন্তুষ্ট হয়।

খুব উঁচু, সরু খাঁচাতে এই মোরগগুলিকে রাখে। খাঁচার নীচটা অন্ধকার—আলো আসবার ব্যবস্থা উপর দিকে থাকে। খাঁচার নীচে ও আলোর ব্যবস্থা থাক্‌লে হয়ত পাখীটা নীচে নেমে আস্‌ত—আর তা হলেই ত তার লেজের দফা রফা হতো! খাঁচার ডগায় একটা ডাল বেঁধে দেওয়া হয়—মোরগটা সারাদিন সেই ডালে বসে থাকে; পিছনের দিকে পর পর আরও দুটা ডাল বাঁধা থাকে। সেই ডাল দুটার উপর দিয়া লেজটা ঝুলে পড়ে এবং তাতেই সেটা নষ্ট হতে পারে না।

দুই এক দিন পর পর মোরগটাকে খাঁচা থেকে খুলে বেড়াতে নিয়ে যায় আর যতক্ষণ সে বেড়ায় ততক্ষণ একটা লোক লেজটাকে দুহাতে উঁচু করে ধরে রাখে। তার বিশেষ আমোদের জন্য মাসে একবার করে তাকে গরম জলে স্নান করান হয়। স্নানের পর তাকে, পালক শুকাবার জন্য ঘরের চালের ডগায় রৌদ্রে বসিয়ে রাখে—লেজটা ঢালু চালের উপর পড়ে থাকে।

য়োকোহামা মোরগের প্রধান খাদ্য—চা'ল। মাঝে মাঝে শাক সব্‌জিও দেওয়া হয়। জলটা খুব বেশী করে তাকে পান করান চাই।

য়োকোহামা মোরগের গায়ের রং বন-মোরগের রংয়ের মত, কিন্তু তার সমস্তগুলি কাল পালকের উপরে সবুজ রংএর একটা চাক্‌চিক্য থাকে। এই মোরগ সাদা রংএরও

হয়, সেগুলি দেখ্‌তে ভারি সুন্দর। পালকগুলি বরফের মত সাদা; মুখটা আর চোখ দুটো টক্‌টকে লাল এবং পা ও ঠোঁট সোণালি রং।

অদ্ভুত অস্ত্র

কথায় বলে "ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি"। যে দুর্ব্বল, তার সকলের চাইতে বড় অস্ত্র ক্রন্দন আর পলায়ন। পলায়নটা সকল সময় সম্ভব না হলেও ক্রন্দনের কোন আটক নেই। তাই শত্রুর হাতে নিতান্ত নাকাল হ'লে, তখন লোকে বলে "কাঁদিয়ে ছেড়েছে"। আজকালকার যুদ্ধে শত্রুকে কাঁদান ব্যাপারটা বেশ একটা রীতিমত বিদ্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শত্রুকে তলোয়ার দিয়ে কেটে, সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে, বল্লম বিঁধিয়ে, বন্দুকের গুলি মেরে, তোপের গোলায়, বোমার তাড়ায়, নানারকমে নাকাল ক'রেও মানুষের সাধ মেটেনি—এখন তাকে বিষাক্ত ধোঁয়ায় কাশিয়ে মারে, আগুনের পিচকারিতে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু তার চাইতেও অদ্ভুত আজগুবি উপায় হচ্ছে কাঁদিয়ে মারা। লঙ্কার ধোঁয়ায় যেমন অতিবড় বীরপুরুষকেও কাঁদিয়ে ছাড়ে, তেমনি বড় বড় গোলার মধ্যে কড়া ঝাঁঝাল আরক ভ'রে শত্রুর মধ্যে ফেল্‌তে পারলে সে আর চোখের জলে পথ খুঁজে পাবে না। তখন কোথায় থাকবে তার বীরত্ব আর কোথায় থাকবে তার উৎসাহ! আমরা পুরাণে নানারকম অদ্ভুত অস্ত্রের গল্প পড়ে থাকি—আগুনের অস্ত্র, জলের অস্ত্র, বজ্রের অস্ত্র, সম্মোহন অস্ত্র ইত্যাদি কত রকম। কিন্তু কাঁদাবার অস্ত্রের কথা কোন জায়গায় পড়িনি।

কিন্তু একটি জিনিষ পুরাণে পাই, যা নাকি আজকালকার যুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত দেখা দেয়নি। সেটি হচ্ছে, হাই তোলাবার অস্ত্র! মহাভারতে বর্ণনা আছে, বৃত্রাসুর যখন দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ইন্দ্রকে গিলে ফেল্‌ল, তখন দেবতারা জৃম্ভনাস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। সেই অস্ত্রের আশ্চর্য্য গুণে বৃত্রাসুর এক প্রকাণ্ড হাই তুলতেই ইন্দ্র তার মুখের মধ্যে থেকে এক দৌড়ে ছুটে বেরুলেন। এবারের রঙিন ছবিতে এই গল্পেরই চিত্র দেখান হয়েছে।

"সবজান্তা"

আনাদের "সবজান্তা" তুলিরামের বাবা কোন্ একটা খবরের কাগজের সম্পাদক। সেই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে তাহার সমস্ত কথার উপরে অগাধ বিশ্বাস দেখা যাইত। যে কোন বিষয়েই হোক্,জার্ম্মানির লড়ায়ের কথাই হোক্ আর মোহনবাগানের ফুটবলের ব্যাখ্যাই হোক্ দেশের বড় লোকদের ঘরোয়া গল্পই হোক আর নানা রকম উৎকট রোগের বর্ণনাই হোক, যে কোন বিষয়ে সে মতামত প্রকাশ করিত, একদল ছাত্র অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে সকল কথা শুনিত। মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যেও কেহ কেহ এ বিষয়ে তাহার ভারি পক্ষপাতী ছিলেন। দুনিয়ার সকল খবর লইয়া সে কারবার করে, সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয় তাহার নাম দিয়াছিলেন "সবজান্তা"।

আমার কিন্তু বরাবরই বিশ্বাস ছিল যে, সবজান্তা যতখানি পাণ্ডিত্য দেখায় আসলে তার অনেকখানিই উপরচালাকি। দু চারিটি বড় বড় শোনাকথা, আর খবরের কাগজ পড়িয়া দু'দশটা খবর, এইমাত্র তার পুঁজি, তাহারই উপর রংচং দিয়া নানা রকম বাজে গল্প জুড়িয়া সে তাহার বিদ্যা জাহির করিত। এক দিন আমাদের ক্লাসে পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে সে নায়েগারা জলপ্রপাতের গল্প করিয়াছিল। তাহাতে সে বলে যে নায়াগারা দশ মাইল উঁচু ও একশত মাইল চওড়া! একজন ছাত্র বলিল, "সে কি ক'রে হবে? এভারেষ্ট সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, সেই মোটে পাঁচ মাইল—" সবজান্তা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা ত আজকালকার খবর রাখ না"! যখনই তাহার কোন কথায় আমরা সন্দেহ বা আপত্তি করিতাম সে একটা যা-তা নাম করিয়া আমাদের ধমক দিয়া বলিত, "তোমরা কি অমুকের চাইতে বেশী জান"? আমরা বাহিরে সব সহ্য করিয়া থাকিতাম, কিন্তু এক এক সময় রাগে গা জ্বলিয়া যাইত।

সবজান্তা যে আমাদের মনের ভাবটা বুঝিত না, তাহা নয়। সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিত এবং সর্ব্বদাই এমন ভাব প্রকাশ করিত যে আমরা তাহার কথাগুলা মানি বা না মানি, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসে যায় না। নানারকম খবর ও গল্প জাহির করিবার সময় সে মাঝে মাঝে আমাদের শুনাইয়া বলিত, "অবিশ্যি, কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এ সব কথা মানবেন না" অথবা "যাঁরা না প'ড়েই খুব বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই এসব উড়িয়ে

দিতে চাইবেন" ইত্যাদি। ছোক্‌রা বাস্তবিকই অনেক রকম খবর রাখিত, তার উপর তার বোলচালগুলিও ছিল বেশ ঝাঁঝালো রকমের; কাজেই আমরা বেশী তর্ক করিতে সাহস পাইতাম না।

তাহার পর একদিন কি কুক্ষণে তাহার এক মামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আমাদেরই স্কুলের কাছে বাসা লইয়া বসিলেন। তখন আর সবজান্তাকে পায় কে! তাহার কথা-বার্ত্তার দৌড় এমন আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া চলিল যে, মনে হইত বুঝিবা তাহার পরামর্শ ছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পুলিসের পেয়াদা পর্য্যন্ত কাহারও কাজ চলিতে পারে না! স্কুলের ছাত্র মহলে তাহার খাতির ও প্রতিপত্তি এমন আশ্চর্য্য রকম জমিয়া গেল, যে আমরা কয়েক বেচারা, যাহারা বরাবর তাহাকে নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছি—আমরা একেবারে কোণঠাসা হইয়া রহিলাম। এমন কি, আমাদের মধ্য হইতে দু একজন তাহার দলে যোগ দিতেও আরম্ভ করিল।

অবস্থাটা শেষটায় এমন দাঁড়াইল যে স্কুলে আমাদেই টেকা দায় হইল। দশটার সময় আমরা কাঁচুমাচু করিয়া ক্লাসে ঢুকিতাম আর ছুটি হইলেই সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসি তামাসার হাত এড়াইবার জন্য দৌড়িয়া বাড়ী আসিতাম। টিফিনের সময়টুকু হেড-মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের সামনে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া অত্যন্ত ভালমানুষের মত পড়াশুনা করিতাম।

এই রকম ভাবে কতদিন চলিত জানি না, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় হঠাৎ সবজান্তা মহাশয়ের জারিজুরি সব এমনই ফাঁস হইয়া গেল যে তাহার অনেকদিনকার খ্যাতি ঐ একদিনেই লোপ পাইল—আর আমরাও সেইদিন হইতে একটু মাথা তুলিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই ঘটনারই গল্প বলিতেছি—

একদিন শুনা গেল লোহারপুরের জমীদার রামলাল বাবু আমাদের স্কুলে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন—একটি "ফুটবল গ্রাউণ্ড" ও খেলার সরঞ্জমের জন্য। আরও শুনিলাম রামলাল বাবুর ইচ্ছা সেই উপলক্ষে আমাদের একদিন ছুটি ও একদিন রীতিমত ভোজের আয়োজন হয়। কয়দিন ধরিয়া এই খবরটাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। কবে ছুটি পাওয়া যাইবে, কবে খাওয়া এবং কি খাওয়া হইবে, এই সকল বিষয় জল্পনা চলিতে লাগিল। সবজান্তা দুলিরাম বলিল যেবার সে দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, সেবার নাকি রামলাল বাবুর সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ এমন কি আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল। রামলাল বাবু তাহাকে কেমন খাতির করিতেন, তাহার কবিতা আবৃত্তি

শুনিয়া কি কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবিষয়ে সে স্কুলের আগে এবং পরে, সারাটি টিফিনের সময়, এবং সুযোগ পাইলে ক্লাসের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেও, নানা অসম্ভব রকম গল্প বলিত। "অসম্ভব" বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেলার দল সে সকল কথা নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিতে একটুও বাধা বোধ করিত না।

একদিন টিফিনের সময় উঠানের বড় সিঁড়িটার উপর একদল ছেলের সঙ্গে বসিয়া সবজান্তা গল্প আরম্ভ করিল—"আমি একদিন দার্জ্জিলিঙে লাট সাহেবের বাড়ীর কাছের ঐ রাস্তাটায় বেড়াচ্ছি—এমন সময় দেখি রামলাল বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে আস্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে আবার এক সাহেব। রামলাল বাবু বল্লেন 'ডুলিরাম! তোমার সেই ইংরাজি কবিতাটা একবার এঁকে শোনাতে হ'চ্ছে। আমি এঁর কাছে তোমার সুখ্যাত করছিলাম, তাই ইনি সেটা শুনবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন'। উনি নিজে থেকে বলছেন, তখন আমি আর কি করি? আমি সেই Casabianca থেকে আবৃত্তি করলুম—তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যা ভীড় জমে গেল! সবাই শুনতে চায়, সবাই বলে 'আবার কর'! মহামুস্কিলে পড়ে গেলাম, নেহাৎ রামলাল বাবু বল্‌লেন তাই আবার করতে হ'ল।" এমন সময় কে যেন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল "রামলাল বাবু কে?" সকলে ফিরিয়া দেখি, একটি রোগা নিরীহ গোছের পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন। সবজান্তা বলিল "রামলাল বাবু কে, তাও জানেন না? লোহারপুরের জমীদার রামলাল রায়"। ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ তার নাম শুনেছি—সে তোমার কেউ হয় নাকি"? "না কেউ হয় না—এমনি, খুব ভাব আছে আমার সঙ্গে। প্রায়ই চিঠি পত্র চলে।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন "রামলাল বাবু লোকটি কেমন?" সবজান্তা উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল "চমৎকার লোক। যেমন চেহারা তেমনি কথাবার্ত্তা, তেমনি কায়দা দুরস্ত। এই আপনার চেয়ে প্রায় আদ হাত খানেক লম্বা হবেন, আর সেইরকম তাঁর তেজ! আমাকে তিনি কুস্তি শেখাবেন বলেছিলেন, আর কিছুদিন থাকলেই ওটা বেশ রীতিমত শিখে আসতাম"। ভদ্রলোকটি বলিলেন "বল কি হে? তোমার বয়স কত?" "আজ্ঞে এইবার তের পূর্ণ হবে"। "বটে! বয়সের পক্ষে খুব চালাক ত! বেশত কথাবার্ত্তা বল্‌তে পার! কি নাম হে তোমার?" সবজান্তা বলিল "ডুলিরাম ঘোষ। রণদা বাবু ডেপুটি আমার মামা হন"। শুনিয়া ভদ্রলোকটি ভারি খুসী হইয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ছুটির পর আমরা সকলেই বাহির হইলাম। স্কুলের সম্মুখেই ডেপুটি বাবুর বাড়ী, তার বাহিরের বারান্দায় দেখি সেই ভদ্রলোকটি বসিয়া ঢুলিরামের ডেপুটি মামার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। ঢুলিরামকে দেখিয়াই মামা ডাক দিয়া বলিলেন—"ঢুলি এদিকে আয়, এঁকে প্রণাম কর্।—এটি আমার ভাগ্নে ঢুলিরাম"। ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ, এর পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি।" ঢুলিরাম আমাদের দেখাইয়া খুব আড়ম্বর করিয়া ভদ্রলোকটিকে প্রণাম করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন "কেমন? আমায় ত তুমি জানই?" ঢুলি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ স্কুলে দেখেছিলাম।" ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন "আমার পরিচয় জান না বুঝি"? সবজান্তা এবার আর "জানি" বলিতে পারিল না, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটি তখন বেশ একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন "আমার নাম রামলাল রায়; লোহারপুরের রামলাল রায়"!

ঢুলিরাম খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর মুখখানা লাল করিয়া হঠাৎ একদৌড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া ছেলেরা রাস্তার উপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তার পরের দিন আমরা স্কুলে আসিয়া দেখিলাম—সবজান্তা আসে নাই—তাহার নাকি মাথা ধরিয়াছে! নানা অজুহাতে সে দু তিন দিন কামাই করিল—তারপর যেদিন সে স্কুলে আসিল তখন তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারই কয়েকজন চেলা "কি হে! রামলাল বাবুর চিঠি পত্র পেলে?" বলিয়া তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর যতদিন সে স্কুলে ছিল, ততদিন তাহাকে খেপাইতে হইলে বেশী কিছু করা দরকারহইত না, খালি একটিবার রামলাল বাবুর খবর জিজ্ঞাসা করিলেই বেশ তামাসা দেখা যাইত।

ধূলার কথা

ঘরের দেয়াল মেঝে আসবাব পত্র যতই ঝাড়ি যতই মুছি, খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলেই আবার দেখি, যেই ধূলা সেই ধূলা। এত ধূলা আসেই বা কোথা হইতে, আর এ ধূলার অর্থই বা কি?

টেবিলের উপর হইতে খানিকটা ধূলা সংগ্রহ করিয়া অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ—তাহার

মধ্যে চূণ সুরকি কয়লার গুঁড়া হইতে সূতার আঁশ, পোকার ডিম ফুলের রেণু পর্য্যন্ত প্রায় সবই পাওয়া যাইতে পারে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পারিলে কত সাংঘাতিক রোগের বীজও তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। জানালার ফাঁক দিয়া যে আলোর রেখা ঘরের মধ্যে আসে, তাহার মধ্যেও চাহিয়া দেখ, ধূলা যেন কিলবিল করিতেছে! এই ধূলার মধ্যেই আমরা বাস করি চলি ফিরি, নিশ্বাস লই। মানুষ যতদূর দেখিয়াছে, যতদূর খুঁজিয়াছে, ধূলার আর শেষ কোথাও নাই। আকাশে খুঁজিয়া দেখ; যতদূর উঠিবে, ততদূর ধূলা—যেখানে মেঘ নাই কুয়াসা নাই, বাতাস যেখানে অসম্ভব রকম পাৎলা, সেখানেও ধূলার অভাব নাই। সে ধূলা যে কত সূক্ষ্ম তাহা চোখে মালুম হয় না, অণুবীক্ষণের হিসাব দিয়া বুঝিতে হয়। অথচ সে ধূলাও বড় সামান্য নয়—সেই ধূলাই সারাটি আকাশকে নীল রঙে রঙাইয়া রাখে, সেই ধূলাই উদয়াস্তের সময় সূর্য্যকিরণকে শুষিয়া এমন আশ্চর্য্য জমকালো রঙের সৃষ্টি করে। আরও দূরে যাও, পৃথিবী ছাড়িয়া, যেখানে আকাশের খোলা ময়দান পড়িয়া আছে, সেখানে যাও; দেখিবে, যে নিয়মে গ্রহ চন্দ্র সকলে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে সেই একই নিয়মে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও আকাশ পথে বড় বড় চক্র আঁকিয়া চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণার মতই হইত, তবুও সে এমনই ভাবে বছরের পর বছর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিত—কে তখন তাহার খবর রাখিত?

এই পৃথিবীর উপর ধূলার যে অদ্ভুত খেলা চলিয়াছে, তাহাকে ধূলার খেলা বলিয়া জানে কয়জন? যখন কণায় কণায় বৃষ্টিজল জমিয়া বর্ষাধারা নামিতে থাকে, যখন কুয়াশার ঘনঘটায় চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে, তখন নিশ্চয় জানিও এ সমস্তই ধূলার কৃপায়! ধূলা না থাকিলে বাষ্পকণা জমিয়া জল হয় না, স্বচ্ছ আকাশে মেঘ কুয়াশার জন্ম হয় না।

সুতরাং ধূলা জিনিষটাকে আমরা যতই অকাজের জিনিষ বলিয়া উড়াইয়া দেই না কেন, উৎপাত মনে করিয়া তাহাকে যতই দূর করিতে চাইনা কেন, আর তাহার পরিচয় লওয়াটা যতই অনাবশ্যক ভাবি না কেন, আসলে সে বড় একটা সামান্য জিনিষ নয়। তোমরা হয়ত বলিবে, "সামান্য না হইক, জিনিষটা বড় বিশ্রী ও নোংরা"। হাঁ, নোংরা বটে। যখন সে আমার সাফ কাপড় ময়লা করিয়া দেয়, আবার ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে জমিয়া থাকে, যেখানে তাহাকে দিয়া আমার কোন দরকার নাই সেইখানে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে নোংরা বলি। কিন্তু 'ধূলা' বলিলেই যে একটা নোংরা বিশ্রী কিছু ভাবিতে

হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এই ছবিখানা একবার দেখত! প্রজাপতির পালক

ঝাড়িলে যে ধূলা পড়ে তাহারই একটু নমুনা দেখান হইয়াছে। চোখে দেখিতে অতি সূক্ষ্ম একটুখানি হাল্কা গুঁড়ার মত দেখায়—দেখিলে কেহই তাহাকে ধূলা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে ঠিক এমনই সুন্দর দেখায়। বাতাসে যে সকল ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহার মধ্যেও কতসময়ে কত আশ্চর্য্য রকমের কারুকুরি দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের তলা হইতে পাঁক ঘাঁটিয়া বা পচা পুকুরের উপরকার ময়লা ছাঁকিয়া যে জীবন্ত ধূলি বাহির হয়, তাহার মত সুন্দর জিনিষ খুব অল্পই আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ্ বলিতে পার, কিন্তু উদ্ভিদ্ বলিতে সাধারণত যেরকম জিনিষ মনে করিয়া বসি, এগুলি একেবারেই সেরূপ নয়। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ডায়াটম্ (Diatom) বলে—আমরা এখানে তাহাকেই জীবন্ত ধূলি বলিতেছি। ছবিতে দেখ, কতগুলি অদ্ভুত জীবন্ত ধূলি, তাহাদের কত রকম চেহারা, তাহার উপর কত রকম কারিকুরি! এই যে 'Diatom' কথাটি ইহার o অক্ষরটির মধ্যে

যেটুকু ধরে তাহার চাইতেও কম পরিমাণ ধূলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফটো
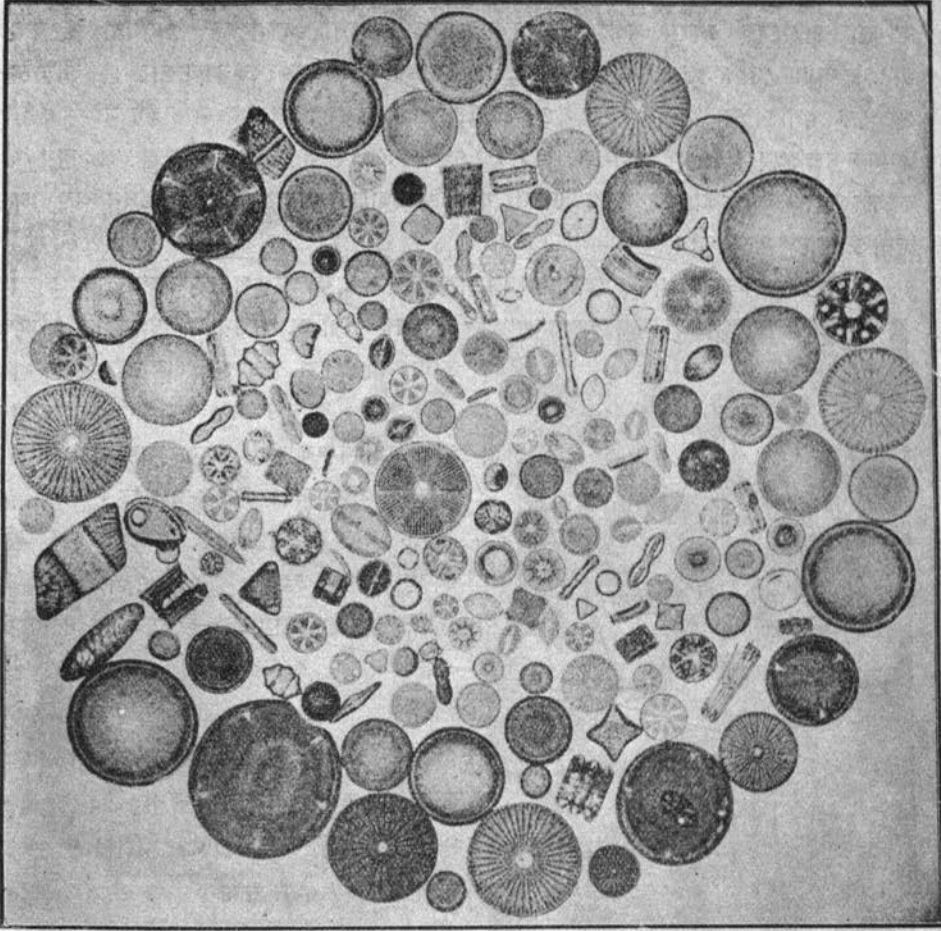
তুলিয়া দেখান হইয়াছে! যেগুলি দেখান হইল, সেগুলিও, কিন্তু সকলের চাইতে ছোট নয়—আরও ছোট 'ডায়াটম্' অসংখ্য প্রকারের আছে। জলের উপর শেওলার মত এই অদ্ভুত জিনিষগুলা কত সময়ে ভাসিতে থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে নোংরা ও বিশ্রী বলিয়া এড়াইয়া চলে, তার ভিতরে যে কি আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম কাজ তাহারা

সে সংবাদ রাখে না। কিন্তু যাঁহারা এসকলের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া এই ময়লা ঘাঁটিয়া এই সব উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করেন ও তাহাদের চালচলন আকার প্রকার লক্ষ্য করিয়া তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা আমাদের শুনাইয়া থাকেন। ছবিতে যাহা দেখিতেছ, সেগুলা কিন্তু আস্ত জীব নয়—জীবকঙ্কাল মাত্র। ডায়াটম্‌গুলিকে পোড়াইয়া সাফ করিলেও তাহার এই কঙ্কাল সহজে নষ্ট হয় না—এগুলি এমনই মজবুৎ! ইহাদের আসল বাহার এই কঙ্কালগুলিতেই। জীবন্ত অবস্থায় এই কঙ্কালগুলি সবুজ কোষের মধ্যে ঢাকা থাকে—ইহাদের কারিকুরিগুলা তখন অনুবীক্ষণ দিয়াও চোখে পড়ে না।

ছবিতে যে কয়টিদেখান হইল তাহা নিতান্তই সামান্য, কারণ এপর্য্যন্ত অন্তত দশ হাজার রকমের ডায়াটম্ পাওয়া গিয়াছে। ছবিতে ডায়াটমগুলিকে ৬০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। আরও যত বড় করিবে, তাহার গায়ের কারুকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে। এখানে একটি মাত্র ডায়াটমকে ২০০০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইল। এক একটি ডায়াটম এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা আছে সন্দেশে এরূপ আরও কয়েকটি ছবি ক্রমে প্রকাশ করিব।
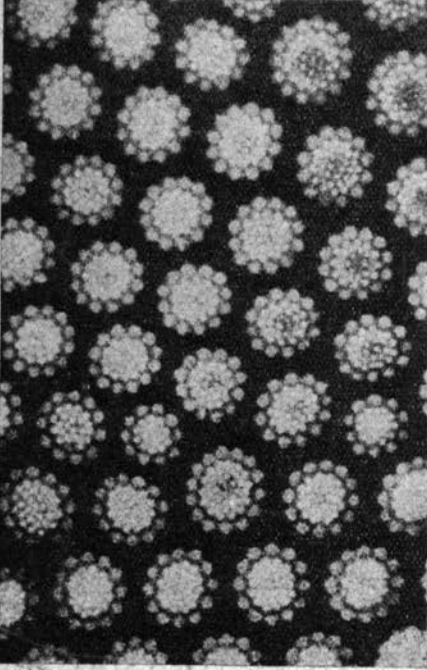
জীবন্ত অবস্থায় এই ডায়াটমগুলির মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায় এই যে, হাত পা কিছুই নাই, অথচ তাহারা চলিয়া বেড়ায়। জলের মধ্যে এমন সুন্দর সহজভাবে তাহারা ঘুরিয়া চলে, যে দেখিলে আশ্চর্য্য লাগে। কি করিয়া যে তাহারা চলে, তাহার কারণ ঠিক করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতদের অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।
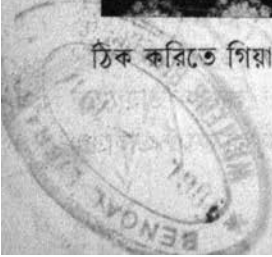
হাতে ধনু পিঠে তূণ, বাছা তবু কেঁদে খুন !
তূণভরা আছে তীর কাঁদ' কেন মহাবীর ?
ভাঙা ধনু ? কাঁদ তাই ? আহা ! আহা ! ম'রে যাই !

পঞ্চম বর্ষ আশ্বিন, ১৩২৪ ষষ্ঠ সংখ্যা

ছুটির আগে

আস্‌ছে পূজো ছুটি হবে উঠ্‌ছে নেচে মন
এখন কিগো ভাল লাগে পড়ার আয়োজন ?
ইস্কুলেতে রোজই যাওয়া
সাত দিনেতে ছুটি পাওয়া
নামতা শেখা, 'কাপি' লেখা, শেলাই সারাক্ষণ,
ইচ্ছে করে বনে পালাই এম্নি জ্বালাতন।

এদিকেতে শরৎ নভে সারা সকাল বেলা,
দেখ্‌ছি বসে আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলা,
উধাও হয়ে দম্‌কা হাওয়া
করছে শুধু আসা যাওয়া
ছড়িয়ে পাতা, ডালে ডালে হুড়োহুড়ির মেলা,
শাসন যত আমাদেরি ডুডু খেলার বেলা !

দুপুর বেলা মাঠে বনে গানের মজলিস্,
কোয়েল গাহে কুহু কুহু দয়েল দেয় শিষ,
শালিখ শ্যামা সবাই মিলে,
কতই গান যে শিখে নিলে,
ছাইএর 'সারিগামা' সাধা কাণে লাগে বিষ,
একঘেয়ে এক গৎ বাজান, দুয়ে উনিশ বিশ !

ইচ্ছে করে ধানের মত লুটিয়ে পড়ি মাঠে,
পাড়ে হ'তে একেবারে গড়িয়ে নামি ঘাটে,
ইচ্ছে করে সকাল সাঁঝে,
খেলে বেড়াই বনের মাঝে,
ইচ্ছে করে একটুও মন দিই না আর পাঠে,
অনেক সাধ মনে মনে, একটিও না খাটে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বীরভদ্র

(পদ্মপুরাণ)

পূর্ব্বকালে একসময়ে দেবতারা কশ্যপ প্রভৃতি মুনিদিগকে লইয়া শৌকর নামে পরম সুন্দর এক পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতে অনেক মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও বাসুদেবের মন্দির ছিল। সকলে বাসুদেবের পূজা করিয়া গিরিশেখরের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ অতি ভয়ঙ্কর ও দিগন্তব্যাপী এক অগ্নিশিখা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে সকলে ভস্ম হইয়া গেলেন।

সেই সময়ে শিবানুচর মহা তেজস্বী বীরভদ্রও সেই পর্ব্বতে বেড়াইতে ছিলেন। তিনি হঠাৎ হাহাকার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন—"লোক বিপদে পড়িলেই এরূপ বিলাপ করে, আর শবদাহের গন্ধও পাইতেছি—ব্যাপার খানা কি ?" এই ভাবিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া সেই আগুনের নিকট গেলে পর দেবতা ও ঋষিদিগের দাহ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভীষণ আগুন বীরভদ্রকে পোড়াইতে আসিল।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় মহাদেব তাঁহার মাথার একগাছি জটা দিয়া এই বীরভদ্রকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাদেবের কৃপায় বীরভদ্রের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ—যেন দ্বিতীয় শিব। ইনি দক্ষযজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে মারিয়া যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়াছিলেন। এমন কি কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ইঁহার নিকট হার মানিতে হইয়াছিল। সুতরাং আগুন তাঁহার কি করিবে? জল পাইলে তৃণের আগুন যেমন শীতল হইয়া যায়, বীরভদ্রকে দেখিয়া এই প্রচণ্ড আগুনও তেমনই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন বীরভদ্র ভাবিলেন—"এই আগুন বড় সহজ দেখিতেছি না, মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি পোড়াইয়া নাশ করিবে। অতএব ইহাকে আমি পান করিব।" এই ভাবিয়া তিনি ক্ষণকাল মধ্যে এই দিগন্তব্যাপী আগুন পান করিলেন। আগুন পান করিয়া বীরভদ্র দেবতা ও ঋষিদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন—উত্তর দিবে কে? তখন তিনি নিজের শরীর হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তাহাতে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পড়িলেন। তারপর সেই মন্ত্রপড়া ভস্ম মৃত দেবতা ও ঋষিদিগের ভস্মে রাখিবামাত্র সকলেই শরীর ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর দেবতা ঋষি সকলে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন পর্ব্বতের অন্যদিকে গেলেন তখন হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়া সকলকে গিলিয়া ফেলিল! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বীরভদ্র সেই সাপের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত একবৎসর কাল দুইজনে অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। তারপর মহাবীর বীরভদ্র দুইহাতে সাপের মুখ ধরিয়া তাহাকে চিরিয়া দুইভাগ করিলেন, এবং দেখিলেন—সাপের পেটের মধ্যে সকলেরই মৃতদেহ রহিয়াছে। তিনি তখনই সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া পুনরায় দেবতা ও ঋষিদিগকে বাঁচাইলেন। ইহাতে সকলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া বীরভদ্রকে প্রণাম করিলেন আর তাঁহাকে কত যে ধন্যবাদ করিলেন তাহার সীমা নাই।

দ্বিতীয় বার জীবন পাইয়া পুনরায় চলিতে চলিতে খানিক দূর গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—সম্মুখে মহা ভীষণ এক রাক্ষস! রাক্ষসের দশটা হাত, পাঁচটা পা ও আটটা মাথা! খুব পেট ভরিয়া আহার করিতে পারিবে ভাবিয়া সে বানররাজ বালীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধরিয়া ছিলেন তখন তাঁহার শরীরে যতটা বল ছিল—বানররাজ বালীর শরীরে তাহার দ্বিগুণ বল। ইহার উপর আবার তাঁহার ছোট ভাই সুগ্রীব তাঁহার সহায়! কিন্তু তবুও সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বালীর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ সুগ্রীবকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বালী ভাবিতেছিলেন

—"কি করিয়া এই দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া ভাইকে রক্ষা করিব;" এই অবসরে রাক্ষস বালীকেও ধরিয়া একেবারে পেটের মধ্যে পূরিল!

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন! কিন্তু তাঁহাদিগকে আর বেশী দূর যাইতে হইল না—দশ হাত বাড়াইয়া সেই ভীষণ রাক্ষস সকলকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল!

মহাত্মা বীরভদ্রও এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল এবং নিমেষ মধ্যে পঞ্চাশ যোজন বিস্তৃত এক পাথর লইয়া রাক্ষসের মাথাগুলির ঠিক মাঝখানে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ আঘাতে তাহার একটা মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের চূড়া

লইয়া রাক্ষসকে পুনরায় আঘাত করিলে সে অনায়াসে চূড়াটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"এতক্ষণ তোমার বল দেখিলাম, এখন একবার আমার বল দেখ।" এই বলিয়া সে দুইখানি তলোয়ার লইয়া একখানি বীরভদ্রের হাতে দিয়া পুনরায় বলিল—"আইস! আমরা তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করি।"

বীরভদ্র সম্মত হইয়া তলোয়ার গ্রহণ করিলে পর দুইজনে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বীরভদ্রের গলায় এমনই আঘাত করিল যে রক্তে তাঁহার গলা লাল হইয়া গেল। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি দারুণ এক আঘাতে রাক্ষসের দুইটা মাথা কাটিয়া ফেলিয়া এমনই এক সিংহনাদ করিলেন যে সেই শব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। এইরূপে উভয়ে ক্রমাগত তিনবৎসর যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কাহারও জয় হইল না। অবশেষে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবীর বীরভদ্র সাংঘাতিক এক আঘাতে রাক্ষসের সব গুলি মাথা কলাগাছের মত কাটিয়া, দেবতা ঋষি ও বানর দুটিকে বাহির করিলে পর সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেবী পার্ব্বতী নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতেছেন।

এদিকে পার্ব্বতী দেবীর সঙ্গে দেবর্ষি নারদ ও এই ঘটনা দেখিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নিকট গিয়া এই ঘটনা বর্ণন করিয়া কহিলেন—"এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে মারিয়া বীরভদ্র আজ বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। এই রাক্ষসের বৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত। আমি বলিতেছি—শুনুন—

অসুরদিগের রাজা হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে এক মহা বলবান রাক্ষস দেবতাদিগের সহিত একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ রাক্ষস যুদ্ধে বহুবার হত হইলেও শুক্রাচার্য্য তাহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। তখন সে শুক্রাচার্য্যকে বলিল—'প্রভু! বারবার মরিয়াও আপনার কৃপায় আমি পুনরায় জীবন পাই। আমার মনে আছে, একবার যমের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে আমি যমরাজাকে গিলিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু বলবান্ যম আমার পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল। আর তখনও আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তাই আমি মনে করিয়াছি যে, এখন হইতে যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়াই যাহাতে মরিয়া যায়, সে জন্য আমি কঠোর তপস্যা করিয়া বর লাভ করিব।'

এ কথা শুনিয়া গুরু, শুক্রাচার্য্য বলিলেন—'তুমি সমন্ত-পঞ্চকতীর্থে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা মহেশ্বরের তপস্যা কর, তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

শুক্রাচার্য্যের উপদেশমত সেই দুষ্ট রাক্ষস সমন্তপঞ্চকে গিয়া আগুন জ্বালিয়া ছয়মাসকাল অতি দারুণ তপস্যা করিল। কিন্তু তবুও কোন দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া সে যে উপায় অবলম্বন করিল সে অতি ভীষণ! একটি একটি করিয়া নিজের মাথা কাটে আর আগুনে অহুতি দেয়। এইরূপে চারিটি মাথা কাটিয়া পঞ্চম মাথা কাটিতে উদ্যত হইবামাত্র মহাদেব তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—'ওহে রাক্ষস! তুমি আর এরূপ ভয়ানক কাজে সাহস করিও না। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এখন কি বর চাও, বল।'

ইহা শুনিয়া সেই রাক্ষস যোড়হস্তে অতি বিনয়ের সহিত বলিল—'প্রভু! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাকে এই চারিটি বর দিন—যুদ্ধে আমার মাথা কিংবা হাত কাটা গেলে তখনই তাহা গজাইবে। আমি যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়া মরিয়া যাইবে। বরাহরূপধারী বিষ্ণুর শরীরে যত বল, আমার শরীরে তাহার চতুর্গুণ বল হইবে। এবং আপনার জটা হইতে যে লোক জন্মিবে সে ছাড়া অন্য কেহ আমাকে মারিতে পারিবে না।' তখন মহাদেব 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"

রাক্ষসের এই বৃত্তান্ত বলিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন—"আপনারা আসিয়া দেখুন—বীরভদ্র আজ সেই বরপ্রাপ্ত মহা পরাক্রান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

নারদের কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ঘটনাস্থলে গিয়া বীরভদ্রকে অনেক ধন্যবাদ করিলেন। তারপর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সকলে অবিলম্বে সেখান হইতে প্রস্থান করিলে পর মহাত্মা বীরভদ্রও মন্ত্রপূত ভস্মদ্বারা সকলকে জীবিত করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

গোখুরো শিকার।

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেজের নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরার মত ক'রে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত; কত দিন কল পেতে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না! তখন সাহেব ভাবলেন ইঁদুর মারবার বিষবড়ী না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই

হটাৎ একদিন দেখা গেল আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পালিয়েছে! সবাই বল্ল, "ব্যাপারখানা কি"? দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড় গুরুতর—ইঁদুরের গর্ত্তে প্রকাণ্ড দুই গোখুরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলস্থূল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান্ সব চলতে ফিরতে সাবধানে থাকে, রাত্রে গাড়ী জুত্‌তে হ'লে লোক জন লাঠি মশাল, নানা রকম হাঙ্গামার দরকার হয়—তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই চায় না। সাহেব দেখলেন মহা মুস্কিল, এর চাইতে ইঁদুরইত ছিল ভাল।

সাহেবের যে চাপরাসি, সে লোকটি ভারী সেয়ানা—সে বল্লে, "হুজুর, আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম কিনে আনছি"। পরের দিন চাপরাশি সেই চার আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির—একটা বঁড়শি আর ছিপ্ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাং! দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসিকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বল্লেন, "বেয়াকুব! তোকে সাপ মারতে বল্লাম, আর তুই মাছ ধরবার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি"। চাপরাসি সেসব কথায় কাণ না দিয়ে ব্যাংটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চল্ল; তামাসা দেখবার জন্য সবাই তার পিছন পিছন চল্ল। তারপর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাংটাকে গর্ত্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসি শক্ত ক'রে ছিপের গোড়ায় ধ'রে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। আর চাপরাশি সেই আধগেলা ব্যাংশুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্ত্তের মধ্যে থেকে হিড়ি হিড় ক'রে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন তারা ক্রমাগত গিলতেই থাকে, যা একবার গলার মধ্যে ঢোকে, তাকে আর ঠেলে বার করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাং আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ; এমনি ক'রে গোখুরো মশাই চার আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তারপর লাঠিপেটা ক'রে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ?

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন ক'রে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না—সবাই হয়রান হ'য়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হ'য়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল—সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব ছুটে দেখতে গেলেন; গিয়ে দেখেন সাপ তখনও গর্ত্ত থেকে বেরোয়নি—চাপরাসি ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্ত্তের বাইরে এসেছে, এমন সময় চাপরাসির টানে ব্যাংটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস্

ফোঁস্ করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা ক'রে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, লাটি পেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাং বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু একটা তখনও বেশ বেঁচে ছিল—একটা ত একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব ত এ কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক্। সাপের পেটে গিয়েও যে কোন জন্তু বেঁচে থাকতে পারে এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও, এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমেরিকার "শিংওয়ালা" সাপের সম্বন্ধেও এই রকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মত খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না, তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মত পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন "রেড ইণ্ডিয়ান" জাতির লোক এই সময় তাকে দেখতে পেলে তার মাথায় ডাণ্ডাপেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্তগেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যা হোক, সাহেব ত সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে আস্তাবলের মেঝের নীচে সাপের ছোট ছোট বাচ্চায় একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে। এখন উপায় কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গাম তবে এতগুলো যখন বড় হবে তখন কি হবে। আবার চাপরাসির ডাক পড়ল। চাপরাসি বল্‌ল "হুজুর! আমি এরও উপায়

জানি।" এবারের উপায়টি আরও আশ্চর্য্য। এবার প্রকাণ্ড বড় বড় কোলাব্যাং এনে আস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা মহাফূর্ত্তি ক'রে পেটভ'রে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় ক'রে দিল! সাপকে দিয়ে ব্যাং খাইয়ে, তারপর ব্যাংকে দিয়ে সাপ গেলান! চমৎকার শিকার, না?

ব্যাঙের ছানা

সরু সরু ঠ্যাং ছড়িয়ে,
উঁচু ক'রে হাত দুখানা,
উঠানেতে লাফায় দেখ
কেমন মজার ব্যাঙের ছানা।

থপ্ থপ্ থপ্, যাচ্ছে নেচে,
দেখ্ছে খানিক মুখ বাড়িয়ে,
ঐ যা, বুঝি গেল প'ড়ে
দেয়াল বেয়ে চড়্তে গিয়ে!

উঠ্তে নিজে পার্ছেনা ত;
যাই মা আমি দিইগে তুলে?
এত টুকু ছানা ও যে,
কেউ যদি দেয় মাড়িয়ে ভুলে?

ব্যাঙেরো কি মা আছে, মা?
ছেড়ে কেন দিয়েছে ওরে,
ঝড় বাদলে জলে কাদায়,
একলা যেতে, এমন ক'রে?

শ্রীসুখলতা রাও।

মূর্খের স্বর্গযাত্রা

(কথাসরিৎসাগর)

শুধু মূর্খ বোকাদের থাকিবার জন্য একটা আশ্রম ছিল। দেশের যত বোকা, কেহ আর বাকি রহিল না। আশ্রম একেবারে ভরপূর! ইহাদিগের মধ্যে সকলের চেয়ে যে আকাট মূর্খ সেই ছিল দলের সর্দ্দার! এই সর্দ্দার বোকা একদিন শুনিল—শাস্ত্রে লেখা আছে যে, টাকা খরচ করিয়া পুকুর কাটাইলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। আবার যত বড় পুকুর তত বেশী পুণ্য!

সর্দ্দার বোকার ধন ছিল যথেষ্ট! সহজ উপায়ে এই পুণ্য সঞ্চয়ের লোভটি সে ছাড়িতে পারিল না। অনেক টাকা খরচ করিয়া আশ্রমের নিকটেই প্রকাণ্ড বড় এক দিঘী কাটাইল। তারপর একদিন সর্দ্দার মূর্খ চলিল তাহার দিঘীটি দেখিতে। দিঘীর চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল একজায়গায় পারের মাটি জন্তুতে খুঁড়িয়াছে। পরদিন আবার গিয়া দেখিল অন্য এক জায়গায় আঁচড়ের দাগ! তখন তাহার হইল বিষম রাগ এবং সে ভাবিল—'বটে! এত টাকা খরচ করিয়া পুকুর কাটাইলাম আর জন্তুতে আসিয়া পার নষ্ট করিবে? কাল সারাদিন পাহারা দিয়া জন্তুটাকে ধরিব তবে ছাড়িব।"

এই ভাবিয়া সর্দ্দার বোকা পরদিন প্রাতঃকালে পুকুরের পারে লুকাইয়া পাহারা দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পাহারা দিবার পর সে দেখিল প্রকাণ্ড একটা বলদ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার বড় বড় শিং দিয়া পারের মাটি খুঁড়িতেছে! তখন সে ভাবিল—"এ স্বর্গের বলদ, আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। এখন আমি ইচ্ছা করিলে ত ইহার সাহায্যে স্বর্গে যাইতে পারি।" এই ভাবিয়া সে বলদের নিকটে গিয়া দুই হাতে খুব শক্ত করিয়া তাহার লেজ ধরিল!

লেজ ধরিবামাত্র বলদ মূর্খকে লইয়া আকাশে উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে একেবারে কৈলাশ পর্ব্বতে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া উপস্থিত! সেখানে মূর্খ স্বর্গের মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি নানা রকম মিষ্ট খাবার খাইয়া পরমসুখে কিছুকাল বাস করিল। এদিকে বলদ কিন্তু প্রতিদিন নীচে সেই দিঘীর পারে নামিয়া যায় এবং পুনরায় ফিরিয়া আসে। ইহা দেখিয়া মূর্খ ভাবিল—"বন্ধুদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি, অনেক দিন দেখি নাই, একবার গিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আর এই মজার গল্পটা বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিব।" পরদিন বলদ যখন নীচে নামিয়া যাইতেছিল তখন সে পুনরায় তাহার লেজ চাপিয়া ধরিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল।

তারপর সে যখন আশ্রমে গেল তখন যত মূর্খের দল, এতদিন পরে দলপতিকে পাইয়া আনন্দে একেবারে অস্থির! তাহারা তাহাকে বুকে জড়াইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন সর্দ্দার সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলে পর তাহারা মিনতি করিতে লাগিল—"ভাই! আমা-দিগকেও সেখানে লইয়া চল। একবার স্বর্গটা দেখিয়া লইব, আর কিছুদিন তোমার মত মণ্ডা মিঠাই খাইয়া আসিব।" সর্দ্দার সম্মত হইয়া সকলকে স্বর্গে যাইবার পন্থা বলিয়া দিল।

পরদিন সর্দ্দার দলবল লইয়া পুকুরের পারে গেলে পর অল্প সময়ের মধ্যে বলদও আসিয়া উপস্থিত! সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ 'ধরধর' করিয়া বলদকে ধরিয়া ফেলিল; আর একজন ধরিল সর্দ্দারের পা, আর একজন ধরিল এই দ্বিতীয় মূর্খের পা, আর একজন ধরিল তৃতীয়ের পা—এইরূপে একের পা অন্যে ধরিয়া ক্রমে যখন তাহারা প্রকাণ্ড একটা মালার লহরের মত হইল তখন সেই মূর্খের মালা লইয়া বলদ আকাশে উড়িল।

ক্রমে অনেক উপরে উঠিলে একটা মূর্খ, সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই! আমার বড় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে—বল না, স্বর্গের মিঠাইগুলি কত বড়?" এই প্রশ্নের উত্তর যদি না দিবে তবে আর তাহাদিগকে বোকা বলিবে কেন? সর্দ্দার তখনই দুই হাত একসঙ্গে বাটির মত করিয়া বলিল—"এই, এত বড়।" এদিকে, "এত বড়" সেটা দেখাইতে গিয়া উৎসাহে সর্দ্দার বোকা মুঠি ছাড়িয়া দিয়াছে—আর মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্খের দল বহু নীচে মাটিতে পড়িয়া একেবারে চূরমার! তখন বলদও কৈলাশ পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। আসে পাশে লোকজন যাহারা এই ব্যাপার দেখিয়াছিল মূর্খের দলের কাণ্ড দেখিয়া তাহাদেরত চক্ষুস্থির!

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

সমুদ্রের জীব

খুব অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্রের জলে এক প্রকার আলোক দেখা যায়। অবশ্য উহা হইতে প্রদীপের আলোর ন্যায় আলো বাহির হয় না; খালি জলে এক রকম ঝিকিমিকি মাত্র দেখা যায়। ঢেউ ভাঙ্গিবার সময় মনে হয়, যেন অসংখ্য জোনাকী জলের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, যে তাহা ভারি সুন্দর। সমুদ্রের জলে নাকি এক রকম জীবাণু আছে, তাহা নাড়া পাইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই জীবাণু ঐরূপ আলোকের কারণ।

জীবাণুর কথায় জীবজন্তুর কথা সহজেই মনে হইতে পারে। সমুদ্রের জীবের নাম শুনিয়াই হয়ত তোমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ; মনটাকে হয়ত কত বড় বড় জিনিসের জন্যঁ প্রস্তুত করিয়া লইতেছ। সমুদ্রে বড় বড় জন্তু যে অনেক আছে, তাহাতে আর ভুল কি? দুটা একটা তিমি যে বঙ্গসাগরে না দেখা যায়, এমন নহে; তাহার প্রমাণ ত যাদুঘরে গেলেই দেখা যায়। কিন্তু আমি এখানে পুঁথি খুলিয়া গল্প ফাঁদিতে বসি নাই, যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতে যাইতেছি, সুতরাং "সমুদ্রের সাপ" (Sea Serpent) তিমি প্রভৃতির কথা বলার অবসর আমার হইবে না। আমি যে সমুদ্রের সাপ দেখিয়াছি, তাহা সাড়ে তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। দেখিতে কতকটা ঢোঁড়া সাপের মত, গায় ডুমো ডুমো দাগ আছে, ল্যাজটা চ্যাটাল। এইরূপ একটা

সাপ সমুদ্রের ধারে মরিয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রের সাপগুলির ল্যাজ প্রায়ই চ্যাটাল হয়, তাহাতে সাঁতরাইবার খুব সুবিধা। যা হউক আমি মাছের কথাই এখন বলিব। তবে মাছ শব্দটা এখানে একটু খোলা ভাবেই ব্যবহার হইতেছে। এরূপ অনেক জানোয়ার আছে যে তাহাদের চৌদ্দপুরুষের কেহ মাছের ধার ধারে নাই, অথচ তাহারা 'মাছ'। যেমন "জেলী" মাছ, "চিংড়ি" মাছ, "কট্‌ল্" মাছ ইত্যাদি। ইহাদের কেহ শামুক, কেহ পোকা, আর কেহ যে কি, তাহা এক কথায় বলা ভারি মুস্কিল। যাহা হউক লোকে উহাদিগকে মাছই বলে, সুতরাং আমিও তাহাই সুবিধাজনক মনে করিতেছি।
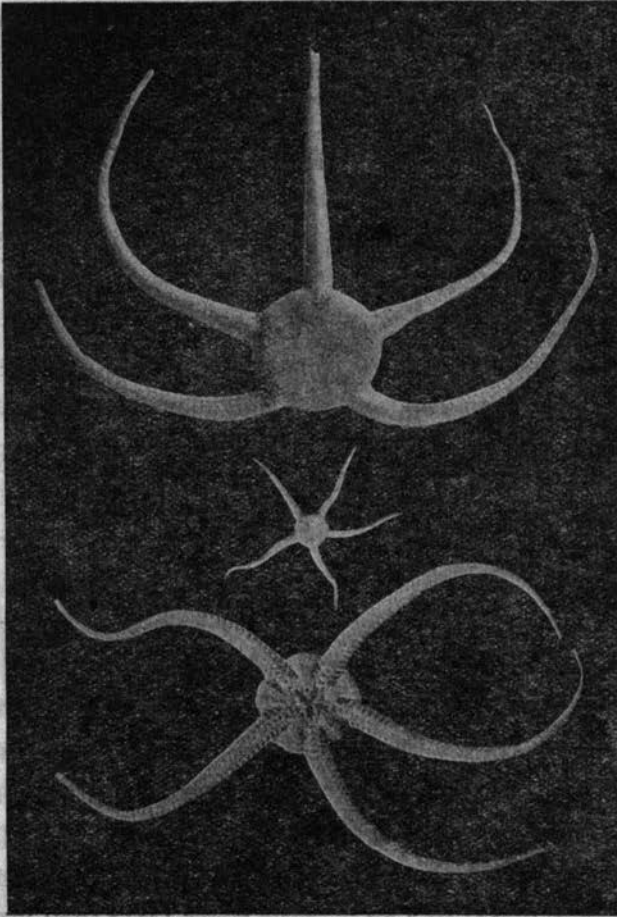
ইহাদের মধ্যে সকলের আগে "জেলী" মাছের (jelly fish) আর "তারা" মাছের (star fish) কথা বলিতে হয়। জন্তুর মধ্যে ইহারা সকলের চাইতে নিম্ন শ্রেণীর। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে দেখিয়া কখনই বলিবে না, যে ইহারা কোনরূপ জন্তু। বরং ইহাদের চেহারা দেখিলে হঠাৎ গাছ পালার কথাই মনে হইতে পারে। যাহা হউক, ইহারা জন্তু। ইহাদের আবার নানা রকম শ্রেণীভেদ আছে, যদিও আমি একরকম

ছাড়া আর কোন তারামাছ সেখানে দেখিতে পাই নাই। এই মাছের চেহারা পাঁচ কোণা তারার মতন। তাহার নাক মুখের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাদের স্বভাব চরিত্র অতিশয় আশ্চর্য্য। দুঃখের বিষয়, আমি তাহার কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, পুস্তকে পড়িয়াছি মাত্র। ইহারা ছোট ছোট শামুক ঝিনুক খাইয়া জীবন ধারণ করে। পুরীতে যে তারা মাছ দেখিয়াছিলাম, তাহার ভিতরে খুব ছোট ছোট ঝিনুকের খোলা পাইয়াছি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন উহাদের আচার ব্যবহারের আর কোন পরিচয় পাই নাই। এগুলি দেখিতে একটুও সুন্দর নয়। এক দিকের রং কাল, আর একদিকের রং ফ্যাকাশে। মনে হয়, যেন পুরাণজুতার পচা চামড়া আর হাড়ের কুচি দিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। কিন্তু আমি পুস্তকে পড়িয়াছি যে অতিশয় সুন্দর তারা মাছ আছে। আর তাহাদের কোন কোনটার এই একটা আশ্চর্য্য স্বভাব আছে, যে তাহারা ভয় পাইলে আত্মহত্যা করে। সমুদ্রের ভিতরে অনেক নাড়াচাড়া সহ্য করে; কিন্তু জল হইতে তুলিলেই সে দেখিতে দেখিতে তাহার হাত পা ফেলিয়া দেয়। তারা মাছের মাঝখানটায় তাহার মুখ থাকে; চারিধারের পাপড়ি অথবা ডাল পালার মতন জিনিষগুলি তাহার পা। কোন কোনটা সাঁতরাইতে পারে, শিকার আঁকড়িয়া ধরিতেও পারে। কিন্তু কোন কোনটার হাত পা নাড়িবার বেশী ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার চলা ফেরা করিতেই পারে না, একটা বোঁটা দ্বারা কোন জিনিষের গায় আটকান থাকে, এরূপ তারা মাছও আছে।

জেলী মাছ সেখানে অনেক রকম আছে। আকারে আধুলি হইতে ঝুড়ির মতন পর্য্যন্ত জেলী মাছ দেখিয়াছি। ইহাদিগকে দেখিলে তাল শাঁস অথবা থক্‌থকে সাগুর কথা মনে হয়। সকল গুলিরই সাধারণ আকৃতি ছাতা অথবা টুপীর মতন, কোন কোনটা উড়ে বেয়ারাদের পানের থলের মতন। আবার সকলেরই কোন রকমের ঝালর আছে। রং সাদা অথবা লাল্‌চে, তাহাতে অনেক সময় সবুজ কারিকুরি থাকে। ইহারা জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, আর ভয় পাইলে শরীর কোঁচকাইয়া হাত পা গুটাইয়া (ঐ ঝালর উহাদের হাত পা, মাঝখানে মুখ) সমুদ্রের তলায় পড়িয়া যায়। কোন কোনটা রাত্রেতে জ্বলে। অনেকগুলি আবার এমন আছে, যে তাহা গায় লাগিলে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা কতকটা বিছুটির জ্বালার মতন, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী, আর ইহাতে বুকের ভিতরে কেমন একটা কষ্ট বোধ হয়। জালে পড়িয়া বিস্তর জেলী মাছ উঠে; জেলেরা জেলী মাছকে বলে "সৎরাং।" ইহাদের ইংরাজি নাম "জেলী ফিশ্"

আর "সাগর বিছুটি" (sea nettle)। ইহাদের কোন্‌টা নির্দ্দোষ আর কোন্‌টা বিষাক্ত, জেলেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। সাধারণতঃ তাহারা এগুলিকে দু হাতে ঘাঁটে, রাঁধিয়া নাকি খায়ও। কিন্তু একদিন একটা খুব উজ্জ্বল স্বচ্ছ আর সবুজ কারিকুরী ওয়ালা জেলী মাছ দেখিয়া যাই তাহার কাছে গিয়াছি, অমনি একজন জেলে আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল "বাবু, বিঙ্কিব।" অবশ্য আমি আর তাহার কাছে যাই নাই। আর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে উহার চেহারা আমি কখনও ভুলিব না। অতঃপর আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমিও বলিতে পারিব—"বিঙ্কিব!" এর

পর "কটল্‌" মাছের (cuttle fish) কথা বলি, তবেই শেষ হয়। এ মাছ যে, মাছ নয়, তাহা ত বলিয়াই রাখিয়াছি। ইহারা শামুক জাতীয় জন্তু; কিন্তু শামুকের মতন ইহাদের খোলা নাই, যদিও একটা নরম গোছের হাড় আছে। এই হাড় সমুদ্রের ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা সাদা শশা বীচির মতন আকৃতি, কিন্তু শশা বীচির চাইতে ঢের বড়। এক ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হাড় সচরাচর দেখা যায়। অন্যান্য জন্তুর হাড়ের মতন ইহা তত মজবুত নহে। কতকটা খড়ির মতন, সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়। সাধারণ লোকে যত্নপূর্ব্বক এই হাড় কুড়াইয়া আনে, বাজারে বিক্রয়ও করে। এই হাড়ে নাকি

অনেক ভাল ভাল ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার চলিত নাম "সমুদ্রের ফেণা।" অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্রের ফেণা জমিয়া এই জিনিস জন্মায়। আসলে অবশ্য তাহা নহে, ইহা কট্‌ল্‌ফিশের হাড়। ইংরাজিতে এ জিনিসকে "কট্‌ল্ বোন্" (cuttle bone) বলে।

নাপিত পণ্ডিত

বাগদাদ সহরে এক ধনীর ছেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, সে কাজির মেয়েকে বিবাহ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়—সুতরাং কিছু দিন চেষ্টা করিয়াই সে বেচারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই—তার কেবলই ঐ এক চিন্তা—কি করিয়া কাজির মেয়েকে বিবাহ করা যায়।

বিবাহের সব চাইতে বড় বাধা কাজি সাহেব স্বয়ং। সকলেই বলে "বাপু হে! কাজি সাহেব এ স্পর্দ্ধার কথা জানতে পারলে তোমার একটি হাড় আস্ত রাখবেন না।" বেচারা কি করে? ক্রমাগত ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রীতিমত জ্বর আনিয়া ফেলিল—বন্ধুবান্ধব বলিতে লাগিল "ছোকরা বাঁচলে হয়।" ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন এক বুড়ী আসিয়া খবর দিল, বিবাহের সমস্তই ঠিক! কাজি সাহেবকে না জানাইয়াই এখন চুপচাপ বিবাহটা হইয়া যাক্—তার পর সুবিধামত তাঁহাকে খবর দেওয়া যাইবে; তখন তিনি গোল করিয়া করিবেন কি? সে আরও বলিল, "শুক্রবার সন্ধ্যার সময় কাজি সাহেব বাড়ী থাকবেন না—সেই সময় বিয়েটা সেরে ফেল—কিন্তু খবরদার! কাজি সাহেব যেন এসব কথার বিন্দুমাত্রও জানতে না পারেন।"

শুক্রবারদিন ভোর না হইতে বর বেচারা হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার আর সবুর সয় না। দুপুর না হইতেই সে চাকরকে বলিল "একটা নাপিত ডেকে আন্। এখন থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকি।" চাকর তাড়াতাড়ি কোথা হইতে এক নাপিত আনিয়া হাজির করিল।

নাপিত আসিয়াই বরকে বলিল "আপনাকে বড় কাহিল দেখছি—যদি অনুমতি করেন ত ছুরি দিয়ে বাঁ হাতের একটুখানি রক্ত ছাড়িয়ে দেই—তা হলেই সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ করবেন।" বর বলিল "না হে, তোমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকি নাই—আমার দাড়িটা একটু চটপট কামিয়ে দাও দেখি।" নাপিত তখন তাহার সরঞ্জামের থলি খুলিয়া অনেকগুলা ক্ষুর বাহির করিল, তারপর প্রত্যেকটা ক্ষুর হাতে লইয়া বার বার

"আমার মত দ্বিতীয় আর কেউ নাই"

করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সময় নষ্ট করিয়া সে একটা বাটির মত কি একটা বাহির করিল। বর ভাবিল, এইবার বাটিতে জল দিয়া কামান স্থুরু করিবে। কিন্তু নাপিত তাহার কিছুই করিল না ; সে অদ্ভুত একটা কাঁটা কম্পাসের মানযন্ত্র লইয়া ঘরের বাহিরে উঠানের মাঝখানে গিয়া সূর্য্যের গতিবিধির কি সব হিসাব করিতে লাগিল। তারপর আবার গম্ভীরভাবে ঘরে আসিয়া বলিল "মহাশয়, হিসাব ক'রে দেখলাম এই বৎসর এই মাসে এই শুক্রবারের ঠিক এই সময়টি অতি চমৎকার শুভক্ষণ—দাড়ি কামাবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আজ মঙ্গলবুধ গ্রহসংযোগ হওয়াতে আপনার কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখছি।"

কাজের সময় এরকম বকবক করিলে কাহার না রাগ হয়? বিবাহার্থী ছোক্‌রাটি রাগিয়া বলিল "বাপু হে, তোমাকে কি বক্তৃতা শুনাবার জন্য অথবা জ্যোতিস গণনার জন্য ডাকা হয়েছে? কামাতে এসেছ, কামিয়ে যাও।" কিন্তু নাপিত ছাড়িবার পাত্রই নয়, সে অভিমান করিয়া বলিল "মশাই এ রকম অন্যায় রাগ আপনার শোভা পায় না। আপনি জানেন আমি কে? আপনি কি জানেন যে বাগ্‌দাদ সহরে আমার মত দ্বিতীয় আর কেউ নাই? আমার গুণের কথা শুনবেন? আমি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক, রসায়ন শাস্ত্রে আমার অসাধারণ দখল, আমার জ্যোতিষ গণনা

একেবারে নির্ভুল, নীতিশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র, এ সমস্তই আমার কণ্ঠস্থ, জ্যামিতি থেকে সুরু করে বীজগণিত পাটিগণিত পর্য্যন্ত গণিত শাস্ত্রের কোন তত্ত্বই, জানতে বাকী রাখি নি। তার উপর আবার আমি একজন পাকা দার্শনিক পণ্ডিত, আর আমি যে সকল কবিতা রচনা করি, সমঝ্‌দার লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না।"—নাপিতের এই বক্তৃতার দৌড় দেখিয়া ছোকরাটি ভীষণ রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল "তোমার বক্তৃতা শুনবার ফুরসৎ আমার নাই—তুমি কামান' শেষ করিবে কি না বল, না কর চলে যাও"! নাপিত বলিল "এই কি আপনার উপযুক্ত কথা হ'ল?। আমি কি আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম, না আপনি নিজেই লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়েছিলেন? এখন আমি আপনাকে না কামিয়ে গেলে, আমার মান সম্ভ্রম থাকে কি করে? আপনি সেদিনকার ছেলে, আপনি এ সবের কদর বুঝবেন কি? আপনার বাবা যদি আজ থাকতেন, তবে আমাকে ধন্য ধন্য বলতেন—কারণ তাঁর কাছে কোন দিনই আমার সম্মানের ত্রুটি হয় নি। আমার এ সকল অমূল্য উপদেশ শুনবার সৌভাগ্য সকলে পায় না—তিনি তা বেশ বুঝতেন। আহা তিনি কি চমৎকার লোকই ছিলেন! আমার কথাগুলি কত আগ্রহ করে তিনি শুনতেন! আর কত খাতির কত তোয়াজ করে কত অজস্র বখসিস্ দিয়ে তিনি আমায় খুসী রাখতেন! আপনিত সে সব খবর রাখেন না!" এই রকম বক্তৃতায় সে আরও আদঘণ্টা সময় কাটাইয়া দিল। এদিকে বেলাও বাড়িতেছে, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কাজেই বর একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিল "যাও! যাও! তোমার কামাতে হবে না।"

নাপিত তখন অগত্যা তাড়াতাড়ি ক্ষুর লইয়া কামাইতে সুরু করিল। কিন্তু ক্ষুরের দুই চার টান দিয়াই সে আবার থামিয়া বলিল, "মশাই! ওরকম রাগ করা ভাল নয়। ভেবে দেখুন, জ্ঞানে গুণে বয়সে সব বিষয়েই আপনি ছেলেমানুষ। তবে অবশ্যি, আপনার যে রকম তাড়া দেখছি তাতে বোধ হয় আপনি আজকে একটু বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এরকম ব্যস্ততার কারণটা কি জানতে পারলে, আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ঠিক ভালমত ব্যবস্থা করতে পারি"। এই বলিয়াই সে আবার তাহার মানযন্ত্র লইয়া হিসাব করিতে লাগিল। যতই তাড়া দেওয়া যায়, ততই সে বলে "এই, হিসাবটা হ'ল ব'লে"। তখন বেগতিক দেখিয়া বর বলিল, "আরে, ব্যাপারটা কিছু নয়—আজ রাত্রে আমার একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে—তাই, বড় তাড়াতাড়ি।"

এই কথা শুনিবামাত্র নাপিত একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল, "ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলেন! আমার বাড়ীতেও যে আজ ছয়জন লোককে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি! তাদের জন্য ত কোন রকম বন্দোবস্ত ক'রে আসিনি। এখন, মনে করুন, মাংস কিন্‌তে হবে রাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে মিঠাই আন্‌তে হবে,— কখন বা এসব করি, আর কখনই বা আপনাকে কামাই"। বর দেখিল আবার বেগতিক, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, "দোহাই তোমার! আর আমায় ঘাঁটিও না—আমার চাকরকে বলে দিচ্ছি—তোমার যা কিছু চাই আমার ভাঁড়ার থেকে সমস্তই সে বা'র ক'রে দেবে— তার জন্য তুমি মিথ্যে ভেব না"। নাপিত বলিল "এ অতি চমৎকার কথা। দেখুন্, হামামের মালিশওয়ালা জাস্তৌৎ—আর ঐ যে কড়াইসুঁটি বিক্রী করে, সালি—আর ঐ শিম বেচে, সালৌৎ—আর আখের শা তরকারীওয়ালা আর আবু মেকারেজ ভিস্তি, আর পাহারাদার কাশেম —এরা সবাই ঠিক আমার মত আমুদে—এরা কখনও মুখ হাঁড়ি করে থাকে না; তাই এদের আমি নেমন্তন্ন করেছি। আর এদের একটা বিশেষ গুণ যে এরা ঠিক আমারই মত চুপচাপ্ থাকে—বেশী বক্ বক্ করতে ভাল বাসে না। এক একজন লোক থাকে তারা সব সময়েই বকর বকর করছে—আমি তাদের দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে। এরা কেউ সে রকম নয়; তবে নাচতে আর গাইতে এরা সবাই ওস্তাদ। জাস্তৌৎ কি রকম ক'রে নাচে দেখবেন?

ঠিক এই রকম”—এই বলিয়া সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য ও বিকটস্বরে গান করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নয়,ঐ ছয়জন বন্ধুর মধ্যে প্রত্যেকে কি রকম করিয়া নাচে ও গায় তাহার নকল দেখাইয়া তবে সে ছাড়িল। তারপর, হঠাৎ সে ক্ষুরটুর ফেলিয়া ভাঁড়ার ঘরে চাকরের কাছে তাহার নিমন্ত্রনের ফর্দ্দ দিতে ছুটিল। বর ততক্ষণে আধ কামান অবস্থায় ক্ষেপিয়া পাগলের মত হইয়াছে, কিন্তু নাপিত তাহার কথায় কানও দেয় না। সে গম্ভীর ভাবে ঘরের হাঁস মুরগী তরীতরকারী হালুয়া মিঠাই সব বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করিতে লাগিল। তারপর আরও অনেক গল্প আর অনেক উপদেশ শুনাইয়া অতি ধীর মেজাজে সাড়ে চার ঘণ্টায় সে তাহার কামান' শেষ করিল! আবার যাইবার সময় বলিয়া গেল, “দেখুন, আমার মত এমন বিজ্ঞ, এমন শান্ত, এমন অল্পভাষী হিতৈষী বন্ধু আপনি পেয়েছেন, সেটা কেবল আপনার বাবার পুণ্যে। আজ হ'তে আমি আপনার কেনা হ'য়ে রইলুম।”

নাপিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বর দেখিল, আর সময় নাই। সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে বাহির হইল। লোক জন সঙ্গে লইল না, এবং কাহাকেও খবর দিল না, পাছে কথাটা কোন গতিকে কাজি সাহেবের কাছে ফাঁস হইয়া যায়।

এদিকে নাপিতও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকে নাই। সে কেবল ভাবিতেছে, “না জানি সে কি রকম নেমন্তন, যার জন্য সে এমন ব্যস্ত, যে আমার ভাল ভাল কথা গুলো পর্য্যন্ত সে শুনতে চায় না! ব্যাপারটা দেখতে হ'চ্ছে”। সুতরাং বর যখন সন্ধ্যার সময় বাহির হইল, নাপিতও তাহার পিছন পিছন লুকাইয়া চলিল।

বর সাবধানে কাজির বাড়ী হাজির হইয়া খবর লইল যে কাজি সাহেব বাড়ীতে নাই; এদিকে সব আয়োজন প্রস্তুত—তাড়াতাড়ি বিবাহ সারিতে হইবে। দৈবাৎ যদি কাজি সাহেব আসিয়া পড়েন, তাহার জন্য ছাতের উপর পাহারা বসান হইল, তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই সে চীৎকার করিয়া সঙ্কেত করিবে এবং বরকে খিড়কী দরজা দিয়া পলাইতে হইবে। এদিকে কিন্তু হতভাগা নাপিতটা বাড়ীর বাহিরে থাকিয়া, যে আসে তাহাকেই বলে “তোমরা সাবধানে থেক—আমাদের মনিবটি কেন জানি এই কাজির বাড়ীতে ঢুকেছেন—তাঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হচ্ছে”। বিবাহ আরম্ভ না হইতেই মুখে মুখে এই খবর রটিয়া বাড়ীর চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল—তাহা দেখিয়া ছাতের উপরে সেই পাহারাদার ব্যস্তভাবে ডাক দিয়া উঠিল। আর কোথা যায়! তাহার গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র “কে আছিসরে, আমার মনিবকে মেরে ফেল্লেরে” বলিয়া নাপিত “হায় হায়” শব্দে

আপনার চুলদাড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার বিকট আৰ্ত্তনাদে চারিদিকে এমন হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে স্বয়ং কাজি সাহেব পর্য্যন্ত গোলমাল শুনিয়া বাড়ী ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই বলে ব্যাপার কি? নাপিত বলিল "আর ব্যাপার কি! ঐ লক্ষ্মীছাড়া কাজি নিশ্চয়ই আমার মনিবকে মেরে ফেলেছে"। তখন মার মার করিয়া সকলে কাজির বাড়ীতে ঢুকিল। বর বেচারা পলাইবার পথ না পাইয়া ভয়ে ও লজ্জায় একটা সিন্ধুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, নাপিত সেই হাজার লোকের মাঝখানে সিন্ধুকের ভিতর হইতে "এই যে আমাদের মনিব" বলিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। সে বেচারা এই অপমানে লজ্জিত হইয়া যতই সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে যায়, নাপিত ততই তাহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকে আর বলে "আরে মশাই, পালান কেন? কাজি সাহেবকে ভয় কিসের? আরে মশাই, থামুন না"। ব্যাপার দেখিয়া চারিদিকে লোকজন হাসাহাসি ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিল। কাজির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়া, বিবাহ ত হইল না, মাঝে হইতে প্রাণপণে দৌড়াইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া বরের একটা ঠ্যাং খোঁড়া হইয়া গেল। এখানেও তাহার দুর্দ্দশার শেষ নয়, নাপিতটা সহরের হাটে বাজারে সর্ব্বত্র বাহাদুরি করিয়া বলিতে লাগিল "দেখেছ? ওকে কিরকম বাঁচিয়ে দিলাম! সেদিন আমি না থাক্‌লে কি কাণ্ডই না হ'ত। কাজি সাহেব যেরকম খ্যাপা মেজাজের লোক, কখন কি ক'রে বস্‌ত, কে জানে! যাহোক্‌, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি"। যে আসে তাহার কাছেই সে এই গল্প জুড়িয়া দেয়।

ক্রমে ছোকরাটির অবস্থা এমন হইল যে সে কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে পারে না—যাহার সঙ্গে দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে "ভাই, কাজির বাড়ীতে তোমার কি হয়েছিল? শুনলাম ঐ নাপিত না থাকলে তুমি নাকি ভারি বিপদে পড়্‌তে"? শেষটায় একদিন অন্ধকার রাত্রে বেচারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া বাঁগদাদ সহর হইতে পালাইল, এবং যাইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, "এমন দূর দেশে পলাইব, যেখানে ঐ হতভাগা নাপিতের মুখ দেখিবার আর কোন সম্ভাবনা না থাকে।"

আকাশ আলেয়া

মানুষের বুদ্ধিতে আজ পর্য্যন্ত কত অসংখ্য রকমের আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাঠেঘষা আগুন থেকে সুরু ক'রে আজকালকার বিদ্যুতের আলো পর্য্যন্ত যা কিছু হ'য়েছে তার নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড তালিকা হয়ে পড়ে। সেই কত রকমের তেলের প্রদীপ, কত শত চর্ব্বিবাতি মোমের বাতি, কত অসংখ্য গ্যাসের আলো বিদ্যুতের আলো, তার হিসাব রাখে কে! মানুষের তৈরী জিনিসে কাজ চলে ভাল, তাতে আর সন্দেহ নাই। রোদের আলো আর চাঁদের আলো আর প্রকৃতির নানা খেয়ালের নানা রকমের আলো, কেবল এই নিয়ে আজকালকার নিতান্ত অসভ্য মানুষেরও জীবন চলে না। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, এই প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যত রকমের আলো দেখি, মানুষের তৈরী এই সব আলো তারই অতি সামান্য নকল মাত্র! সূর্য্যের কথা ছেড়েই দিলাম, আকাশের মেঘে যে বিদ্যুতের আলো চমকায়, তার সঙ্গে মানুষের কোন্ "ইলেকট্রিক্ লাইটের" তুলনা হয়? সামান্য জোনাকিপোকার গায়ে যে আলো জ্বলে, যাতে গরম হয় না অথচ আলো হয়, মানুষ তার নকলে 'ঠাণ্ডা আলো' জ্বালাবার জন্য কত চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেরে ওঠেনি। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের কিরণ-মুকুট হ'তে যে অদ্ভুত আলো বেরোয়, তার গম্ভীর শোভায় পশু পাখী পর্য্যন্ত ভয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়; মানুষের মাথায় সে রকম আলোর কল্পনাও আসে না।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সব চাইতে অদ্ভুত আর সব চাইতে সুন্দর যে আলো, সে হ'চ্ছে মেরু দেশের 'আকাশ আলেয়া' বা 'মেরুজ্যোতি'। তাকে দেখতে হ'লে উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে মেরুর প্রদেশে যেতে হয়। সেখানে শীতকালের রাত্রে মেরুর চারিদিকে কয়েকশত মাইল দূর পর্য্যন্ত আলোর অতি চমৎকার খেলা চলতে থাকে। শুধু এই আলো দেখবার জন্যই প্রতি বৎসর কত দূরদেশের কত শত যাত্রী নরওয়ের উত্তরে দুরন্ত শীতের মধ্যে বেড়াতে যায়।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এদের আলো কেমন স্থির। তারা গুলো অনেক সময়ে মিট্ মিট্ করে বটে, কিন্তু এলোমেলো ভাবে কেউ ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়ায় না। কিন্তু 'আকাশ আলেয়া' বাস্তবিক ঐ সুদূর আকাশের জিনিষ নয়, তার জন্মস্থান এই পৃথিবীর বাতাসেরই চূড়ার উপরে। বাতাস সেখানে অসম্ভব রকম হাল্কা, তার উপরে সূর্য্যের বিদ্যুৎকিরণ প'ড়ে তাকে চঞ্চল ক'রে 'আকাশ আলেয়া'র সৃষ্টি

করে—সুতরাং 'আকাশ আলেয়া'র চালচলনটাও কিছু অস্থির রকমের। কিন্তু অস্থির বল্‌তে একেবারে বিদ্যুতের মত দুরন্ত কিছু একটা মনে ক'রো না। তার অস্থিরতা শ্রাবণের তুফান হাওয়ার মত নয়, বসন্তের ঝির্‌ঝিরে বাতাসের মত।
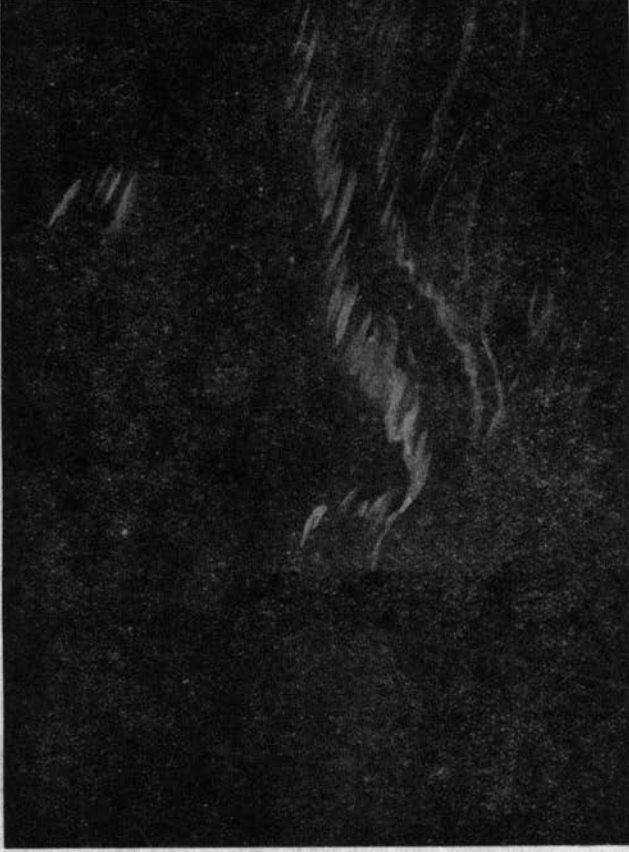
আকাশ আলেয়ার রং রামধনুর চাইতেও সুন্দর, কারণ সেটা সত্যিকার আলোকশিখা; আলোকটা তার নিজেরই আলো—আর রামধনুর আলো সূর্য্যের আলোর ধার-করা ছায়া মাত্র। তা ছাড়া অন্ধকার আকাশের কালো জমীর উপরে রঙের খেলা যেমন খোলে, দিনের বেলায় মেঘের গায়ে তেমন ক'রে খুলতেই পারে না। অতি সুন্দর অতি স্নিগ্ধ হাল্কা নীল লাল সবুজ রঙের শিখার মত এই আলো আকাশ জুড়ে খেলা করে। কখন উপরে ওঠে, কখন নীচে নামে, কখন মিনিটে মিনিটে বহুরূপীর মত রং বদলায়, কখন রঙীন পর্দ্দার মত দুল্‌তে থাকে, কখন ঘূর্ণার পাকের মত ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, কখন ধূমকেতুর ল্যাজের মত আকাশের গায় খাড়া থাকে, আবার কখন আল্‌গা হ'য়ে টুকরো হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এক এক সময়, বিশেষত শীতের রাতে,

এই আলোর খেলা এমন সুন্দর হয় যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার তামাসা দেখেও ক্লান্তিবোধ হয় না।

এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের গোলা—সেই চুম্বকের এক মাথা উত্তরে আর এক মাথা দক্ষিণে, মেরুর কাছে। আর সূর্য্যটা যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎশক্তির কুণ্ড—তার মধ্যে থেকে নানারকম আলো, আর বিদ্যুতের তেজ, আকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ; তার খানিকটা আমরা দেখি, আর অনেকটাই হয়ত দেখি না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূর্য্যের বিদ্যুৎ-ছটা আর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি আর এই আলেয়ার আলো, এই তিনটার মধ্যে ভিতরে ভিতরে খুব একটা সম্পর্ক দেখা যায়। সূর্য্যটা কেবল যে পৃথিবীকে আলো দেয় আর গরম রাখে তা নয়, সে নানারকম অদৃশ্য তেজে পৃথিবীকে ভিতরে বাইরে সব সময়েই নানা রকমে চঞ্চল ক'রে রাখ্ছে। সূর্য্যের গায়ে যখন ঘূর্ণীর মত দাগ দেখা যায় তখন পৃথিবীতেও চুম্বকের দৌরাত্ম্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রগুলো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—আর মেরুর আকাশে যেখানে পৃথিবীর এই চুম্বকের মাথা, সেখানে এই আলেয়ার আলো আরো দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন বাহার দেখিয়ে খেলা কর্‌তে থাকে! এগার বছর পর পর সূর্য্যের মধ্যে ঘূর্ণীঝড়ের এক একটা বড় বড় উৎপাত দেখা যায়—ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীতেও চুম্বকের উপদ্রব আর আকাশ আলেয়ার বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

তোমরা জান, পাম্প দিয়ে ফুট্‌বলে বাতাস পোরা যায়—কিন্তু এক রকম উল্টা 'পাম্প' আছে তা দিয়ে বাতাস খালি ক'রে ফেলে। পণ্ডিতেরা এই রকমে বোতলের মধ্যে থেকে বাতাস বে'র ক'রে, সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে আকাশ আলেয়ার নকল কর্‌তে পেরেছেন। কিন্তু একটা বোতলের মধ্যে আলোর তামাসা আর খোলা আকাশের প্রকাণ্ড শরীরে আলোর খেয়ালখেলা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

নন্দলালের মন্দ কপাল

নন্দলালের ভারি রাগ, অঙ্কের পরীক্ষায় মাষ্টার তাহাকে 'গোল্লা' দিয়াছেন। অবশ্য, সে যে খুব ভাল লিখিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তা বলিয়া একেবারে গোল্লা দেওয়া কি উচিত ছিল? হাজার হো'ক সে একখানা পূরা খাতা লিখিয়াছিল ত! তার পরিশ্রমের কি কোন মূল্য নাই? ঐ যে ত্রৈরাশিকের অঙ্কটা সেটা ত তার প্রায় ঠিকই হইয়াছিল,

কেবল একটুখানি হিসাবের ভুল হওয়াতে উত্তরটা ঠিক মেলে নাই। আর ঐ যে একটা Decimalএর অঙ্ক ছিল সেটাতে গুণ করিতে গিয়া সে ভাগ করিয়া বসিয়াছিল, তাই বলিয়া কি একটা নম্বরও দিতে নাই? আরও অন্যায় এই যে, এই কথাটা মাষ্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের কাছে ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছেন। কেন? আরেকবার হরিদাস যখন গোল্লা পাইয়াছিল, তখন ত সে কথাটা রাষ্ট্র হয় নাই! এ ভারি অন্যায়।

কেহ কেহ বলিল "নন্দলাল চটো কেন? গোল্লা পাইয়াছ, তার জন্য কোথায় লজ্জিত হওয়া উচিত, না তুমি খামখা রাগিয়াই অস্থির"! নন্দলাল রাগিয়া আগুণ হইল। কি! এতবড় কথা! সে যে ইতিহাসে একশ'র মধ্যে পঁচাশি পাইয়াছে, সেটা বুঝি কিছু নয়? খালি অঙ্কে ভাল পারে নাই বলিয়াই তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে? সব বিষয়েই যে সকলকে ভাল পারিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? স্বয়ং নেপোলিয়ান যে ছেলেবেলায় ব্যাকরণে একেবারে আনাড়ি ছিলেন, সে বেলা কি? তাহার এই যুক্তিতে ছেলেরা দমিল না, এবং মাষ্টারদের কাছে এই তর্কটা তোলাতে তাঁহারাও যে যুক্তিটাকে খুব চমৎকার ভাবিলেন, এমন ত বোধ হইল না। তখন, নন্দলাল বলিল, তাহার কপালই মন্দ—সে নাকি বরাবর তাহা দেখিয়া আসিতেছে।

সেইত যেবার ছুটির আগে তাহাদের পাড়ায় হাম দেখা দিয়াছিল, তখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই হামে ভুগিয়া দিব্যি মজা করিয়া স্কুল কামাই করিল, কেবল বেচারা নন্দলালকেই নিয়মমত প্রতিদিন স্কুলে হাজিরা দিতে হইয়াছিল। তারপর যেমন ছুটি আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকেও জ্বরে আর হামে ধরিল—সমস্ত ছুটিটাই মাটি! সেই যেবার সে মামার বাড়ী গিয়াছিল, সেবার তাহার মামাতো ভাইয়েরা কেহ বাড়ী ছিল না—ছিলেন কোথাকার এক বদ্‌মেজাজী মেশো, তিনি উঠিতে বসিতে কেবল ধমক আর শাসন ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তার উপর সেবার এমন বৃষ্টি হইয়াছিল যে একদিনও ভাল করিয়া খেলা জমিল না, কোথাও বেড়ান গেল না। সেই জন্য পরের বছর যখন আর সকলে মামার বাড়ী গেল, তখন সে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। পরে শুনিল সেবার নাকি সেখানে চমৎকার মেলা বসিয়াছিল, কোন্ রাজার দলের সঙ্গে পঁচিশটা হাতী আসিয়াছিল, আর বাজি যা পোড়ান হইয়াছিল সে একেবারে আশ্চর্য্য রকম! নন্দলালের ছোট ভাই যখন বারবার উৎসাহ করিয়া তাহার কাছে এই সকলের বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন নন্দ তাহাকে এক চড় মারিয়া বলিল "যা যা! মেলা বক্ বক্ করিস্‌নে!" তাহার কেবল

মনে হইতে লাগিল, সেবার সে মামারবাড়ী গিয়াও ঠকিল এবার না গিয়াও ঠকিল! তাহার মত কপাল-মন্দ আর কেহ নাই।

স্কুলেও ঠিক তাই। সে অঙ্ক পারে না—অথচ অঙ্কের জন্য দুই দুইটা প্রাইজ্ আছে—এদিকে ভূগোল ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ কিন্তু ঐ দুইটার একটাতেও 'প্রাইজ্' নাই। অবশ্য সংস্কৃতেও সে নেহাৎ কাঁচা নয়, ধাতুপ্রত্যয় বিভক্তি সব চট্‌পট্ মুখস্থ করিয়া ফেলে—চেষ্টা করিলে সে কি পড়ার বই আর অর্থপুস্তকটাকে সড়গড় করিতে পারে না? ক্ষুদিরাম পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে সেই যা একটু সংস্কৃত জানে—কিন্তু তাহাত বেশী নয়। নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে হারাইতে পারে না? নন্দ জেদ্ করিয়া স্থির করিল, "একবার ক্ষুদিরামকে দেখে নেব। ছোকরা এ বছর সংস্কৃতের প্রাইজ্ পেয়ে ভারি দেমাক কর্‌ছে—আবার অঙ্কের গোল্লার জন্য আমাকে খোঁটা দিতে এসেছিল। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।"

নন্দলাল কাহাকেও না জানাইয়া সেইদিন হইতেই বাড়ীতে ভয়ানকভাবে পড়িতে সুরু করিল। ভোরে উঠিয়াই সে 'হসতি হসত হসন্তি' সুরু করে, রাত্রেও "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু" বলিয়া ঢুলিতে থাকে। কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা একথার বিন্দুবিসর্গও জানে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন ক্লাসে প্রশ্ন করেন, তখন মাঝে মাঝে উত্তর জানিয়াও সে চুপ করিয়া মাথা চুলকাইতে থাকে—এমন কি কখন ইচ্ছা করিয়া দু একটা ভুল বলে—পাছে ক্ষুদিরাম তার পড়ার খবর টের পাইয়া আরও বেশী করিয়া পড়ায় মন দিতে থাকে। তাহার ভুল উত্তর শুনিয়া ক্ষুদিরাম মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, নন্দলাল তাহার কোন জবাব দেয় না; কেবল ক্ষুদিরাম নিজে যখন এক একটা ভুল করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, আর ভাবে, "পরীক্ষার সময় অমনি ভুল করলেই বাছাধন গেছেন! তাহ'লে এবার আর ওঁকে সংস্কৃতের প্রাইজ পেতে হবে না।"

ওদিকে ইতিহাসের ক্লাসে নন্দলালের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। কারণ, ইতিহাস আর ভূগোল নাকি এক রকম করিয়া শিখিলেই পাশ করা যায়—তাহার জন্য নন্দর কোন ভাবনা নাই; তার সমস্ত মনটা রহিয়াছে ঐ সংস্কৃত পড়ার উপরে—অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রাইজটার উপরে! একদিন মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "কি হে নন্দলাল, আজকাল বাড়ীতে কিছু পড়াশুনা কর না নাকি? তা না হ'লে সব বিষয়েই যে তোমার এমন দুর্দ্দশা হ'চ্ছে তার অর্থ কি? বাড়ীতে কি পড় বল দেখি"! নন্দ আরেকটুঁ হইলেই বলিয়া ফেলিত "আজ্ঞে সংস্কৃত পড়ি"। কিন্তু কথাটাকে হঠাৎ সামলাইয়া "আজ্ঞে সংস্কৃত—

না সংস্কৃত নয়" বলিয়াই সে ভারি থতমত খাইয়া থামিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন "আজ্ঞে সংস্কৃত—না সংস্কৃত নয়—এর অর্থ কি?" ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "কৈ! সংস্কৃতও ত কিছু পারে না"। শুনিয়া ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হাসিতে লাগিল। নন্দ একটু অপ্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—ভাগ্যিস্ তাহার সংস্কৃত পড়ার কথাটা ফাঁস হইয়া যায় নাই!

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া আসিল—পরীক্ষার সময় প্রায় উপস্থিত। সকলে পড়ার কথা পরীক্ষার কথা আর প্রাইজের কথা বলাবলি করিতেছে—এমন সময় একজন ছোকরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! নন্দ এবার কোন্ প্রাইজটা নিচ্ছ?" ক্ষুদিরাম নন্দর মত গলা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে সংস্কৃত, না সংস্কৃত নয়।" সকলে হাসিল, নন্দও খুব হো হো করিয়া সেই হাসিতে যোগ দিল। মনে ভাবিল "বাছাধন, এ হাসি আর তোমার মুখে বেশীদিন থাক্‌ছে না।"

যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং যথাসময়ে শেষ হইল। পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ করিয়া আছে—নন্দও রোজ নোটিস্‌বোর্ডে গিয়া দেখে, তাহার নামে সংস্কৃত প্রাইজ পাওয়ার কোন বিজ্ঞাপন আছে কি না। তারপর একদিন হেডমাষ্টার মহাশয় একতাড়া কাগজ লইয়া ক্লাসে আসিলেন, আসিয়াই তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "এবার দুএকটা নূতন প্রাইজ হ'য়েছে আর অন্য অন্য বিষয়েও কোন কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে"। এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। ক্ষুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সেই ওই মেডেলটা পাইবে। সংস্কৃতে নন্দ প্রথম, ক্ষুদিরাম দ্বিতীয়—কিন্তু, এবার সংস্কৃতে কোন প্রাইজ নাই!—

হায় হায়! নন্দের অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া ক্ষুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। তাহার এত চেষ্টার ফল কিনা এই হইল! কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা সেত অনায়াসেই পাইতে পারিত। কিন্তু তাহার মনের কষ্ট কেহ বুঝিল না—সবাই বলিল "বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে—কেমন করে ফাঁকি দিয়ে নম্বর পেয়েছে"। নন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "কপাল মন্দ"!

নারদ ! নারদ !
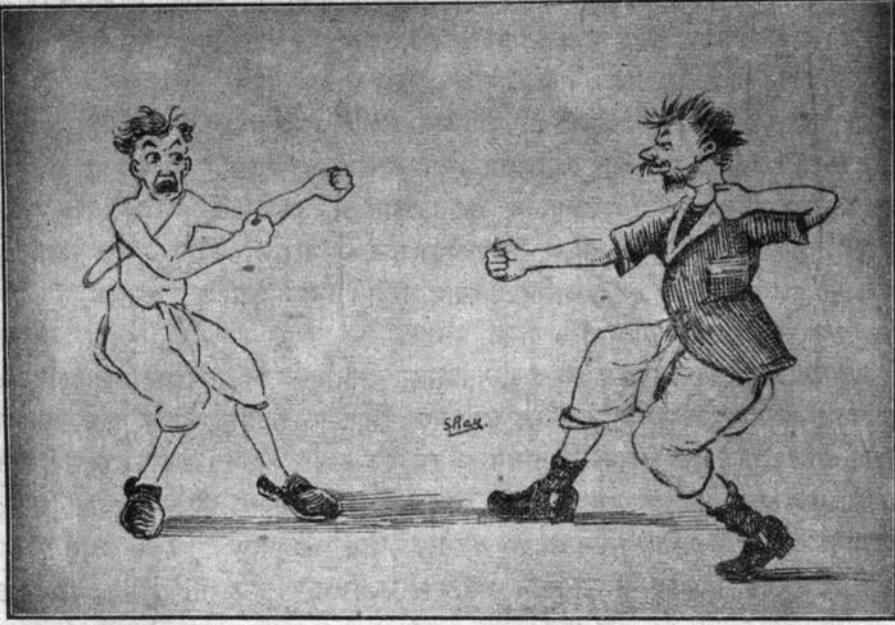
হ্যাঁরে হাঁরে ! তুই নাকি কাল
সাদাকে বল্‌ছিলি লাল ?
(আর) তুই ব্যাটা যে রাত্রি জুড়ে
নাক ডাকাতিস্‌ বিশ্রী সুরে ?
(আর) তোদের পোষা বেড়ালগুলো
শুন্‌ছি নাকি বেজায় হুলো !
(আর) এই যে শুন্‌ছি তোদের বাড়ী
কেউ নাকি রাখেনা দাড়ি !!
—ক্যান্‌রে ব্যাটা ইষ্টুপিট্‌ ?
ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট্‌ !

চোপ্‌রাও তুম্, স্পীক্‌টি নট্
মার্‌ব রগে পটাপ্পট্
(দেখ্) ফের যদি ট্যারাবি চোখ,
কিম্বা আবার করবি রোখ্,
কিম্বা যদি অম্‌নি ক'রে
মিথ্যেমিথ্যি চ্যাঁচাস্ জোরে,—
(তা) আই ডোণ্ট্ কেয়ার কাণাকড়ি
জানিস্ আমি স্যাণ্ডো করি ?
ফের লাফাচ্ছিস্ ? অল্‌রাইট !
কামেন্ ফাইট্ কামেন্ ফাইট্ !

ঘুঘু দেখ্‌ছ ফাঁদ দেখনি ?
টেরটা পাবি আজ এখনি।
আজকে যদি থাক্‌ত মামা
পিটিয়ে তোমায় কর্‌ত ঝামা।
আরে ! আরে ! মারবি নাকি ?
দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি।
হাঁ হাঁ হাঁ ! রাগ ক'রো না—
কর্‌তে চাও কি, তাই বলো না !
(আহা) চট্‌ছ কেন মিছি মিছি ?
আমি কি ভাই তাই বলিছি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাত বটেই
আমিত চটিনি মোটেই !
মাথা নেই তার মাথাব্যথা—
আমি বলছি অন্যকথা !
মিথ্যে কেন লড়্‌তে যাবি ?
ভেরি-ভেরি সরি ! মশলা খাবি ?

শেক্ হাণ্ড্ আর "দাদা" বল্
সব শোধ বোধ ঘরে চল্।
ডোণ্ট পরোয়ার অল্‌রাইট,
হাউ ডু য়ু ডু গুড্ নাইট।

কলম্বস্

৪০০ বৎসর আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সকলেই পূর্ব্বমুখে পারস্যের ভিতর দিয়া আসিত। তখন পণ্ডিতেরা সবে মাত্র পৃথিবীটাকে গোল বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ নামে ইটালী দেশীয় এক নাবিক ভাবিলেন, যদি সত্য সত্যই পৃথিবীটা গোল হয়, তবেত পূর্ব্ব মুখে না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গেলেও সেই ভারতবর্ষের কাছাকাছিই কোথাও পৌঁছান যাইবে। এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস এতদূর হইয়াছিল, যে তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস থাকিলেই হয় না—কলম্বস্ গরীব লোক, তিনি জাহাজ পাইবেন কোথা, লোকজন জোগাড় করিবেন কিসের ভরসায় ?

তিনি দেশে দেশে ধনীলোকেদের কাছে দরখাস্ত করিয়া ফিরিতে ফিরিতে পর্টুগালে আসিয়া হাজির হইলেন। ক্রমে তাঁহার মৎলবের কথা রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল—তিনি তাঁর মন্ত্রীদের উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, "এ লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তবে খামখা এই বিদেশীকে সাহায্য না করিয়া আমরাই একবার এ চেষ্টাটা করিয়া দেখিনা কেন"? তাহারা কলম্বসের কাছে তাঁহার হিসাবশুদ্ধ সমস্ত নক্সা চাহিয়া লইলেন, এবং গোপনে কয়েকজন পর্টুগীজ নাবিককে সেই পশ্চিমের পথে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই ঝড় তুফান আর কেবল অকূল সমুদ্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে ফিরিয়া আসিল। কলম্বস যখন জানিতে পারিলেন যে রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে এই ভাবে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তিনি সেদেশ ত্যাগ করিয়া স্পেন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সাত বৎসর রাজদরবারে দরখাস্ত বহিয়া, তারপর রাণী ইসাবেলার কৃপায় তিনি তাঁহার এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে, কলম্বস ভারতবর্ষের সন্ধানে যাত্রা করেন।

ক্রমাগত ৭০ দিন পশ্চিমমুখে চলিয়াও কলম্বস ডাঙ্গার সন্ধান পাইলেন না। ইহার মধ্যে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা কতবার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, কতবার তাহারা বাড়ী ফিরিবার জন্য জেদ্ করিয়াছে, সমুদ্রের কূল কিনারা না দেখিয়া কতজনে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়াছে—এমন কি কলম্বসকে মারিয়া ফেলিবার জন্যও তাহারা কতবার ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু কলম্বস অটল প্রশান্তভাবে সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন, "ভয় নাই! আরেকটু ভরসা করিয়া চল, সমুদ্রের শেষ পাইবে"। ৭১ দিনের দিন দূরে কূল দেখা দিল। তখন সকলের আনন্দ দেখে কে। পরদিন তাহারা নূতন দেশে এক অজানা দ্বীপে অজানা জাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তারপর কি আনন্দে সে দেশ হইতে নানা ধন রত্ন অলঙ্কারে জাহাজ ভরিয়া সে-দেশী লোক সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সেই সংবাদ দিবার জন্য দেশে ফিরিলেন। তখন দেশে কলম্বসের সম্মান দেখেকে! কলম্বস্ ভাবিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষের কাছে কোন দ্বীপে আসিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যেখানে গিয়াছিলেন সেটা আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ইহার পর তিনি আরও দুবার পশ্চিমে যান, এবং শেষের বার আমেরিকা পঁহুছিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই ভুলের জন্যই এখনও আমেরিকার লোকেদের "ইণ্ডিয়ান" বলা হয়—আর ম্যাপে ঐ দ্বীপ গুলার নাম লেখা হয় পশ্চিম ইণ্ডিজ্ (West Indies)!

দুঃখের বিষয়, শেষ জীবনে কলম্বসের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, তাহারা রাজার কাছে সত্য মিথ্যা কোন রকম নালিশ করিয়া রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

রাজা কলম্বস্‌কে সভায় হাজির করিবার জন্য লোক পাঠান—তখন কলম্বস ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। রাজার লোক কলম্বসের হাতে শিকল বাঁধিয়া তাঁহাকে জাহাজে কয়েদ করিয়া রাজার কাছে চালান দিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজার মনে কি দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কলম্বস এ অপমানের কথা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যেই এই কীর্ত্তিমান পুরুষের জীবন শেষ হইল।

শ্রাবণ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর।

১। পিচকারী। ২। আরাম। ৩। সোডার বোতল।
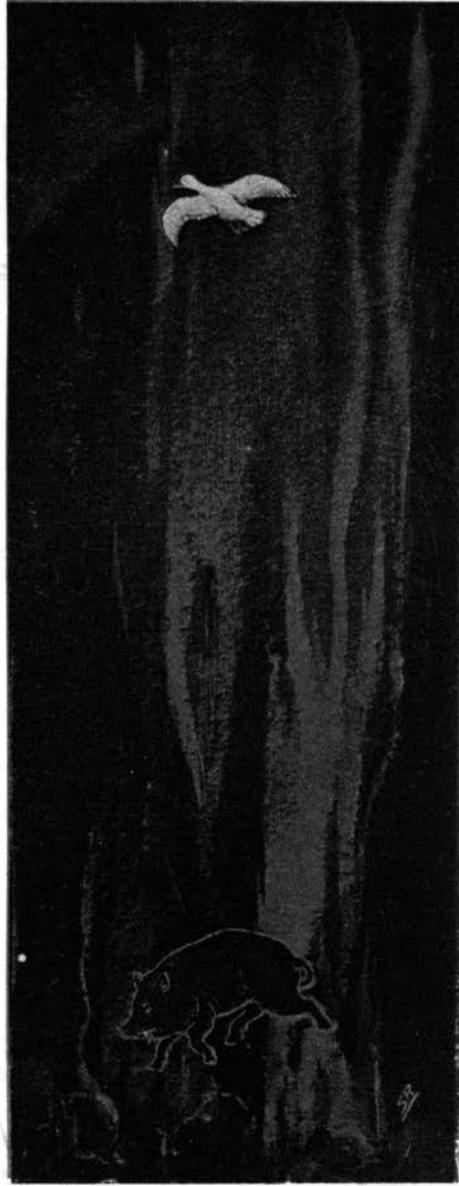
বরাহরূপী বিষ্ণু ও হংসরূপী ব্রহ্মা অনল স্তম্ভের মূলের সন্ধানে চলিয়াছেন।

(১৯৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩২৪ সপ্তম সংখ্যা

"সুবোধ ছেলে নই"

নই গো আমি সুবোধ ছেলে, সুবোধ ছেলে নই,
রই না হাতে দিনে রাতে কেবল নিয়ে বই!
তাইতে 'গোপাল', 'ডুবাল' ব'লে
রবে না নাম এ ধরাতলে!
রাখাল দলে, মোড়ল বলে তাদের সাথে রই,
নই গো আমি সুবোধ ছেলে, সুবোধ ছেলে নই!

নিইনে আমি নুইয়ে মাথা, যা পড়ে মোর পাতে
চড়টি পেলে, চাপড়টি যে দিই গো সাথে সাথে,
ভালো জানি বাইতে ভেলা,
চড়তে গাছে, মারতে ঢেলা;
ডর করি না গাঁয়ের পথে যেতে আঁধার রাতে
আপন জনে, ঠেক্‌লে দায়ে তরাই হাতে হাতে!

ধমক দিয়ে করবে কাবু, নই গো তেমন ছেলে,
মিষ্টি কথার হুকুম মানি সকল কাজ ফেলে,
কাঙাল জনে নাকাল হলে,
চুপটি করে যাইনে চলে,
পিছপা নই দণ্ড ভয়ে, দণ্ড দিতে গেলে,
ধমক্ দিয়ে করবে কাবু, নই গো তেমন ছেলে!

মহৎ মনের শাসন মানি প্রণাম করি তাঁয়,
চরণ ধূলা মাথায় নিতে পরাণ সেধে যায়,
গুরু বলে তাঁরেই মানি,
শিরে ধরি আদেশ বাণী,
আশীষ পেলে ধন্য বলে জানি আপনায়,
আপন পরে বিচার ক'রে চলি না সেথায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কে বড়?

(শিবপুরাণ)

পূর্ব্বকালে এক সময়ে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গরুড় প্রভৃতি অনুচরগণ সকলেই উপস্থিত—এমন সময় পিতামহ ব্রহ্মা সেখানে আসিলেন। বিষ্ণু শুইয়াই রহিলেন, ব্রহ্মাকে দেখিয়া উঠিলেন না। ইহাতে ব্রহ্মার বড় রাগ হইল এবং তিনি বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি জগতের পিতামহ, তোমারও প্রভু। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তুমি অভ্যর্থনা করিলে না—তুমি ত ভারি অভদ্র?" ব্রহ্মার কথায় বিষ্ণুর রাগ হইলেও রাগ চাপিয়া শান্ত ভাবে উত্তর করিলেন—"বৎস! আইস, আমার সিংহাসনে উপবেশন কর। তুমি মিছামিছি রাগ করিতেছ কেন? আমার ত কোন অপরাধ হয় নাই? তুমি আমার নাভি হইতে জন্মিয়াছ—সুতরাং তুমি আমার পুত্র। অতএব আমিই তোমার গুরু। 'তুমি আমার প্রভু'—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" তখন এই প্রভুত্ব লইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর মধ্যে ভীষণ বিবাদ বাধিয়া গেল এবং ক্রমে দুইজনে নিজ নিজ বাহন হাঁস ও গরুড়ে চড়িয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার সহায় ব্রাহ্মণগণ আর বিষ্ণুর সহায় হইলেন বৈষ্ণবগণ। অপর দেবতাগণ কোন পক্ষে গেলেন না, তাঁহারা দূরে থাকিয়া, তামাসা দেখিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ামাত্র বিষ্ণু রাগিয়া ব্রহ্মার বুকে সাংঘাতিক কতকগুলি বাণ মারিলেন। সেই বাণ বিফল করিয়া ব্রহ্মাও বিষ্ণুর বুকে আঘাত করিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে দুইজনে ক্ষণকাল যুদ্ধ হইলে পর মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু ছাড়িলেন মাহেশ্বরাস্ত্র আর ব্রহ্মাও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন পাশুপতাস্ত্র। এই দুই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্র আকাশে উঠিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল! দেবতাগণ মহা ভীত হইয়া ভাবিলেন—"বুঝিবা প্রলয় কাল উপস্থিত! হায়! হায়! সৃষ্টি ধ্বংস হইল!" তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া দেবতাগণ কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন!

দেবতাদিগকে দেখিয়াই মহাদেব বলিলেন—"ব্রহ্মা-বিষ্ণুর যুদ্ধের কথা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া চল। আর আমিও যাইতেছি—দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণুকে শান্ত করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া মহাদেব পার্ব্বতী দেবী ও অনুচরগণের সহিত যুদ্ধস্থলে গিয়া গোপনে শূন্যে থাকিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

পাশুপতাস্ত্র ও মাহেশ্বরাস্ত্রের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইয়া সৃষ্টি পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দারুণ অকালপ্রলয় দেখিয়া মহাদেব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ এক মহা ভীষণ আগুনের স্তম্ভ হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যখানে উপস্থিত হইলেন। আগুনের মত উজ্জ্বল সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দুটি সেই অগ্নিস্তম্ভে পতিত হইয়া শান্ত হইল!

ব্রহ্মা বিষ্ণু এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাদের শত্রুতা দূর হইয়া গেল এবং তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"কি আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত অনলস্তম্ভ কোথা হইতে আসিল? ইহার আদি অন্ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না কেন? যাহা হউক, চল আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বিষ্ণু বরাহ রূপ ধরিয়া স্তম্ভের মূল দেখিবার জন্য মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাতালে প্রবেশ করিলেন। আর ব্রহ্মা হাঁসের রূপ ধরিয়া স্তম্ভের অন্ত দেখিবার জন্য আকাশে উড়িয়া চলিলেন।

এদিকে পাতাল ভেদ করিতে করিতে বিষ্ণু কত দূর যে গেলেন তাহার সীমা নাই কিন্তু তবুও স্তম্ভের মূল দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিরাশ হইয়া তিনি যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। হংসরূপী ব্রহ্মা আকাশে যাইতে যাইতে অনেক উপরে উঠিয়াও স্তম্ভের শেষ পাইলেন না। এমন সময় তিনি দেখিলেন—একটি কেতকী ফুল

চারিদিকে মধুর গন্ধ ছড়াইয়া আকাশ হইতে পড়িতেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —"কেতক! তুমি কোথা হইতে পড়িতেছ? কে তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন?" কেতক বলিল—"হে ব্রহ্মা! আমি এই অনলস্তম্ভের মধ্য হইতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া পড়িতেছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্তম্ভের আদি দেখিতে পারিলাম না। সুতরাং তুমি যে মনে করিয়াছ এই স্তম্ভের অন্ত দেখিবে—সে ইচ্ছা ছাড়।"

কেতকের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ—আমি হাঁসের রূপ ধরিয়া স্তম্ভের অন্ত দেখিতেই আসিয়াছি। যাহা হউক, এখন তোমাকে আমার একটি উপকার করিতে হইবে। বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিতে হইবে যে—'ব্রহ্মা স্তম্ভের অন্ত দেখিয়াছেন, আমি তাহার সাক্ষী আছি'।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অনেক অনুনয় বিনয় করিলে পর কেতক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধস্থলে গেল। সেখানে গিয়া ব্রহ্মা আনন্দে হাসিতে হাসিতে বিষণ্ণ বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি স্তম্ভের অন্ত দেখিয়াছি, এই কেতক তাহার সাক্ষী আছে।" ইহার পর কেতকীও যখন বলিল— "হাঁ! ব্রহ্মা যাহা বলিলেন তাহা সত্য"—তখন বিষ্ণু সে কথা বিশ্বাস করিলেন এবং বিধাতা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

ব্রহ্মার এই মিথ্যা ব্যবহারে মহাদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ স্তম্ভের ভিতর হইতে নিজের রূপে বাহির হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"বৎস! তুমি প্রভু হইবার ইচ্ছা করিয়াও সত্য কথা বলিয়াছ, সে জন্য আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে তীর্থে তীর্থে লোকে স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমার পূজা করিবে।"

তারপর ব্রহ্মাকে প্রবঞ্চনার সাজা দিবার জন্য মহাদেব 'ভৈরব' নামে এক ভয়ানক পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বলিলেন—"এই মিথ্যাবাদী ব্রহ্মাকে খড়গ দ্বারা উপযুক্ত সাজা দাও।" মহাদেবের হুকুম পাইবামাত্র ভৈরব পঞ্চমুখ ব্রহ্মার মিথ্যাভাষী পঞ্চম মাথাটি কাটিয়া ফেলিল। তারপর সে, অপর মাথাগুলিও কাটিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু মিষ্ট কথায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া বলিলেন—"আপনিই ইঁহাকে পাঁচটি মাথা দিয়া বিধাতা করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এখন অনুগ্রহ করিয়া ইঁহার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব ভৈরবকে ক্ষান্ত করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—"তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া প্রভুত্ব পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সুতরাং আজ হইতে জগতে তোমার পূজা হইবে না।" কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মা পিতামহ—এত বড় দেবতা! আর লোকে তাঁর পূজা করিবে না? তিনি তখনই যোড়হাতে মহাদেবের স্তুতি মিনতি করিতে লাগিলেন।

তখন মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা! তোমার পূজা না হইলেও আজ হইতে তুমি সমুদায় যজ্ঞের গুরু হইবে। তোমা ভিন্ন কোন যজ্ঞই পূর্ণ এবং সফল হইবে না।"

ইহার পর মহাদেব প্রবঞ্চক কেতককে শাপ দিলেন—"ওরে মিথ্যাবাদি! তোর স্বভাব অতি জঘন্য—আমার সম্মুখ হইতে তুই দূর হ। আজ হইতে তোর ফুলে আর আমার পূজা হইবে না।"

কেতক তখন অনেক স্তুতি করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর তিনি বলিলেন—"কেতক! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, সে জন্য আমি কিছুতেই আর তোমাকে ধারণ করিতে পারি না। যাহা হউক, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ তোমাকে ধারণ করিবেন।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কিউপিড্ ও সাইকি

এক রাজার ভারী সুন্দরী তিনটি মেয়ে ছিল। তার মধ্যে ছোট রাজকুমারী "সাইকি" নাকি ছিলেন ভিনাসের চাইতেও সুন্দরী! ভিনাস্ হলেন দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। এখন ভিনাসের চাইতেও সুন্দরী হইলে সে রূপ নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে? বাস্তবিকও তাই—সাইকি বেড়াইতে বাহির হইলে লোকে অবাক্ হইয়া তাহাকে নমস্কার করে, তাহার পথে ফুল ছিটাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, সাইকিকে দেখিবার জন্য বহুদূর দেশ হইতে কত লোক আসে আর তাহার সৌন্দর্য্যের পূজা করে। ইহাতে ভিনাস্ বড়ই চটিয়া তাঁহার পুত্র প্রেমের দেবতা কিউপিড্কে লইয়া রাজার বাড়ী গেলেন। সাইকি তখন ঘুমাইতেছিল। তাহাকে দেখাইয়া ভিনাস্ পুত্র কিউপিড্কে বলিলেন—"লোকে এখন আমাকে ছাড়িয়া এই মেয়েটার রূপের পূজা করে—তুমি আমার এই অপমানের প্রতিশোধ লও। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিৎ যে, তার জন্য সাইকির মনে ভালবাসা জন্মাইয়া দাও।"

ঘুমন্ত সাইকিকে দেখিয়া কিউপিড্ ভাবিলেন—"এমন সুন্দরী মেয়ের যদি অনিষ্ট করি তবে যেন আমার সর্ব্বনাশ হয়!" ইহার পর মাতা ও পুত্র রাজবাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরে সাইকির বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে রাজা পাত্রের জন্য মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রীরা বলিলেন—"মহারাজ! আপলো দেবের মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া পাত্রের জন্য প্রার্থনা করুন, ঠাকুর পাত্রের সন্ধান বলিয়া দিবেন।" রাজা তাহাই করিলেন। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! পূজার পর দৈববাণী হইল—

"রাজকুমারীকে বিবাহের সাজে রাজবাড়ীর নিকটস্থ উঁচু পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও। সেখানে এক বিকটাকার রাক্ষস থাকে—তাহার সহিতই রাজকুমারীর বিবাহ হইবে।"

রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এই দারুণ দুঃখের সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে এই দুঃসংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। সহরবাসী নরনারীর দুঃখের সীমা রহিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজকুমারী সাইকিকে সাজাইয়া সেই পাহাড়ের উপর রাখিয়া আসা হইল। বেচারি সাইকি কত যে কাঁদিল, কত যে হাতযোড় করিয়া মিনতি করিল, কিন্তু দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য। তাহাকে রাখিয়া সকলে চলিয়া আসিলেন। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজকুমারী ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজকুমারী অনেকক্ষণ ঘুমাইলে পর সেখানে কিউপিড্ আসিয়া উপস্থিত! সাইকিকে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। এবং তিনি রাত্রিতে তাঁহার ভৃত্য জেফিরকে সেই পাহাড়ে পাঠাইলেন। জেফির ঘুমন্ত সাইকিকে বহু দূরে এক নির্জ্জন প্রাসাদে নিয়া রাখিয়া দিল।

ক্রমে সাইকির ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—একটি সুন্দর ঘরে নরম রেশমের গদি দেওয়া বিছানায় তিনি শুইয়া আছেন! বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন প্রাসাদের নীচেই সুন্দর বাগান!

রাজকুমারী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"একি! আমি কোথায় আসিয়াছি?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসিল—"রাজকুমারি! আপনি আপনার অট্টালিকায় আছেন। যত কিছু দেখিতেছেন সবই আপনার। যাহা ইচ্ছা হুকুম্ করুন—আমরা আপনার সহচরী, তখনই তাহা পালন করিব।"

রাজকুমারী খাদ্য চাহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য সহচরীগণ তাঁহার সম্মুখে নানা রকম সুমিষ্ট খাবার আনিয়া রাখিল। সাইকির অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, তিনি পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। আহারের পর বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে সন্ধ্যা হইলে সাইকি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রে কে জানি অতি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিল—"সাইকি! আমি তোমার জন্য এই প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি পরমসুখে এখানে বাস কর।" কি মিষ্টি স্বর! কি মধুর কথা! প্রতিদিন রাত্রে এই অদৃশ্য বাণী আসিয়া রাজকুমারীকে কত আদর করে, কত ভালবাসার কথা বলিয়া তাঁহার মন ভুলাইয়া দেয়! তাহাকে তিনি দেখিতে পান না বটে, কিন্তু তাহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রাজকুমারী তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

তখন সেই অদৃশ্য লোক বলিল—"সাইকি! তোমাকে সুখী করিবার জন্য যাহা দরকার সবই আমি করিব। কিন্তু সাবধান! কখন আমার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিও না। যদি কর তোমার সর্ব্বনাশ হইবে এবং আমাকে চিরকালের জন্য হারাইবে।"

অবশ্য অদৃশ্য স্বামীকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া সাইকির মনে কষ্ট হইল, কিন্তু তবু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে স্বামীর হুকুম মানিয়া চলিবেন। প্রতিদিন রাত্রে গভীর অন্ধকার হইলে স্বামী আসেন আর প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যান। সুতরাং সমস্ত দিনটা রাজকুমারীর বড় একা একা মনে হয়। একদিন রাত্রে তিনি বড় অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীকে বলিলেন—"দিনের বেলা একা থাকিতে বড় কষ্ট হয়, আমার বড় বোন দুটিকে এখানে আনিয়া দাও।"

পরদিন প্রাতঃকালে হাওয়ার মত সোঁ সোঁ শব্দে তাঁহার বোন্ দুটিকে লইয়া হঠাৎ জেফির আসিয়া উপস্থিত! বোন্ দুটি মনে করিতেন যে সাইকি আর এ জগতে নাই। এখন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা রহিল না।

রাজকুমারীরা প্রাসাদময় ঘুরিয়া দেখিলেন সাইকির সুখ সৌভাগ্যের নিকট তাঁহাদের সুখ অতি তুচ্ছ। ক্রমে তাঁহাদের মনে হিংসা হইল এবং একদিন বড় রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাইকি! তোমার এমন সুন্দর বাড়ী, এমন সুন্দর বাগান, এত ধন রত্ন—তোমার ত সৌভাগ্যের সীমাই নাই। কিন্তু এ বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়? তোমার স্বামীকে কি আমরা দেখিতে পাইব না?" তখন বাধ্য হইয়া সাইকিকে স্বীকার করিতে হইল যে তিনি নিজেও কখন স্বামীর মুখ দেখেন নাই—স্বামী প্রতি রাত্রে অন্ধকারে আসেন এবং অন্ধকার থাকিতেই চলিয়া যান।

এ কথা শুনিয়া হিংসুটে বড় বোনটি বলিলেন—"ইহার অর্থত সহজেই বুঝা যায়। দৈববাণী ত বলিয়াই ছিল যে বিকট রাক্ষসের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। এখন বুঝিতেই পার তোমার স্বামী কেন তোমাকে মুখ দেখান না।"

ইহার কিছু দিন পরে জেফির রাজকুমারী দুইজনকে তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই কথা সাইকির মনে এমনই লাগিয়াছিল যে তিনি সেই দিন রাত্রে স্বামী ঘুমাইলে পর মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটা আলো জ্বালিলেন। আলো জ্বালিয়া তিনি দেখিলেন বিকট রাক্ষস নয়—দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্বয়ং কিউপিড্ ঘুমাইয়া আছেন! সাইকির আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু হায়! তাড়াতাড়িতে হঠাৎ এক ফোঁটা গরম তেল কিউপিডের কাঁধে পড়িয়া গেল আর

তৎক্ষণাৎ তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন। "হায়! হায়! মায়ের হুকুম অমান্য করিলাম, রাক্ষসেরসঙ্গে তোমার বিবাহ না দিয়া নিজে তোমাকে বিবাহ করিলাম—আর তুমি তাহার এই প্রতিদান দিলে? তিনি এই বলিতে বলিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কিউপিড্ চলিয়া গেলে পর সাইকি দুঃখ ও যাতনায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তারপর স্থির করিলেন যে স্বামীকে পৃথিবীময় খুঁজিয়া বেড়াইবেন এবং তাঁহার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইবেন না।

এ দিকে পুত্রের প্রবঞ্চনার কথা জানিতে পারিয়া ভিনাস্ তাঁহাকে কারাগারে বন্ধ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সাইকিকে খুঁজিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাইলেন। সাইকি স্বামীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এমন সময় ভিনাসের লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া নানা রকমে কষ্ট দিতে দিতে ভিনাসের সভায় লইয়া গেল। সাইকিকে দেখিয়াই

ভিনাস্ বলিয়া উঠিলেন—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা? ইহার সাজা কি করিয়া দিতে হয় আমিও তাহা জানি।

ভিনাসের হুকুমে সাইকি কারাগারে বন্ধ হইলেন। সেখানে তাঁহার যাতনার সীমা রহিল না। প্রতি দিন অতি নীচ এবং কঠিন নূতন নূতন কাজের হুকুম আসিতে লাগিল। আবার তাহা না করিতে পারিলে আরও কঠিন শাস্তি! কিন্তু সাইকি এমনই সুন্দর ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবটি এতই মিষ্ট ছিল যে সকলেই তাহাকে সাহায্য করিত এবং কোনি না কোন উপায়ে অতিশয় কঠিন কাজগুলিও তিনি করিয়া ফেলিতেন।

তখন ভিনাস সাইকিকে কারাগার হইতে আনাইয়া তাঁহার হাতে একটা রূপার বাক্স দিয়া বলিলেন—"সাইকি! এই বাক্সটি লইয়া গিয়া পাতালের রাণী 'প্রসারপিন্‌কে' দাও। আর তাঁকে বল যে—ভিনাস্ বলিয়াছেন 'এই বাক্সটি সৌন্দর্য্য দিয়া ভরিয়া দাও'।"

এইবারে সাইকি নিরাশ হইলেন। এপর্য্যন্ত কোন লোক পাতালে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া প্রাসাদের খুব উঁচু একটা ঘরে গেলেন,—সেখান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু যখন লাফাইতে যাইবেন তখন তাঁহার দুঃখে প্রাসাদের পাথরগুলিরও দয়া হইল। তাহারা বলিল—"সুন্দরী সাইকি! আত্মহত্যা করিও না, তোমার কোন ভয় নাই। যে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা করা একেবারে অসম্ভব মনে করিও না। এখন এক কাজ কর—এখান হইতে খানিক দূরেই টিনেরাস্ নগর আছে, সেখানে গিয়া সন্ধান করিলেই পাতালে যাইবার পথ দেখিতে পাইবে। কিন্তু শূন্য হাতে পাতালে প্রবেশ করিও না। দুই হাতে দুইটি মিষ্টি পিঠা এবং মুখে করিয়া দুটি পয়সা নিও তবেই রাণী প্রসারপিনের কাছে যাইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান! আর যাহাই কর, পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে একটিও কথা বলিও না। যদি বল তবে এ জীবনে আর সূর্য্যের মুখ দেখিবে না।"

তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া সাইকি টিনেরাস্ সহরে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া পাতালে যাইবার অন্ধকার পথ বাহির করিলে পর খুব ভরসা করিয়া সে পথে চলিলেন। চলিতে চলিতে একটা নদীর নিকটে গিয়া উপস্থিত! নদীর জল কাল আর কাল রঙের একটা নৌকায় কাল কাপড় জড়াইয়া একজন মাঝি দাঁড়াইয়া আছে। সেই মাঝিকে একটি পয়সা দিলেন, সে নীরবে তাঁহাকে ওপারে লইয়া গেল।

নদী পার হইয়া সাইকি পুনরায় অন্ধকার পথে চলিয়া ক্রমে প্রসার্‌পিনের প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত! প্রাসাদের দরজায় একটা ভীষণ কুকুর প্রহরী, তার তিনটা মাথা—সাইকিকে দেখিয়াই কুকুরটা গর্জ্জন করিয়া আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু তাঁহার একটি মিষ্টি পিঠা খাইয়াই সে পথ ছাড়িয়া দিল—সাইকি ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদের একটা প্রকাণ্ড, ভীষণ অন্ধকার ঘরে কাল সিংহাসনে প্রসার্‌পিন্ বসিয়া-ছিলেন। চারিদিকে কেবলই অন্ধকার, সমস্ত বাড়ীটাই যেন নীরব নিস্তব্ধ। সাইকির মাথা ঘুরিয়া গেল; ভয়ে তিনি মাটিতে পড়িয়াই যাইতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অদৃশ্য কিউপিডের বাণী শুনিতে পাইলেন—"সাইকি! ভয় নাই—তোমার মঙ্গল হইবে।" স্বামীর এই কথা শুনিয়া সাইকির মনে বল হইল; তিনি সিংহাসনের নিকটে গিয়া পাতালের রাণীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

তখন অত্যন্ত দুঃখের স্বরে রাণী বলিলেন—"পৃথিবীর মানুষ পাতালের রাণীর বাড়ীতে—এত ভরসা তাহার কি করিয়া হইল?" পাথরের উপদেশ স্মরণ করিয়া সাইকি কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে সেই রূপার বাক্‌সটি তুলিয়া ধরিলেন। প্রসার্‌পিন্ বাক্‌সটি লইয়া তাহা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মুখ তুলিয়া চাহিতে সাইকির ভরসা হইল না সুতরাং প্রসার্‌পিন্ বাক্‌সে কি রাখিলেন তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

প্রসার্‌পিন্ বাক্‌স পূর্ণ করিয়া সাইকির হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"এখন বাক্‌স লইয়া প্রস্থান কর।" বাক্‌স লইয়া সাইকি সেই মুহূর্ত্তে ফিরিয়া চলিলেন। দরজায় সেই ভীষণ কুকুরটাকে বাকি পিঠাটা দিয়া পুনরায় শান্ত করিলে সে পথ ছাড়িয়া দিল। তারপর আসিলেন সেই কাল জলের নদীর ধারে। তখন সেই নীরব মাঝিটিও বাকি পয়সাটা পাইয়া তাঁহাকে পার করিয়া দিল। আর ভয় কি? সাইকি আহ্লাদে বাহিরে আবার সূর্য্যের মুখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!

কিন্তু হায়! বাহিরে আসিবামাত্র যখন তাঁহার মনে পড়িল যে প্রসার্‌পিন্ বাক্‌সে সৌন্দর্য্য ভরিয়া দিয়াছেন; তখন বাক্‌সের ভিতরটা না দেখিয়া তাঁহার মন মানিল না এবং অবশেষে তিনি বাক্‌সের ডালা খুলিলেন। কিন্তু বাক্‌সের মধ্যে সৌন্দর্য্য না পূরিয়া প্রসার্‌পিন্ ভরিয়াছিলেন চিরনিদ্রার ভয়ঙ্কর ধোঁয়া! ডালা খুলিবামাত্র সেই দারুণ ধোঁয়া সাইকিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—বেচারি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

এ দিকে কিউপিড্ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আগাগোড়া স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। সাইকি অজ্ঞান হইলে পর তিনি নামিয়া আসিয়া তাঁহার মন্ত্রপূত তীরটি দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সাইকির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিউপিড্ তৎক্ষণাৎ সাইকিকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া একেবারে ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে দেবপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তারপর স্বামী স্ত্রীতে অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে দেবতারা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। সাইকিকে দেবপুরীতে বাস করিবার হুকুম দেওয়া হইল। তিনি দেবত্ব লাভ করিয়া কিউপিডের সহিত ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

গড়পাড়া

গড়পাড়া নাম শুনে তোমরা মনে ক'রো না যে সন্দেশ যেখানে ছাপা হয়, সেই গড়পাড়ের কথা বল্ছি ;—এ গড়পাড়া কলিকাতা থেকে প্রায় ৭০০ মাইল দূরে, মধ্য-প্রদেশে। জায়গাটা যদিও মোটেই বিখ্যাত নয় ;—হয় তো তোমরা কেউ এর নামও শোন নি ;—তবু দেখ্‌বার জিনিষ বটে। মধ্য-প্রদেশের 'সাগর' সহর থেকে ৬ মাইল দূরে এই জায়গাটি। সহর থেকে যাবার রাস্তা বেশ ভালই। জায়গাটি পাহাড়ের উপরে কিন্তু চড়্‌বার রাস্তা খুব ভালই আছে। পাহাড়ের গোড়া থেকে উপর পর্য্যন্ত বেশ সুন্দর সিঁড়ি গাঁথা, তার এক একটি ধাপ এত চওড়া যে হাতীও চড়্‌তে পারে ;—বোধ হয় সেই জন্যই ধাপগুলি চওড়া করা হয়েছিল।
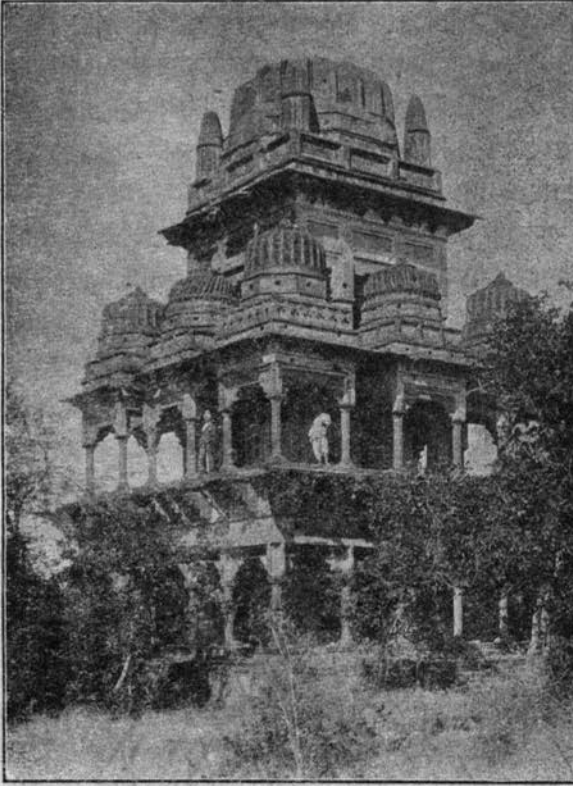
পাহাড়ের উপর চড়েই প্রথমে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ; তার পাশেই গড়পাড়ার প্রধান দেখ্‌বার জিনিষ, মন্দিরটি। সেটার একটা ছবি দিলাম ; দেখ কেমন সুন্দর। মন্দিরটি অনেক পুরানো ; দেখ্‌লে মনে হয় মুসলমান রাজত্বের সময় তৈরী। মন্দিরের

ভিতরের ঘরগুলির দেওয়ালে কাঁচের টুকরা দিয়ে নানারকম কারিকুরি করা আছে; তাই মন্দিরের নাম হয়েছে "শিশ্‌মহল"। মন্দিরটি তিনতালা; তার উপর গম্বুজ। দোতালার কার্ণিশের এককোণায় একখানা সরুলম্বা পাথরের টুকরা কোনাকুনি ভাবে বসান;—তার অনেকটা অংশ বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। পাথরখানায় আবার একটা গোল ছেঁদা করা। এই পাথরখানা কেন লাগান হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে ঃ—

বহুদিন আগে, ঐ দেশে একদল লোক থাক্‌ত, তারা দড়ি কিম্বা তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বড়ই ওস্তাদ ছিল। তাদেরই একটি মেয়ে এই কাজে সকলের চেয়ে বেশী ওস্তাদ ছিল। সে নাকি হাজার হাত লম্বা দড়ির উপরও অনায়াসে যেতে পার্‌ত।

সে দেশের রাজার কাণে মেয়েটির কথা পৌঁছাতে রাজামশাই মেয়েকে গড়পাড়ার মন্দিরে ডেকে পাঠালেন; আর বল্‌লেন, "এই যে মন্দির দেখ্‌ছ, এখান থেকে ঐ সাম্‌নের পাহাড় পর্য্যন্ত দড়ি বেঁধে দিব; তার উপর দিয়ে হেঁটে যদি তুমি পার হ'তে পার, তবে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য তোমাকে দিয়ে দিব।"

মেয়েটি তাতেই রাজি হ'লো। কাজটি বড়ই শক্ত; যদি কোন রকমে পড়ে যায় তবে মৃত্যু নিশ্চয়;—কিন্তু সে বড় সাহসী ছিল, মৃত্যুর ভয়ও তাকে থামিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হাজার হাজার লোক জড় হ'লো, সেই ভয়ানক তামাসা দেখ্‌বার জন্য! মন্দিরের দোতালার কার্ণিসের কোণায় সেই পাথরটি সে দিনই বসান হ'লো। তার সঙ্গে দড়ির একটা মাথা বেঁধে, আরেক মাথা বাঁধা হ'লো সেই আরেকটা পাহাড়ের মাথায় একটা মোটা গাছের সঙ্গে—প্রায় আধ মাইল দূরে।

রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ, সকলে ব'সেছেন; হাজার হাজার লোক নীচে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছে। এমন সময় মেয়েটি এসে রাজামশাইকে সেলাম ক'রে, সটান দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা সুরু কর্‌ল।

সকলে অবাক হয়ে, হাঁ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। মেয়েটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে অর্দ্ধেক রাস্তা পার হয়ে গেল; আর অল্প গেলেই ওপারে পৌঁছে যায়। এমন সময় মন্ত্রী চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, "আর কি দেখ্‌ছ সব; আমাদের রাজার অর্দ্ধেক রাজ্য যে যায়। চোখের সাম্‌নে এমন ব্যাপার হবে;—তা' কখনই নয়।" এই ব'লেই তিনি এক লাফে সেই দড়ির কাছে গিয়ে নিজের তলোয়ার

দিয়ে নিমেষের মধ্যে দড়ি কেটে ফেল্‌লেন ! সকলে, "হায়! হায়" "কর কি ! কর কি !" করে চীৎকার করলেন কিন্তু বাধা দেবার আগেই মন্ত্রী তাঁর ভয়ানক কাজ শেষ করে ফেলেছেন।

গল্পটি সত্য কি মিথ্যা জানি না ; তবে সত্য হ'তেও পারে ; কারণ সেই পাথরটা কার্ণিসের কোনায় লাগাবার অন্য বিশেষ কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না, আর গল্পটাও অনেক দিনের চলিত আর সে দেশের লোকেরা সকলেই এটা বিশ্বাস করে।

এই মন্দিরের পাশে গড়পাড়ার গড়। সেখানে এখন কিছুই নাই ;—কেবল উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ;—তার ভিতরে ভয়ানক জঙ্গল ; সাপ আর জন্তুর আড্ডা।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

পুরী

গতবারে আমি সবে কট্‌ল্ ফিসের কথা পড়িয়াছিলাম, আর বলিয়াছিলাম, উহাতে ঔষধ হয়। ঐ হাড়ের গুঁড়া পালিসের কাজে লাগে ; অনেকে উহা দিয়া দাঁত মাজে।

জাত বিশেষে কট্‌ল্ ফিস এক একটা খুব বড় বড় হয়, কিন্তু আমি নিতান্ত ছোট ছোটই দেখিয়াছি। উহাদের অবশ্য কোন রকম দেশী নাম আছে, দুঃখের বিষয় আমি তাহা জানি না। একটি জেলের ছেলে চার পাঁচটা কট্‌ল্ ফিস হাতে করিয়া সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি উহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওগুলো কি ?" উদ্দেশ্য, নামটা শিখিয়া লই। ছেলেটি বড় ভীতু ; কেমন জড়সড় হইয়া উত্তর দিল। তাহাতে নাম যদি বলিয়াও থাকে, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি খালি এই কথাটা একটু বুঝিলাম, যে সে তাহা দিয়া "তরকারী পাকাইবে।" সবে আমার এইটুকু জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আরো ঢের হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে এক সাহেব আসিয়া আমার সব গোলমাল করিয়া দিল। সে বলে "It is a very rudimentary fish", অর্থাৎ ওটা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর মাছ। আমি বলিলাম 'ওটা মাছ নয়, শামুক জাতীয় জন্তু।' সাহেব আমার সে কথায় আমলই দিল না। ততক্ষণে সেই ছোকরা কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেই কট্‌ল্‌ মাছগুলিকে দেখিয়া আমার ছোট ছোট শুক্‌নো কচু গাছের কথা মনে হইয়াছিল। শরীরগুলি যেন মুখী কচু (রং কিন্তু ঘোর খয়েরী) আর হাত পাগুলি যেন তাহার শুক্‌নো ডাল পালা। এক একটার এইরূপ আটটি কি দশটি করিয়া হাত (অথবা পা, যাই বল) থাকে। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার ক'টা হাত ছিল, গুণিবার অবসর পাই নাই; কিন্তু উহার আকৃতি যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, যেন উহার দশ হাত। আর, দুটি হাত যেন অন্যগুলির চাইতে বেশী লম্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; ইহাও দশহাতওয়ালা কট্‌ল্‌ ফিসের একটা লক্ষণ। কট্‌ল্‌ ফিসের বড় বড় উজ্জ্বল দুটা চোখ, আর টিয়া পাখীর মতন ঠোঁটও আছে। ঠোঁটটি কিন্তু হাত পায়ের জঙ্গলের ভিতরে লুকান থাকে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ জন্তুগুলি যেন সমুদ্রের সং। অনেক দেশে ইহাদিগকে "শয়তান মাছ" (devil fish) বলে। বাস্তবিক এমন বিকট বিদ্‌ঘুটে চেহারা আর কোন জন্তুর আছে কিনা সন্দেহ। চাল চলন আবার চেহারার চাইতেও অদ্ভুত। আট দশটা পা থাকিলে তাহার চলা ফেরা সম্বন্ধে অন্ততঃ আমাদের সাদা সিধা হিসাবে আর কোন ভাবনার কথা থাকে না। কিন্তু ইহারা এতগুলি পা লইয়াও সন্তুষ্ট নহে; উহাদের আরো এক রকম চলিবার কায়দা চাই। পাগুলি দিয়া পায়ের কাজ আর হাতের কাজ দুইই চলে; অর্থাৎ চলা ফেরাও হয় আবার শিকারকে জড়াইয়া ধরাও যায়। সাধারণ চলা ফেরার সময় এই পাগুলিই ব্যবহার হয়। কিন্তু পলায়নের সময় তেমন পুরাতন পাড়াগেঁয়ে দস্তুর উহারা পছন্দ করে না; তখনকার জন্য একটা নূতন কায়দার নিতান্তই দরকার। সুতরাং চম্পট দিবার কাজটি দমকলে না হইলে উহাদের মন উঠে না। দমকলের বন্দোবস্ত বিধাতা উহাদের শরীরের মধ্যেই করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা উহারা ইচ্ছা করিলেই পিচকারীর মতন বেগে জল ফুঁকিয়া (অবশ্য মুখে ফুঁকিয়া নয়, সেই কলে ফুঁকিয়া) বাহির করিতে পারে। সে জলের এমনি ধাক্কা যে, সেই ধাক্কায় তীরের মতন বেগে পিছু হটিয়া উহারা তিলার্দ্ধে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গিয়া উপস্থিত হয়।

ইহাদের প্রত্যেকের আবার এক থলে করিয়া কালী থাকে। তেমন বেখাপ্পা গোছের কোন শত্রু আসিলে ফস্‌ করিয়া তাহার সামনে এক রাশ কালী বাহির করিয়া দেয়। কালীতে জল ঘোলা হইয়া গেলে শত্রুর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ততক্ষণ সে শয়তান দমকল ফুঁকিয়া কোথায় গিয়া গা ঢাকা দেয় তাহা টেরই পাওয়া যায় না। ইহার উপরে আবার ইহাদের চলাফেরার অভ্যাস রাত্রিতেই বেশী। সুতরাং ইহাদিগকে সং বা ভূত পেত্নী বলিলে এমন অন্যায় আর কি হয়।

আমি পুরীতে যেমন ছোট ছোট কট্‌ল্ ফিস দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হাসিই পাইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় জন্তু বড় হইলে নিতান্তই ভয়ানক হয়। এক রকম আটপেয়ে কট্‌ল্ ফিস (octopus) আছে, তাহার এক একটা হাত পা ছড়াইলে, ৮।১০ ফুট জায়গা জুড়িয়া বসে। এক একটা পা'ই তার ১০।১২ ফুট লম্বা, এমন অক্‌টোপসও আছে। হাতীর শুঁড়ের মত আকৃতি এক একটা পা, তাহার ভিতর দিক দিয়া ছোট ছোট বাটির মতন এক প্রকার জিনিষ সার সার সাজান থাকে। এই সকল বাটির মতন জিনিসের প্রত্যেকটি একটি জোঁকের মুখের মতন কাজ করে। অর্থাৎ, যাহাতে লাগে, তাহাকেই উহারা এমন ভয়ানক চুষিয়া ধরে যে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত চুষিয়া বাহির করিবার গতিক হয়। যাহাকে একবার ধরে, তাহার কি আর রক্ষা আছে! আট হাতে জড়াইয়া ধরিয়া একটিবার ঐ ভয়ানক টিয়া পাখীর ঠোঁটের মধ্যে লইয়া ফেলিতে পারিলেই বেচারার জীবন শেষ হয়। এইরূপে অক্‌টোপাসের হাতে পড়িয়া মানুষের প্রাণ হারাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট খাট নৌকা কট্‌ল্ ফিসের টানে উল্‌টিয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।
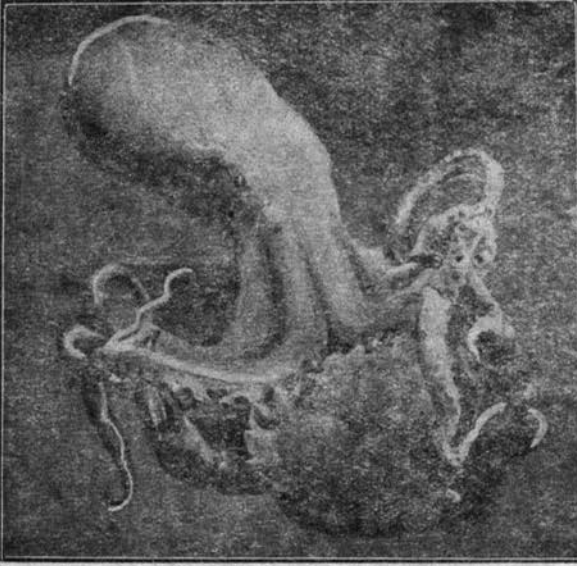
অক্টোপাসের কাঁকড়া শিকার।

ঐ "চোষনী" গুলির সাহায্যে উহারা এমন সব অসম্ভব কাজ করিতে পারে, যে লোকে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। নিতান্ত ছোট ফাটলের ভিতর ঢুকিয়া থাকা, নিতান্ত অসম্ভব স্থানে বাহিয়া উঠা, এ সকল এবং মানুষ-বাজীকরের অসাধ্য অন্যান্য রকমের অনেক কাজ ইহারা নিতান্ত সহজ ভাবে প্রত্যহই করিয়া থাকে।

ইহারা আঙ্গুরের মতন থোকা থোকা ডিম পাড়ে। শামুকেরাও ঐরূপ করে, তবে শামুকের ডিম অবশ্য খুব ছোট ছোট। ডিমগুলিকে কোন নিরাপদ জায়গায় আটকাইয়া রাখিয়া কট্‌ল্ মাছ অতি যত্নে পাহারা দেয়। ইহাদের শরীরের রং সকল সময় এক রকম থাকে না, ক্রমাগত বদলায়। যে স্থানের যেমন রং, উহাদের শরীরের রং ও উহারা অনেকটা সেইরূপ করিতে পারে।

কর্ম্মার কাহিনী

মুণ্ডারা কোল জাতীর এক শাখা। তারা রাঁচি জেলায় বাস করে। আমাদের দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, ওদেরও সেই রকম। কর্ম্মাপরব ওদের একটা বড় পরব। হিন্দি ভাদ্র মাসের একাদশিতে সেই পরব হয়। সেই সময় ওদের হাঁড়েয়া (ভাত-পচা এক রকম মদ) পান ও নাচ গানের খুব ধুম পড়ে যায় এবং তার জের তিন চার দিন ধরে চলে ; ওদের দেশে এক রকম গাছ আছে তার নাম করম। পরবের দিনে আপনার উঠানে ঐ রকম গাছের একটি ডাল পোতে। সে দিন সকলকে উপাস করে থাকতে হয়। ওদের পূজারীর নাম পাহান। পাহান করম ডালকে মুরগী বলি দিয়ে পূজা করে এবং সকল মেয়েতে মিলে পান সুপারি দিয়ে বরণ করে। শেষে সকলে মিলে পাহানের কাছে কর্ম্মার কাহিনী শোনে। কর্ম্মার গল্পটি এই ঃ—

কর্ম্মা আর ধর্ম্মা দুই ভাই ছিল। ধর্ম্মা ছালা-বলদ নিয়ে দেশ বিদেশে বেপার করতে যেত, মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসত। কর্ম্মা ঘরেই থাকত, ধর্ম্মার ফিরবার সময় হোলে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আস্‌ত। ভাদ্র মাসের এক একাদশী দিনে কর্ম্মা করম গাছের একটা ডাল উঠানে পুঁতে তাকে পূজো কর্‌তে লেগে গেছে এদিকে ধর্ম্মার বাড়ি আস্‌বার সময় হয়েছে কিন্তু তার সে কথা মনেই নেই। ধর্ম্মা দেখলে তার ভাই তাকে নিতে এল না, তাই বিরক্ত হ'য়ে ছালা বলদ ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেল। গিয়ে দেখে একটা করম গাছের ডাল পুঁতে কর্ম্মা তাকে পূজো কর্‌তে লেগেছে। "তুমি কি কর্‌তে লেগেছ, আমাকে কেন্ আন্‌তে যাওনি" এই ব'লে লাঠি দিয়ে করম ডালটিকে খুব পিটতে সুরু কর্‌লে এবং শেষে ডালটি উপড়ে ফেলে দিলে। কর্ম্মার খুব রাগ হোল কিন্তু সে কিছু বল্লে না। সেবার ধর্ম্মা যে ধান্ রুয়ে ছিল সব বানে ভেসে গেল। ধর্ম্মা পাহানের কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করায় পাহান বল্লে 'কর্ম্মার শাপে তোমার এই বিপদ

ঘটেছে। এই কথা শুনে ধর্ম্মা করম ডালটিকে ফের পুঁতে দিলে আর দুই ভাই মিলে আবার পূজা সুরু কর্‌লে।
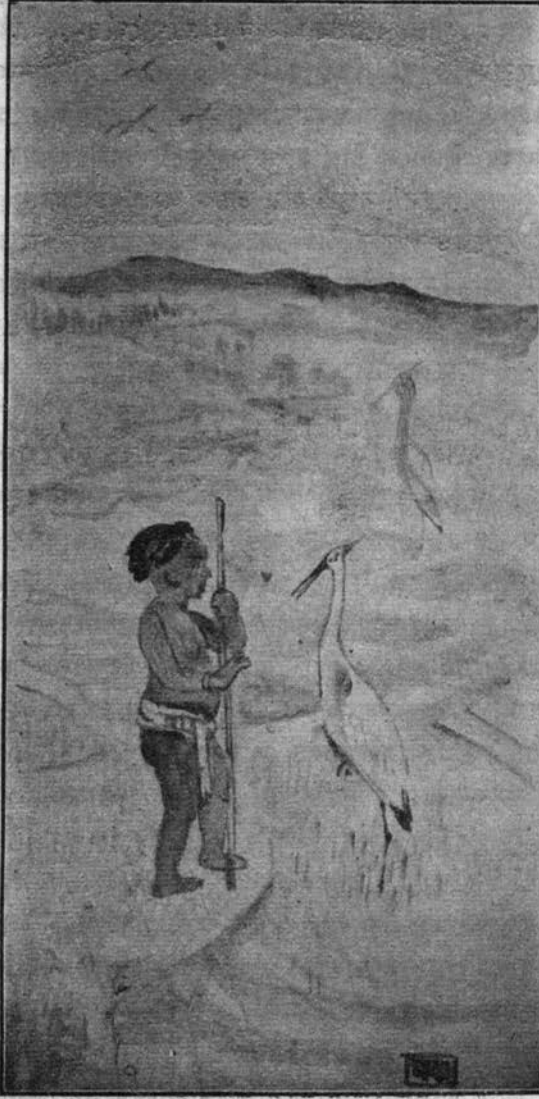
পূজার সময় পাহান মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে 'করম ডাল পূজো করে তোমরা কি ফল পেলে'। মেয়েরা উত্তর দেয় 'করম পূজো করে ভাইদের জন্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করেছি'। পাহান তখন বলে 'এইবার তোমরা কাহিনী শোন। সীতা ও সীতালী এই দুই জন ছিলেন স্বামী স্ত্রী। সীতালী এক দিন মান করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সীতা তার খোঁজে বেরুলেন। সীতা যেতে যেতে এক নগরে এলেন, সে নগর কাস্তের মত বাঁকা আর চরকার টেকোর মত সোজা। সেই নগরের মাঠে ধানের ক্ষেতে একটা বক চরছিল; বককে সীতা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'সীতালী কি এ পথে গেছেন, তুমি কি তাঁকে দেখেছ?' বক বল্লে 'সীতা মীতা আমি জানি না, আমি জানি শুধু পেটের চিতা'। সীতা তাতে রাগ করে বকের পায়ের উপর পা রেখে চেপে ধরে মাথাটি টেনে ধর্‌লেন।

সেই থেকে বকের পা হোল লম্বা আর গলাটাও হোল সাপের মত। আর সীতার শাপে তাকে সকাল

থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত চরতে হয় কিন্তু তবুও তার খিদে যায় না; যেতে যেতে সীতা আর এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে পেলেন এক কুল গাছ। সীতালীর কথা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। গাছ বল্লে 'হ্যাঁ তিনি এ পথে গেছেন, আমি তাঁকে কুল খেতে অনেক করে অনুরোধ কর্‌লুম কিন্তু তিনি বল্লেন আমাকে অনেক দূর যেতে হবে, আমি দেরি কর্‌তে পার্‌ব না। একবার আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার সাক্ষী দেখুন আমার গায়ের কাঁটাতে তাঁর কাপড়ের অংশ লেগে আছে'। সীতা বুঝলেন যে সত্যই সীতালী এই পথে গেছেন ; সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অমর বর দিলেন। তার ফলে দেখা যায় কুল গাছ কেটে ফেল্লেও আবার গজায়। সীতালীও যেতে যেতে আর এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে এক গয়লার সঙ্গে দেখা হল। গয়লার বাথানে অনেক গরু মোষ আছে। একটু দুধ খেতে চাইলেন। গয়লা তাঁকে একটা গাই দেখিয়ে দিয়ে বল্লে 'আপনি ওর দুধ দুয়ে খান'। সীতালী যেমন গাইটার কাছে গেলেন গাই ওমনি সরে গেল, কিছুতেই ধরা দিল না। গরুর পিছনে পিছনে সীতালী অনেক দূর যাচ্ছেন আর বল্‌ছেন 'হায় করমরাজ, আমার খিদে পেয়েছে, একটু দুধ খেতে চাইলুম তাও আমার অদৃষ্টে জুটল না'। খানিক পরে সেই গয়লার বাথানে সীতাও এসে উপস্থিত হ'লেন। সীতালী যে পথে গেছেন গয়লা সেই পথ তাঁকে দেখিয়ে দিল। সীতা সেই পথে গিয়ে এক নগরে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে আম গাছের উপর এক কাঠ-বেড়ালী ছিল তার সঙ্গে দেখা হ'ল। কাঠ-বিড়ালী সন্ধান দেওয়াতে তিনি কাছেই সীতালীকে পেলেন। সন্তুষ্ট হয়ে কাঠ-বিড়ালীর পিঠে হাত বুলিয়ে সীতা ব'ল্লেন আমি তোমাকে এই বর দিলুম, তুমি কখন প'ড়ে মারা যাবে না। সেই জন্য কাঠ-বিড়ালীর পিঠে আঙ্গুলের দাগ দেখা যায় আর উঁচু থেকে পড়ে গেলেও সে মরে না'।

"সামান্য" ঘটনা

এক একটা সামান্য ঘটনা থেকে জগতে কত বড় বড় কাণ্ড, কত আবিষ্কার, কত মারামারি কত যুদ্ধ বিগ্রহের আরম্ভ হ'য়েছে সে কথা ভাবতে গেলে এক এক সময় ভারি আশ্চর্য্য লাগে। আমাদের দেশে পুরাণে এরকম ঘটনার অনেক গল্প আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবদের মধ্যে যখন কেবল অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা আর কৃপাচার্য্য, এই তিন জন মাত্র বাকী রইলেন, তখন অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় শুয়ে অশ্বত্থামা দেখলেন একটা

পেঁচা এসে কতগুলা ঘুমন্ত কাককে অনায়াসে মেরে রেখে গেল! তাতেই অশ্বত্থামার মনে হঠাৎ এই ফন্দি জাগ্‌ল যে "আমিও ত এম্‌নি ক'রে অন্ধকার রাত্রে পাণ্ডব শিবিরে ঢুকে যোদ্ধাদের মেরে ছারখার ক'রে আস্‌তে পারি!" যেমন মনে হওয়া, অমনি সেইমত কাজে লাগা। সেই রাত্রের ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কথা তোমরা মহাভারতে পড়েছ।

ছেলেবেলায় ইংরাজীতে রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়েছিলাম। স্কটলণ্ডের যোদ্ধা রাজা রবার্ট ব্রুস্ প্রবল শত্রুর কাছে বার বার পরাজিত হ'য়ে শেষটায় রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছেন; এমন সময়ে তিনি দেখলেন একটা মাকড়সা একখানি সূতো ধ'রে বার বার গুহার মুখটাকে বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে আর বার বার পড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু সে চেষ্টা ছাড়ছে না; অনেক চেষ্টার পর শেষে সে ঠিক মত উঠ্‌তে পারল। তা দেখে রাজা রবার্টের মনেও ভরসা এল—তিনি ভাবলেন, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। সেই চেষ্টার ফলে তিনি জয়লাভ ক'রে আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

বাগানে নিউটন।

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে ব'সে দেখ্‌লেন গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড় সামান্য

নয়। নিউটন ভাব্‌তে বস্‌লেন "ফলটা মাটিতে পড়ল কেন? জিনিষ মাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন? চারিদিক জুড়ে এত প্রকাণ্ড আকাশ পড়ে আছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির উপরেই তার এত ঝোঁক কেন?" ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথম, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে পৃথিবীটা তার আশে পাশের সমস্ত টানে। কিন্তু শুধু পৃথিবীই কি টানে? চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এদেরও কি সে শক্তি নেই? আর, শুধু কাছের জিনিষকেই পৃথিবী টানে, অনেক দূর পর্য্যন্ত কি সে টান পোঁছায় না? ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জড়কণা অপর সমস্ত জড়কণার প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। যতদূরেই যাওয়া যায় সে আকর্ষণ ততই ক্ষীণ হ'য়ে আসে। এই পৃথিবী চন্দ্রকে টান্‌ছে চন্দ্র ও পৃথিবীকে টান্‌ছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্য্যন্ত জগতের আর সমস্ত জিনিষকে আকর্ষণ করছে! নিউটন দেখালেন যে এই ভাবে গণনা ক'রে দেখ্‌লে পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফিরার ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় তত্ত্বের আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয় নি বললেও চলে।

একটা মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙের নাচন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের আবিষ্কার হয়! গ্যাল্‌ভানি (Galvani) নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটা ব্যাং কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটা এক একবার ঝুলে পড়্‌ছে আর এক একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। তিনি যদি এটাকে ভূতুড়ে কাণ্ড ভেবে ভয়ে পালাতেন, তবে তাঁর আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা হ'ত না। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না; বরং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। তখন দেখা গেল, ঐ ব্যাঙের পায়ের নীচে এক টুক্‌রো তামা রয়েছে, তাতে যতবার পা ঠেক্‌ছে ততবারই মরা ব্যাং নেচে উঠ্‌ছে। গ্যাল্‌ভানিও খবর পেয়ে দেখ্‌তে এলেন, আর পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এই যে এখন কত সহরে সহরে বিদ্যুতের কারখানা বসেছে, আর তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে ঘরে ঘরে পাখা চল্‌ছে, আলো জ্বল্‌ছে, এর গোড়াকার ইতিহাস যদি লিখ্‌তে হয় তবে তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের নাচনটারও উল্লেখ থাকবে!

ভেড়ার লোম কেটে যে পশম তৈরী হয় তাকে কাজে লাগাবার আগে তার জট ছাড়িয়ে আঁশ আল্‌গা করা দরকার। এই কাজ আগে হাতে করতে হ'ত, পরে জট

ছাড়াবার কলের সৃষ্টি হওয়াতে এখন কাজটা অনেকটা সহজ হ'য়ে এসেছে। যাদের চেষ্টায় এই কলের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাইল্‌ম্যান নামে এক পশমওয়ালা। তিনি একদিন তাঁর মেয়েদের চুল আঁচড়ান দেখে, মনে ভাবলেন "এই রকম ক'রে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পশমের জট ছাড়ান হয় না কেন?" তিনি জট ছাড়াবার জন্য চিরুণীর কল করলেন, তাতে পশমওয়ালাদের যে কত সুবিধা হ'য়ে গেল তা আর বলা যায় না। কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্য হচ্ছে সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এলিয়াস্ হাউস্ আমেরিকার লোক; তাঁর বাল্যকালের সখ ছিল তিনি সেলাইয়ের কল বানাবেন। সে সময়ে সেলাইয়ের কাজ সমস্তই হাতে করতে হ'ত, কিন্তু হাউস্ ভাবলেন, এত রকম কাজ কলে হ'চ্ছে আর সেলাইটা হ'তে পারবে না কেন? তিনি বহুদিন ধ'রে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ছুঁচশুদ্ধ সুতোটাকে, কাপড়ের ভিতর দিয়ে পারাপার করাতে গিয়ে তিনি মহা সমস্যায় প'ড়ে গেলেন। নানা রকম ফন্দি খাটিয়েও এই কাজটিকে তিনি কলে বাগাতে পারলেন না। তখন, একদিন রাত্রে তিনি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—এক অসভ্য রাজা তাঁকে বন্দী ক'রে হুকুম দিয়েছে, এখনই আমায় সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না দাও ত তোমায় মেরে ফেল্‌ব। স্বপ্নের মধ্যে সেলাইয়ের কল বানান গেল না; রাজা হুকুম দিলেন "মার একে"। তখন কতগুলো লোক বল্লম দিয়ে তাঁকে মার্‌তে এল, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথাটা ফুটো! তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল তিনি উঠে বসতেই সবপ্রথমে তাঁর মনে হ'ল "বল্লমের মুখের কাছে ফুটো"! তিনি ভাবলেন "এই ত ঠিক হয়েছে! কলের ছুঁচের পিছনে সুতো না দিয়ে এই রকম মুখের কাছে সুতো দিলেই ত অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে।" শেষকালে পরীক্ষায় তা'ই দেখা গেল—সেলাইয়ের কল করবার পক্ষে আর কোন বাধাই রইল না। এই হ'ল সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এখানে সামান্য ঘটনাটি একটা স্বপ্ন মাত্র। এর পরে যখন সেলাইয়ের কল দেখবে তখন এই কথাটি ভেবে দেখো, যে ওর আদিজন্মের ইতিহাসের মূল হচ্ছে একটি স্বপ্ন।

আষাঢ়ে জ্যোতিষ

মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলায় না, কল্পনা সেখানের অভাব পুরাইয়া লয়। প্রাচীন কালের মানুষ যাহারা চন্দ্র সূর্য্য মেঘ বৃষ্টি আগুন বিদ্যুৎ দেখিয়া অবাক হইত, অথচ কোন ঘটনার কারণ খুঁজিয়া পাইত না, কোন কিছুর মর্ম্ম বুঝিত না, তাহারাও এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই। সেই সব প্রাচীন কালের কল্পনা কিন্তু কত দেশের কত পুরাণে কত গল্পের আকারে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহার কত রকম কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহা শুনিলে আমাদের কৌতূহল জাগে। নানান্ দেশের নানান্ কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা আর কল্পিত কাহিনী এমন ভাবে জড়ান আছে, যে তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তাহা ঠিক করাই কঠিন।

এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই কত গল্প মানুষে বানাইয়াছে! আমাদের দেশেই এক এক পুরাণে তার এক এক রকম ঘটনা। এই পৃথিবীকে শূন্যে রাখিবার জন্য বাসুকীর মাথায় তাহাকে বসান হইল, আবার তাহাতেও লোকের মন ওঠে নাই—মানুষ ক্ষীর সমুদ্রে কচ্ছপের কল্পনা করিয়া সেই কচ্ছপের পিঠে হাতী, হাতীর পিঠে বাসুকী শুদ্ধ পৃথিবীকে চাপাইয়াছে! গ্রীস দেশের পুরাণে পৃথিবীটাকে পাৎলা চাকতির মত কল্পনা করা হইয়াছে। সেই অদ্ভুত চাকতি টুকরা টুকরা হইয়া সমুদ্রের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—সেই সমুদ্রের আর শেষ নাই, কূল কিনারা কোথাও নাই। কোন কোন দেশে এই জগৎটাকে একটা ঢাকনি দেওয়া সরার মত মনে করা হইত। চন্দ্র সূর্য্য শুদ্ধ আকাশটা ঢাকনি আর পৃথিবীটা সরা। এই পৃথিবীর চেহারার বর্ণনাই কি কম পাওয়া যায়? তিন কোণা, চার কোণা, টাকার মত, বাটির মত, পদ্মের মত, কত রকমের কল্পনা!

নরওয়ে দেশের পুরাণে বলে এই পৃথিবীটা একটা দৈত্যের মৃত দেহ। পৃথিবীর স্থলের ভাগ তার মাংস, এই সমুদ্রগুলি তার রক্ত, পাহাড়গুলি তার হাড় আর দাঁত, আর গাছপালা সব তার গায়ের লোম আর চুলের জটা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ধকার আর শীতের দৈত্যগুলার সঙ্গে আগুন ও আলোর দেবতাদের লড়াই লাগিয়া আছে। দৈত্যযোদ্ধা ঈমিরকে বধ করিয়া দেবতারা তার শরীরটাকে আকাশের একটা প্রকাণ্ড ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া সেইখানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। মনের মত পৃথিবী গড়িয়া তাঁহারা দৈত্যের মাথার খুলিটা দিয়া আকাশ বানাইলেন, সেই আকাশে দৈত্যের মগজ

ছিটাইয়া মেঘের সৃষ্টি হইল। তখন সকলে বলিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবী, ইহাকে অন্ধকার রাখা চলে না, ইহার জন্য আলো চাই। তাঁহারা সমস্ত আকাশটার গায়ে আগুন ছিটাইয়া তার পর বড় বড় দুইটা আগুনের গোলা দিয়া চন্দ্র সূর্য্য গড়িলেন। সেই চন্দ্র সূর্য্যের চমৎকার রথ গড়া হইল। সল্ (সূর্য্য) ও মানি (চন্দ্র) নামে দুই মহাবীর হইলেন রথের সারথি।

সমস্তই ঠিক হইল, কেবল দুইটা ভয়ানক দৈত্য নেকড়ে বাঘের চেহারা ধরিয়া কখন যে চন্দ্র সূর্য্যের পিছনে ছুটিতে লাগিল, দেবতারা তাহাদের আটকাইতে পারিলেন না। দৈত্য দুইটার নাম স্কোল্ (ঘৃণা) ও হাটি (বিদ্বেষ)। তাহারা দেবতাদের এই কীর্ত্তি নষ্ট করিবে বলিয়া সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পিছন পিছন ছায়ার মত ছুটিয়া চলিতেছে। কখন এক একবার তাহারা একেবারে চন্দ্র সূর্য্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার আয়োজন করে; তখন স্বর্গে মর্ত্ত্যে—চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল করিয়া লোকে হায় হায় করিতে থাকে; সেই কোলাহলের ভয়ে দৈত্যেরা মুহূর্ত্তের জন্য দমিয়া যায় আর চন্দ্র সূর্য্যও সেই ফাঁকে আবার ছুটিয়া বাহির হয়। এই রকম ভাবে গ্রহণের পর গ্রহণ আসে আর চন্দ্র সূর্য্যের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। এমন একদিন আসিবে যখন এই দৈত্য চন্দ্র সূর্য্যকে একেবারে গিলিয়া হজম করিয়া ফেলিবে, তখন প্রলয় আসিয়া সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

চন্দ্রের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তাদের নাম হিউকি আর বিল্। তাহারা আগে পৃথিবীতে থাকিত। সেই সময়ে তাহাদের নিষ্ঠুর বাপ সারারাত তাহাদের দিয়া জল বহাইত। সেই জন্য চন্দ্র তাহাদের পৃথিবী হইতে কাড়িয়া নিয়া নিজের বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন! ঐযে চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ দেখিতে পাও সেগুলি আর কিছু নয়, হিউকি ও বিল্ তাদের মায়ের কোলে ঘুমাইয়া আছে। ইংরাজিতে যে ছেলে ভুলান ছড়া শুনা যায়—

Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water.

(জ্যাক্ ও জিল জল আনিতে পাহাড়ে উঠিল) সেই ছড়ার জ্যাক্ ও জিল বাস্তবিক এই হিউকি ও বিল্। তাহাদের গল্প নরওয়ে দেশের নাবিকদের মুখে মুখে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়া এখন এই রকম দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশের পুরাণেও এইরূপ গল্প আছে—সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠিল, দৈত্য-দিগকে ফাঁকি দিয়া দেবতারা সে অমৃত বাঁটিয়া খাইলেন। রাহু দৈত্য লুকাইয়া দেবতা-

দের সঙ্গে বসিয়া সে অমৃতের ভাগ লইল। চন্দ্র সূর্য্য রাহুকে ধরিয়া ফেলিলে, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি রাহুর কাটা মাথা রাগিয়া এক একবার চন্দ্র সূর্য্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে গিলিবার আয়োজন করে আর তাহাতেই গ্রহণ হয়।

ডিটেক্‌টিভ

জলধরের মামা পুলিশের চাকরি করেন, আর তার পিশেমশাই লেখেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। সেই জন্য জলধরের বিশ্বাস যে চোর ডাকাত জাল জুয়াচোর জব্দ করবার সব রকম সঙ্কেত সে যেমন জানে, এমনটি তার মামা আর পিশেমশাই ছাড়া কেউ জানে না। কারও বাড়ীতে চুরি টুরি হ'লে জলধর সকলের আগে সেখানে হাজির হয়; আর, কে চুরি কর্‌ল, কি ক'রে চুরি হ'ল, সে থাক্‌লে অমন অবস্থায় কি কর্‌ত, এ সব বিষয়ে খুব বিজ্ঞের মত কথা বল্‌তে থাকে। যোগেশ বাবুর বাড়ীতে যখন বাসন চুরি হ'ল, তখন জলধর তাদের বল্‌ল "আপনারা এইটুকু সাবধান হতে জানেন না—চুরি ত হবেই। দেখুন ত ভাঁড়ার ঘরের পাশেই অন্ধকার গলি। তার উপর জানলার গরাদ নেই; একটু সেয়ানা লোক হ'লে এখান দিয়ে বাসন নিয়ে পালাতে কতক্ষণ? আমাদের বাড়ীতে ওসব হবার জো নেই। আমি রামদিনকে ব'লে রেখেছি রোজ রাত্রে জানলার কাছে চাতালের উপর বাসনগুলো রেখে দিতে। চোরের বাছা যদি আস্‌তে চান, জানালা খুলতে গেলেই বাসন পত্র সব ঝনঝন ক'রে মাটিতে পড়্‌বে। চোর জব্দ করতে হ'লে এ সব কায়দা জান্‌তে হয়।" সে সময়ে আমরা সকলেই জলধরের বুদ্ধির খুব প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু পরের দিন যখন শুনলাম সেই রাত্রেই জলধরদের বাড়ীতে মস্ত চুরি হ'য়ে গেছে, তখন মনে হ'ল আগের দিন অতটা প্রশংসা করা উচিত হয় নি।

জলধর কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমে নি। সে বল্‌ল "আমি যে রকম প্ল্যান করেছিলাম, তাতে চোর একবার বাড়ীতে ঢুকলে তাকে আর পালাতে হ'ত না—কিন্তু ঐ আহাম্মক রামদিনটার বোকামিতে সব মাটি হ'য়ে গেল। যাক্ আমার জিনিষ চুরি ক'রে তাকে আর হজম করতে হবে না। বাছাধন যে দিন আমার হাতে ধরা পড়্‌বেন, সেদিন বুঝবেন ডিটেক্‌টিভ কাকে বলে। কিন্তু যা হো'ক্, চোরটা খুব সেয়ানা বল্‌তে হবে। যোগেশ বাবুদের বাড়ীতে যেটা গেছিল সেটা আনাড়ির এক

স্কোল্ ও হাটি, সল্ ও মানির পিছনে ছুটিয়াছে

শেষ। আমাদের বাড়ীতে এলে সে ব্যাটা টের পেত।” কিন্তু দুমাস গেল চার মাস গেল ক্রমে প্রায় বছর ও কেটে গেল, কিন্তু সে চোর আর ধরা পড়ল না।

চোরের উপদ্রবের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের স্কুলে আবার চুরির হাঙ্গামা সুরু হ’ল। ছেলেরা অনেকে টিফিন নিয়ে আসে, তা থেকে খাবার চুরি যেতে লাগ্‌ল। প্রথম দিন রামপদর খাবার চুরি যায়। সে বেঞ্চির উপর খানিকটা রাবড়ি আর লুচি রেখে হাত ধুয়ে আস্‌তে গেছে—এর মধ্যে কে এসে লুচি টুচি বেমালুম খেয়ে গিয়েছে। তারপর ক্রমে আরও দুচারটি ছেলের খাবার চুরি হ’ল। তখন আমরা জলধরকে বললাম, “কিহে ডিটেক্‌টিভ! এইবেলা যে তোমার চোর ধরা বুদ্ধি খোলে না, তার মানেটা কি বল দেখি?” জলধর বল্‌ল “আমি কি আর বুদ্ধি খাটাচ্ছি না? সবুর কর না।” তখন সে খুব সাবধানে আমাদের কানে কানে এ কথা জানিয়ে দিল যে স্কুলের যে নূতন ছোকরা বেয়ারা এসেছে তাকেই সে চোর ব’লে সন্দেহ করে। কারণ সে আসবার পর থেকেই চুরি আরম্ভ হ’য়েছে।

আমরা সবাই সে দিন থেকে তার উপর চোখ রাখ্‌তে সুরু করলাম। কিন্তু দুদিন না যেতেই আবার চুরি। পাগলাদাশু বেচারা বাড়ী থেকে মাংসের চপ্‌ এনে টিফিন ঘরের বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল; কে এসে তার আধখানা খেয়ে বাকীটুকু ধূলোয় ফেলে নষ্ট করে দিয়েছে। পাগলা তখন রাগের চোটে চীৎকার ক’রে গাল দিয়ে ইস্কুলবাড়ী মাথায় ক’রে তুল্‌ল। আমরা সবাই বল্‌লাম, “আরে চুপ চুপ, অত চেঁচাস্‌নে। তা হ’লে চোর ধরা পড়বে কি ক’রে?” কিন্তু পাগলা কি সেকথা শোনে? তখন জলধর তাকে বুঝিয়ে বল্‌ল “আর দুদিন সবুর কর, ঐ নতুন ছোকরাটাকে আমি হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি—এসমস্ত ওরই কারসাজি”। শুনে দাশু বল্‌ল, “তোমার যেমন বুদ্ধি! ওরা হ’ল পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, ওরা আবার মাংস খায় নাকি? দারোয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করত?” সত্যিই ত! আমাদের ত সে খেয়াল হয়নি। ‘ও ছোকরা ত কত দিন রুটি পাকিয়ে খায়, কই একদিনও ত ওকে মাছ মাংস খেতে দেখি না। দাশু পাগ্‌লা হোক আর যাই হোক্‌, তার কথাটা সবাইকে মানতে হ’ল।

জলধর কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলেই নয়। সে এক গাল হেসে বল্‌ল, “আমি ইচ্ছে ক’রে তোদের ভুল বুঝিয়েছিলাম। আরে, চোরকে না ধরা পর্য্যন্ত কি কিছু বল্‌তে আছে—কোন পাকা ডিটেক্‌টিভ ওরকম করে না। আমি মনে মনে যাকে চোর বলে ধরেছি, সে আমিই জানি।”

তারপর ক'দিন আমরা খুব হুঁশিয়ার ছিলাম ; আট দশ দিন আর চুরি হয়নি। তখন জলধর বল্‌লে "তোমরা গোলমাল ক'রেই ত সব মাটি কর্‌লে। চোরটা টের পেয়ে গেল যে আমি তার পেছনে লেগেছি। আর কি সে চুরি করতে সাহস পায় ? তবু ভাগ্যিস্ তোমাদের কাছে আসল নামটা ফাঁস করিনি"। কিন্তু সেই দিনই আবার শোনা গেল স্বয়ং হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘর থেকে তাঁর টিফিনের খাবার চুরি হ'য়ে গেছে। আমরা বল্‌লাম "কই হে ? চোর না তোমার ভয়ে চুরি কর্‌তে পারছিল না ? তার ভয় যে ঘুচে গেল দেখ্‌ছি"।

তারপর দুদিন ধ'রে জলধরের মুখে আর হাসি দেখা গেল না। চোরের ভাবনা ভেবে ভেবে তার পড়াশুনা সব এমনি ঘুলিয়ে গেল যে পণ্ডিত মশায়ের ক্লাশে সে আরেকটু হ'লেই মার খেত আর কি ! দুদিন পরে সে আমাদের সকলকে ডেকে একত্র কর্‌ল, আর বল্‌ল তার চোর ধরবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হ'য়েছে। টিফিনের সময় সে একটা ঠোঙায় ক'রে সরভাজা লুচি আর আলুর দম রেখে চলে আস্‌বে। তারপর কেউ যেন সেদিকে না যায়। ইস্কুলের বাইরে যে জিমনাষ্টিকের ঘর আছে, সেখান থেকে লুকিয়ে টিফিনের ঘরটা দেখা যায় ; আমরা কয়েক জন বাড়ী যাবার ভান ক'রে সেখানে থাকব। আর কয়েক জন থাকবে উঠানের পশ্চিম কোণের ছোট ঘরটাতে। সুতরাং চোর যেদিক থেকেই আসুক, টিফিন ঘরে ঢুকতে গেলেই তাকে দেখা যাবে।

সে দিন টিফিনের পর পর্য্যন্ত কা'রও আর পড়ায় মন বসে না। সবাই ভাবছে কতক্ষণে ছুটি হবে, আর চোর কতক্ষণে ধরা পড়্‌বে। চোর ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কি করা যাবে সে বিষয়েও কথাবার্ত্তা হ'তে লাগ্‌ল। মাষ্টার মহাশয় বিরক্ত হ'য়ে ধমক দিতে লাগলেন, পরেশ আর বিশ্বনাথকে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হ'ল—কিন্তু সময়টা যেন কাটতেই চায় না। টিফিনের ছুটি হ'তেই জলধর তার খাবারের ঠোঙাটি টিফিন ঘরে রেখে এলো। জলধর, আমি আর দশবারো জন উঠোনের কোনের ঘরে রইলাম, আর একদল ছেলে বাইরে জিমনাষ্টিকের ঘরে লুকিয়ে থাক্‌ল। জলধর বল্‌ল "দেখ্, চোরটা যে রকম শেয়ানা দেখ্‌ছি, আর তার যে রকম সাহস, তাকে মারধর করা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই খুব ষণ্ডা হবে। আমি বলি সে যদি এদিকে আসে তা'হলে সবাই মিলে তার গায়ে কালী ছিটিয়ে দিব আর চেঁচিয়ে উঠ্‌ব। তা হ'লে দারোয়ান টারোয়ান সব ছুটে আস্‌বে। আর, লোকটা পালাতে গেলেও ঐ কালীর চিহ্ন দেখে

ঠিক ধরা যাবে।” আমাদের রামপদ ব'লে উঠ্‌ল, “কেন? সে যে খুব ষণ্ডা হবে তার মানে কি? সেত কিছু রাক্ষসের মত খায় ব'লে মনে হয় না। যা চুরি করে নিচ্ছে— সেত কোন দিনই খুব বেশী নয়।” জলধর বল্‌ল “তুমিও যেমন পণ্ডিত! রাক্ষসের মত খুব খানিকটা খেলেই বুঝি খুব ষণ্ডা হয়? তা হ'লে ত আমাদের শ্যামাদাসকেই সকলের চেয়ে ষণ্ডা বল্‌তে হয়। সে দিন ঘোষেদের নেমন্তনে ওর খাওয়া দেখেছিলে ত! বাপুহে, আমি যা বলেছি, তার ওপর ফোড়ন দিতে যেয়ো না। আর তোমার যদি নেহাৎ বেশী সাহস থাকে, তুমি গিয়ে চোরের সঙ্গে লড়াই ক'রো। আমরা কেউ তাতে আপত্তি করব না। আমি জানি, এ সমস্ত নেহাৎ যেমন-তেমন চোরের সাধ্য নয়—আমার খুব বিশ্বাস যে লোকটা আমাদের বাড়ীতে চুরি ক'রেছিল, এসব ত'ারই কাণ্ড!”

এমন সময় হঠাৎ টিফিন ঘরের বাঁদিকের জানালাটা খানিকটা ফাঁক হ'য়ে গেল, যেন কেউ ভিতর থেকে ঠেল্‌ছে। তার পরেই সাদা মতন কি একটা ঝুপ্‌ ক'রে উঠানের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। আমরা চেয়ে দেখলাম একটা মোটা হুলো বেড়াল, তার মুখে জলধরের সরভাজা! তখন যদি জলধরের মুখ খানা দেখ্‌তে সে এক বিঘৎ উঁচু হাঁ ক'রে উঠানের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম “কেমন হে ডিটেক্‌টিভ্‌! ঐ ষণ্ডা চোরটাই ত তোমার বাড়ীতে চুরি ক'রেছিল? তা হ'লে এখন ওকেই পুলিশে দেই?”

পাখীর বাসা

মানুষ যেমন নানারকম জিনিষ দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ী বানায়;—কেউ ইঁট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি; কারো এক-চালা, কারো দো-চালা— পাখীরাও সে রকম নানা জিনিষ দিয়ে নানান্‌ কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে; তার গড়নই বা কত রকমের,—কারো বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মত, কারো বাসা গোল, কারো বাসা লম্বা চোঙার মত। এক একটা পাখীর বাসা দেখ্‌লে অবাক হয়ে যেতে হয়;—তাতে বুদ্ধিই বা কত খরচ করেছে, আর মেহনতই বা করেছে কত!

বাবুই পাখীর বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধ হয়। কেমন সুন্দর ক'রে শুক্‌নো ঘাস দিয়ে বুনে, তার বাসাটি সে তৈরী করে। পাছে কোন জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে সে জন্য বাসায় ঢুক্‌বার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার অরেকটা উপায় তারা করেছে,—অনেক সময় বাসার গায়ে আরেকটা গর্ত্তের মত মুখ তৈরী ক'রে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্য,—তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না। ছবিতে দেখ, দুটো গর্ত্তই দেখা যাচ্ছে।

টুনটুনি পাখী তার বাসা তৈরী করবার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই ক'রে একটি বাটির মত তৈরী করে ; তা'র মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইএর সূতো সাধারণতঃ রেশমেরই ব্যবহার করে ; কাছে রেশম না থাক্‌লে, যে সূতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইএর ছুঁচ হলো ত'ার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মত ঝুল্‌তে থাকে। খুব ছোট জাতের পাখীরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রায়ই ঐ রকম দোলনার মত বাসা তৈরী ক'রে থাকে।

অনেক জাতের পাখী আবার মাটিতেই বাসা করে; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাসা তৈরীই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু, এরা সবই এই জাতের। আবার কোন কোন পাখী সুন্দর ক'রে লতা পাতা দিয়ে কুঞ্জবনের মত বানায়। অষ্ট্রেলিয়া দেশের "কুঞ্জ-পাখী" (Bower bird) তার বাসার সাম্‌নে খুব সুন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরী করে। পাখীটি আকারে ছোট বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোট হয় না; ছবিখানা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। এদের আবার রং চঙে জিনিষের বড় সখ; ভাঙা কাঁচ, পাথর, রঙ্গিন জিনিষ, যা' সাম্‌নে পাবে, সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখ্‌বে।

কোন কোন পাখী থুতু দিয়ে বাসা তৈরী করে। তালচোঁচ পাখী এ জাতের। পালক, ঘাস, এ সব জিনিষ থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরী হয়। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া দ্বীপ পুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খুব আদর; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়! এই জন্য সে দেশে এর দামও খুব বেশী।
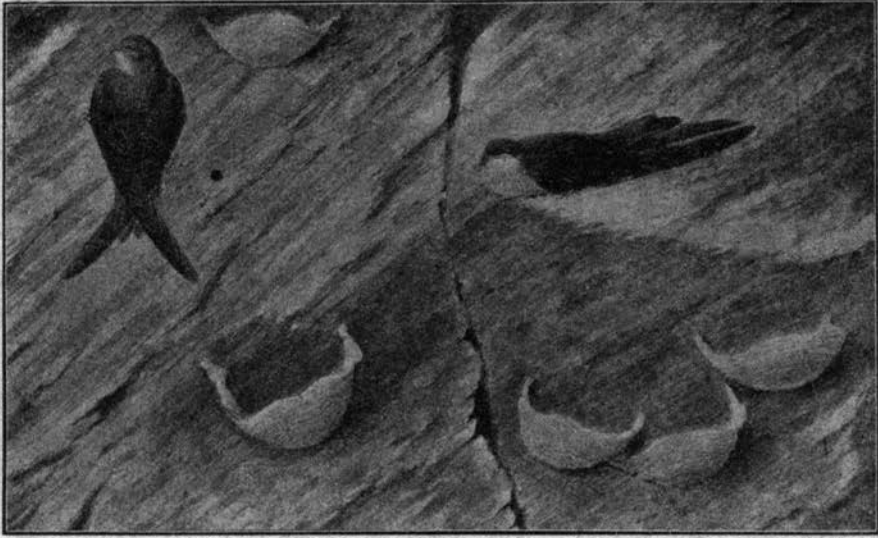
ইষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপে তালচোঁচের বাসা।

ফ্লামিঙ্গোর দেশ।

অনেক জাতের পাখী কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরী। একটা ঢিপির মত কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত্ত ক'রে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। ছবিতে দেখ কত ফ্লামিঙ্গোর বাসা। আরো অনেক জাতের পাখীও কাদার বাসা বানায় ;—তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত্ত করে, তার ভিতরে বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্ত্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতী ক'রে অধিকার করতে বড় পটু।

বাদলা সন্ধ্যায়

(১)

সকাল সকাল সন্ধ্যে হ'লো আজকে বাদল ঝরে,
আজকে মাগো দুয়ার দিয়ে বসো মেজের পরে।
চড়-চড়-চড় ডাকছে দেয়া বাতাস বেড়ায় হাঁকি,
আজকে তোমার বুকের মাঝে ইচ্ছে শুধুই থাকি।
আহ্লাদে আর ভয়ে আমার করছে কেমন বুক
গরম তোমার কোলের মাঝে লুকাই আমার মুখ।
আজকে তোমার বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে সুখে
নৌক'পরে ভাসছি যেন পদ্মা-নদীর বুকে।
খাওয়া দাওয়ায় কাজ নাই মা আজকে বাদল সাঁজে,
আজ দেব না উঠতে তোমা রান্নাঘরের কাজে।

ঐ দেখ না জানলা দিয়ে চিকির হানে যে
আকাশ ভেঙ্গে পড়বে মাঠের মধ্য খানেতে।
ঐ শুন মা দুপ দুপিয়ে চলছে কে গো পথে,
মা পিশী ওর কেমন করে ছাড়লে বাড়ী হতে?
ঐ শুন মা হাম্বা করে আমার বুধুরাণী,
মাগো তুমি বল্লে পরে এই ঘরে তায় আনি।

ঝট পটিয়ে পীঁড়েয় ভুলো ঝাড়ে গায়ের জল,
বাগ্দী দিদির ছাগলগুলো কোথায় আছে বল।
যতই করো ঘুমাবো না আজকে বাদল সাঁজে
আজ দেব না উঠতে তোমা ঘরের কোনো কাজে।

ভিজে কাকের শব্দ পাখার শুনছোনাক চালে!
ওদের কি মা নাইক বাসা কোথায় ছানা পালে?
কোথায় বসে বৌ কথাকও যাচ্ছে ডেকে হেন,
এমন দিনে বৌটা তাহার কয়না কথা কেন?
বলো আমার বউর কথা কোন্ সাগরের পার
কোন্ পরীদের দেশে বসে গাঁথছে মাণিক হার।
কেমন করে নৌকা চড়ে' আন্‌তে যাবো তায়,
দৈত্যপতি যাবে মারা আমার খাঁড়ার ঘায়।
বড়াই বুড়ীর মন্ত্রবলে গজাবে মোর পাখা,
সাত রাজার ধন মাণিক তথায় রইবে সদাই ঢাকা।
স্বপ্নপুরীর গল্প বলো আজকে বাদল সাঁজে,
আজ দেবনা উঠ্‌তে তোমা বাড়ীর মিছে কাজে।

রাজপুত্তুর যাচ্ছে বুঝি তেপান্তরের মাঠে
কোন্ গাছটির তলায় তাহার এমন বাদল কাটে?
রাহীরা হায় ভিজ্‌ছে বুঝি খেয়া নদীর পারে,
হাটুরেরা চুপড়ী মাথায় কাঁপছে পথের ধারে।
ইঁচ্ছে বড় দাদার কাছে যাই মা আজি উড়ে
কোন্ দোষে মা দাদায় তুমি পাঠাও শুধু দূরে?
আজকে মাগো দিদির লেগে মনটা কেমন করে
তুমি তাহার নেইক কাছে আছে পরের ঘরে।
দাদার কথা দিদির কথা বলো মা আজ সাঁজে
আজ দেবনা উঠতে তোমা রান্না ঘরের কাজে॥

শ্রীকালিদাস রায়।
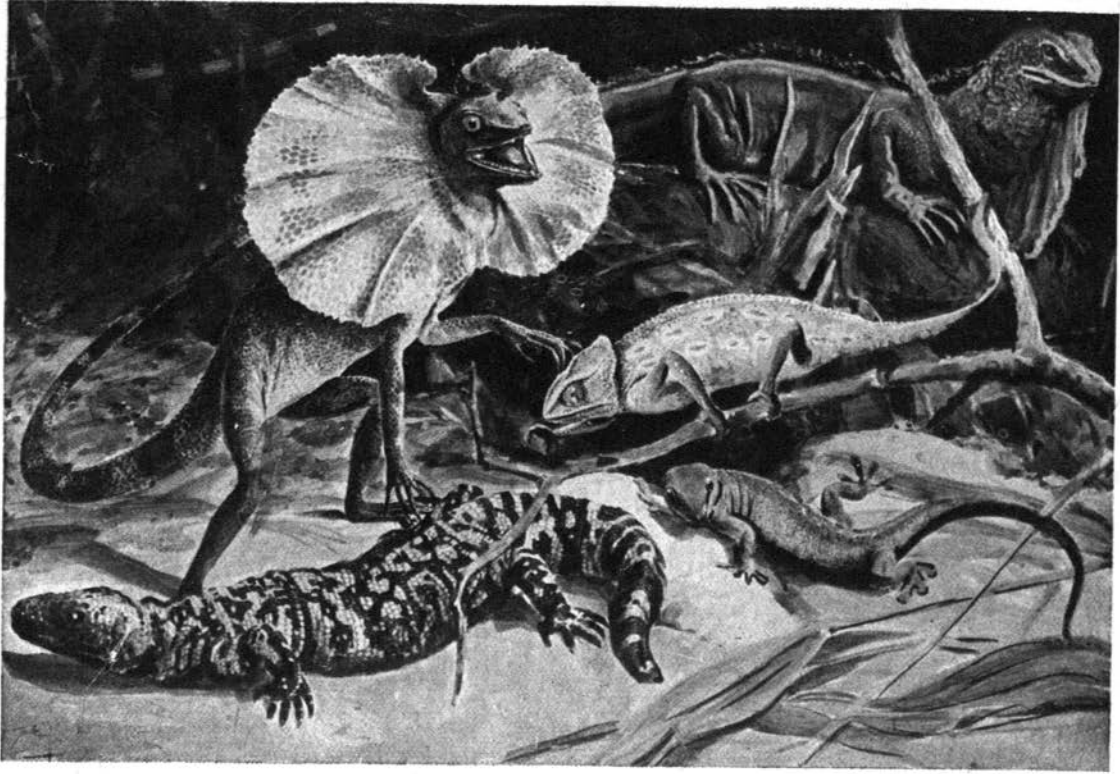
কুমীরের জাতভাই।
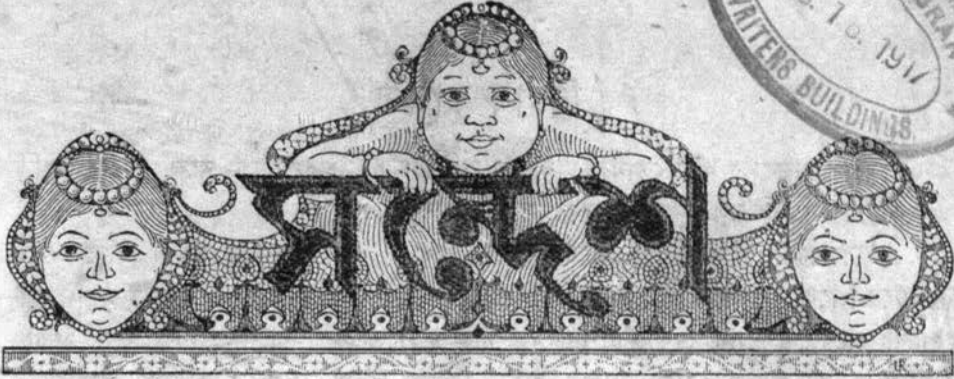
পঞ্চম বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ অষ্টম সংখ্যা

মাতৃসেবা

(পারস্য কবি জামী হইতে)

দেবের দরগা দগ্ধকারীরা হুকুম তলবে জুটিল যবে,
করে সুলতান দণ্ড বিধান নত মস্তকে দাঁড়ায়ে সবে।
পত্রীর পরে শাস্তি লিখিয়া বিলি করা হলো দোষীর দলে,
কাহারো ভাগ্যে তপ্ত লৌহ কারো কারাবাস রজ্জু গলে।
কাহারো মিলিল জীবন দণ্ড কাহারো মিলিল তীব্র কশা,
কারো বা জুটিল নেত্রহরণ কারো বা জুটিল ভিখারী দশা।
জীবন দণ্ড লভিল যে জন দাঁড়ায়ে কহিল জুড়িয়া পাণি,
"মরিতে ডরি না, একটি সবাই শুন নিবেদন—চরম বাণী।
অন্ধ মাতার এক সুত আমি তাঁর ভার যদি লওগো কেহ,
এই আশ্বাস শুনিতে পাইলে শান্তিতে আমি ত্যাজিব দেহ"।
অপরাধী দলে উঠি একজন তাহার পত্রী কাড়িয়া নিয়া,
কহিল দাঁড়ায়ে আপন পত্রী তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া।
"আমার মায়ের পাঁচটি তনয় তার মাঝে আমি অধম হীন,
আমি কুপুত্র মায়ের মহিমা বুঝি নি জীবনে একটি দিন।
তোমার মতন মাতৃভক্ত মাতার সেবায় বাঁচিয়া রো'ক্,
কশার দণ্ড লও তুমি ভাই জীবন দণ্ড আমার হোক্"।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিরাধ রাক্ষস

বিরাধ রাক্ষসের কথা তোমরা রামায়ণে পড়িয়াছ। শিবপুরাণে বলে বিরাধ নাকি পূর্ব্বে রাক্ষস না ছিল। কি করিয়া সে রাক্ষস হইল শুন।

গোর্কণদেশে বিখ্যাত এক শিবের মন্দির ছিল। কোন সময়ে মহর্ষি নারদ সেই মন্দিরে শিবের পূজা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে মন্দিরের নিকটে পথের ধারে দেখিলেন, একটি চাঁপাফুলের গাছ তাহাতে রাশি রাশি সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া আছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ হাতে চুপড়ি লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চুপড়ি হাতে করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?" ব্রাহ্মণ ফুল তুলিতে আসিয়াছিল কিন্তু সে কথা গোপন করিয়া বলিল—"আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি।"

ইহার পর নারদ মন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ ফুল তুলিয়া চুপড়িটি ঢাকা দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোথায় যাইতেছ?" এবারেও ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিল—"ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলাম কিন্তু তাহা না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।" ইহা শুনিয়া মহর্ষি নারদ যোগবলে সকল কথা জানিতে পারিলেন এবং চাঁপাগাছের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে বৃক্ষ! ঐ ব্রাহ্মণ কতকগুলি ফুল তুলিয়াছে আর ফুল লইয়া সে কোথায় গেল?"

সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই চাঁপা গাছকে বলিয়া রাখিয়াছিল, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে আমি ফুল তুলিয়াছি কি না, তবে তুমি সত্য কথা বলিও না। সুতরাং নারদের কথার উত্তরে গাছ বলিল—"কে ব্রাহ্মণ? আর তুমি বা কে? কোন্ ফুলের কথা বলিতেছ? আমি তাহার কিছু জানি না।"

তখন ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিতে নারদের বাকি রহিল না—তিনি তখনই মহাদেবের মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন একশত একটা চাঁপা ফুল দিয়া কে জানি শিবের মাথায় অর্ঘ্য দিয়াছে। সেই সময়ে মন্দিরে অন্য এক সাধু ব্রাহ্মণ মহাদেবের পূজা করিতেছিলেন। তাঁহাকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? শিবের মাথায় এই ফুলগুলি কে দিয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এ ফুল দিয়া আমি পূজা করি নাই—অন্য এক ব্রাহ্মণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন এইরূপ ফুল

দিয়া মহাদেবের পূজা করেন এবং সেই পূজার বলে এই দেশের রাজাকে তিনি এমনই বশ করিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণই এখন রাজার দানের কর্ত্তা। রাজা দান ধ্যান যা কিছু করেন সবই ব্রাহ্মণের কথা মত। শুধু তাহাই নহে, রাজার অনুগ্রহে মত্ত ব্রাহ্মণের অত্যাচারের আর সীমা সংখ্যা নাই!"

ইহা শুনিয়া নারদ ভাবিলেন—মহাদেবকে চাঁপা ফুল দিয়া তাঁহারই বলে সন্তুষ্ট রাখিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে বশ করিয়াছে আর গরীব ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দেয়।" এই ভাবিয়া নারদ মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভু! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে আপনি এরূপ অনুগ্রহ কেন করিতেছেন?" মহাদেব বলিলেন—"নারদ! জানইত আমি চাঁপা ফুলের বড় ভক্ত। চাঁপাফুল দিয়া যে আমার পূজা করে সমস্ত পৃথিবী তার বশ হয়। সুতরাং আমি কি করিব? ঐ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ চাঁপাফুল দ্বারাই এরূপ ফল পাইয়াছে।"

মহর্ষি নারদ এ কথার উত্তর দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার পিছনে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণও ছিল। তাহাকে দেখাইয়া ব্রাহ্মণী নারদকে বলিল—"প্রভু! এই দুষ্ট ব্রাহ্মণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহাকে বারণ করুন।" নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ব্রাহ্মণ তোমাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে?" ব্রাহ্মণী বলিল—"ঠাকুর! আমার স্বামী পঙ্গু, আমরা অতিশয় দরিদ্র। আমার কন্যার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার বিবাহ দিবার জন্য আমার স্বামী রাজার নিকট হইতে ধন ভিক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এখন সেই ধনের অর্দ্ধেক এই দুষ্ট বলপূর্ব্বক লইতে চায় কেন? রাজার কাছে নালিশ করিয়াও কোন ফল নাই, কারণ এই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এই মন্দিরে শিবপূজা করিয়া শিবের অনুগ্রহে রাজাকে বশ করিয়াছে। ধনের অর্দ্ধেক ভাগ না হয় দিলাম, কিন্তু রাজা একটি গাভীও দিয়াছেন—ব্রাহ্মণ বলে সেই গাভীরও অর্দ্ধেক তাহাকে দিতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ! গরু কি করিয়া ভাগ করিব? তাহা হইলে যে আমাদের পাপের সীমা থাকিবে না!"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া নারদের বিষম রাগ হইল এবং তিনি মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভু! এরূপ দুষ্ট মহাপাপীর পূজা আপনি গ্রহণ করেন?" তখন মহাদেব বলিলেন—"নারদ! তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। যাহাতে এই ব্রাহ্মণ তাহার পাপের ফলভোগ করিয়া সদ্গতি পায় এবং পুনরায় ভক্ত হয় তাহাই করিবে।" তখন নারদ চাঁপা গাছের নিকট গিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"চম্পক! বল দেখি কে প্রতিদিন তোমার ফুল তুলিয়া নেয়?" চম্পক এবারেও মিথ্যা কথা বলিল।

ইহাতে নারদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন—"ওরে মিথ্যাবাদি! আজ হইতে তোমার ফুলে আর শিব পূজা হইবে না।" তারপর মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! চাঁপা ফুল দিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিস্ আর তাঁহার অনুগ্রহে রাজাকে বশ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দিস্? সুতরাং আজ হইতে তুই রাক্ষস হ।"

নারদের শাপে ব্রাহ্মণ মহা ভীত হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া মিনতি করিতে লাগিল। তখন নারদ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, সত্যই তুমি রাক্ষস হইবে। তবে কিনা শ্রীরামচন্দ্রকে যখন দেখিবে এবং তাঁহার হাতে যখন তোমার মৃত্যু হইবে তখনই তোমার শাপও আর থাকিবে না—মহাদেবের অনুগ্রহে তুমি পুনরায় সুন্দর রূপ লাভ করিবে।" মহর্ষি নারদ এই কথা বলিলে সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ 'বিরাধ' নামে মহা ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস হইল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বুদ্ধিমানের সাজা

আলি শাকালের মত ওস্তাদ আর ধূর্ত্ত নাপিত সে সময়ে মেলাই ভার ছিল। বাগদাদের যত বড় লোক তাকে দিয়ে খেউরী করাতেন, গরিবকে সে গ্রাহ্যই কর্‌তো না।

একদিন এক গরীব কাঠুরে ঐ নাপিতের কাছে গাধা বোঝাই ক'রে কাঠ বিক্রী কর্‌তে এল। আলি শাকাল কাঠুরেকে বল্‌ল, "তোমার গাধার পিঠে যত কাঠ আছে সব আমাকে দাও; তোমাকে এক টাকা দেবো।" কাঠুরে তাতেই রাজি হ'য়ে গাধার পিঠের কাঠ নামিয়ে দিল।

তখন নাপিত বল্‌ল, "সব কাঠ তো দাওনি; গাধার পিঠের 'গদি'টা কাঠের তৈরী; ওটাও দিতে হবে।" কাঠুরে তো কিছুতেই রাজি হলো না; কিন্তু নাপিত তার আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে গদিটা জবরদস্তি ক'রে কেড়ে নিয়ে, কাঠুরেকে এক টাকা দিয়ে বিদায় ক'রে দিল।

কাঠুরে বেচারা আর কি করে? সে গিয়ে খালিফের কাছে তার নালিশ জানাল। খালিফ বল্‌লেন, "তুমি তো 'গাধার পিঠের সমস্ত কাঠ' দিতে রাজি ছিলে; তবে আর এখন আপত্তি কর্‌ছ কেন? কথা মতই তো কাজ হয়েছে।" তারপর কাঠুরের কাণে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি জানি বল্‌লেন; কাঠুরেও মুচ্‌কি হেসে, "যো হুকুম" ব'লে সেলাম ঠুকে চ'লে গেল।

কিছুদিন বাদে কাঠুরে আবার নাপিতের কাছে এসে বল্‌ল; "নাপিত সাহেব, আমি আর আমার সঙ্গীকে খেউরী করার জন্য তোমাকে ১০৲ টাকা দেবো, তোমার মত ওস্তাদের হাতে অনেক বেশী টাকা দিয়েও খেউরী হ'তে পার্‌লে জন্ম সার্থক হয়। তুমি কি রাজি আছ"? নাপিত তো খোসামোদে ভুলে, কাঠুরেকে চট্‌পট্ কামিয়ে দিল; তারপর তাকে বল্‌ল, "কৈ হে তোমার সঙ্গী?" কাঠুরে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার গাধাটি এনে হাজির কর্‌ল। নাপিত তো বেজায় চটে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ঘুঁসি বাগিয়ে বল্‌ল, "এত বড় বেয়াদবি আমার সঙ্গে! সুলতান, খালিফ্, আগা, বেগ যার হাতে খেউরী হবার জন্য সর্ব্বদাই খোসামোদ করে, সে কিনা গাধাকে কামাবে! বেরোও এখনি এখান থেকে!"

কাঠুরে নাপিতের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সটান গিয়ে খালিফের কাছে হাজির্। খালিফ তার নালিশ শুনে আলি শাকালকে ডেকে পাঠালেন। নাপিত এসেই হাতজোড় ক'রে বল্‌ল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! গাধাকে কি কখনও মানুষের সঙ্গী ব'লে ধরা যেতে পারে?" খালিফ বল্‌লেন, "তা' না হ'তেও পারে, কিন্তু গাধার পিঠের গদিও কি কখনও
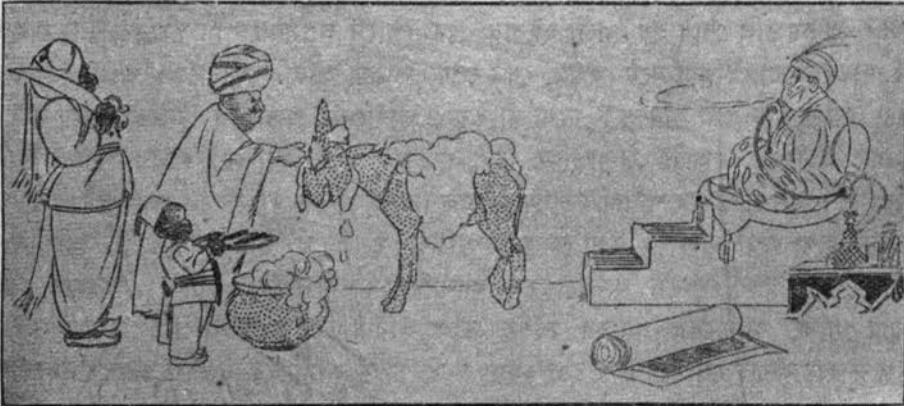
কাঠের রোঝার মধ্যে ধরা যেতে পারে?—তুমিই একথার জবাব দেও।" নাপিত তো

একেবারে চুপ! কিছুক্ষণ বাদে খালিফ বল্‌লেন, "আর দেরি কেন? গাধাকে কামিয়ে ফেল; কথা-মত কাজ না কর্‌তে পার্‌লে তার উচিত সাজার ব্যবস্থা হবে জানই তো।"

নাপিত বেচারা আর করে কি? গাধাকে বেশ ক'রে খুর বুলিয়ে কামাতে লাগল। সেই তামাসা দেখবার জন্য চারিদিকে ভিড় জমে গেল। কামান' শেষ হতেই নাপিত অপমানে মাথা হেঁট ক'রে বাড়ী পালাল। কাঠুরেও নেড়া গাধায় চ'ড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাড়ী পালাল।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আবার পুরীতে

এবারে আবার পুরী গিয়াছিলাম। দু বৎসর আগে আর একবার যাই। এই দু বৎসরের মধ্যে স্থানটির সমুদ্রের ধারের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সে সকল জায়গায় আগে বালী ভিন্ন কিছুই ছিল না, এখন সেখানে অনেকগুলি নূতন বাড়ী হইয়াছে। ইহারই একটি ছোট বাড়ীতে আমরা ছিলাম।

এ বাড়ীতে আসিয়াই কতকগুলি কাঁকড়া আর কুকুরের সহিত পরিচয় হইল। কাঁকড়াগুলি আমাদের উঠানেই থাকিত; বাড়ী হইবার পূর্ব্বে এ সকল জমি তাহাদেরই ছিল। কুকুরগুলি বোধ হয় বাড়ী হইবার পরে এখানে আসিয়াছে। বেচারারা নিতান্তই গরীব। চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন পেট ভরিয়া আহার তাহাদের অল্পই জোটে; কিন্তু এরূপ কষ্ট এবং অযত্নের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের স্বভাবের মিষ্টতা হারায় নাই। প্রথমে ইহাদের একটিই ঐ বাড়ীতে ছিল, সুতরাং প্রথম পরিচয় তাহার সঙ্গেই হয়। জীর্ণ শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার শরীরটিতে যেমন এক দিকে তাহার দরিদ্রতার লক্ষণ দেখা গেল, তেমনি লম্বা লম্বা হাত পা, লম্বা লেজ এবং স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে তাহার ভদ্রতার আভাসও ছিল। সেই লম্বা লেজটি নাড়িয়া সে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। আমরা অল্প কয়টি লোক, আমাদের পাতের ভাতে ভাল করিয়া তাহার পেট ভরিত কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহার জন্যই সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইয়া সমস্ত রাত্রি আমাদের বাড়ীতে পাহারা দিত।

ক্রমে আর দুটি কুকুর আসিয়া জুটিল। ইহাদের একটা একটু বুনো গোছের ছিল, ভদ্রতার ধার বড় একটা ধারিত না। শিশুকালে কে তাহার লেজ কাটিয়া দিয়াছিল,

এখন তাহার তিন আঙ্গুল মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে সে ঐ তিন আঙ্গুল লেজটুকুই গুটাইয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিত। অন্যান্য কুকুরগুলির তুলনায় ইহার মনটাও একটু কুটিল ছিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমাদের সঙ্গে সে কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করে নাই।

তারপর আবার একটা মস্ত কুকুর আসিল। যত দিন কেবল আমরাই ছিলাম তত দিন তাহাকে দূরে দূরে দেখিতে পাইতাম বটে, কিন্তু সে আমাদের কাছে বড় একটা ঘেঁষিত না। কিন্তু যখন আমাদের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেরা আসিল, তখন দেখি, যে কুকুরটা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া বসিয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে সে এমনি উৎসাহ করিয়া খেলিত, যে এক দিন লাফ দিয়া তাহাদের এক জনের মাথার উপর দিয়াই চলিয়া গেল।

এই কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আসিবার পূর্ব্বে তাহাদের যথেষ্ট ভাত আর মাছ রান্না করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলাম। খাইবার সময় তিনটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল, বড় কুকুরটাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এত খাবার বোধ হয় আর কোন দিন তাহারা পায় নাই। লেজকাটা কুকুরটা অনেক ভাত দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, যে সে পারিলে সব ভাত একাই খায়। সে তাহার নিজের ভাগ পায়ে ঢাকিয়া অন্য দুটা কুকুরের ভাগ খাইতে লাগিল। কাজেই শেষটা তাহার নিজের ভাগ খাইবার-বেলা আর তাহার পেটে স্থান রহিল না।

পর দিন বড় কুকুরটা আসিয়া উপস্থিত। সে কোথায় যেন গিয়াছিল, সে অবধি তাহার কিছুই খাওয়া হয় নাই। যাহা হউক, তাহার জন্য খাবার যথেষ্ট রাখা হইয়াছিল।

সে বারে পুরীর ব্যাঙ আর উইয়ের কথা বলিয়া বলিয়াছিলান। এ বাড়ীটিতে এই দুই জন্তু দেখিতে পাই নাই। টিকটিকি আর গিরিগিটি অনেকগুলি ছিল। আমাদের বারান্দায় একটা তালপাতার বেড়া ছিল। রাত্রিতে বাহিরের বাতাস আর শীতের তাড়ায় যত গিরিগিটি আসিয়া এই বেড়ায় আশ্রয় লইত। তাহাদের ঘুমাইবার ভঙ্গীর কথা মনে হইলে এখনও আমার হাসি পায়। শরীরটাকে যত উৎকট রকমের বাঁকাইতে পারে ততই বোধ হয় উহাদের ঘুমাইবার সুবিধা। কেহ যদি দড়ির আগায় ঝুলিতে ঝুলিতে পা ঘাড়ে তুলিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া ডিগবাজী খাইবার মাঝখানে ঘুমাইয়া পড়ে, তবে হয়ত সে গিরিগিটির নিদ্রার মর্ম্ম খানিকটা বুঝিতে পারে।

পুরীর বেড়ালগুলি এ বারে আমাদিগকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছে। আমরাও যে তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে পারি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমার লাঠিটার কথা

পরলোকগত পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কহিবার শক্তি থাকিলে এ বিষয়ে তোমরা অনেক আশ্চর্য্য সংবাদ শুনিতে পাইতে। দুঃখের বিষয়, এত করিয়াও উহাদের সংশোধন হয় নাই। এরূপ নির্লজ্জ জন্তু আর বেশী আছে কি না সন্দেহ। যত মার খায়, ততই আরো বেশী করিয়া দৌরাত্ম্য করে। মারের চোটে যদি কোমরও ভাঙ্গিয়া যায়, তবুও সামনের দুপায় হিচড়াইয়া ছুট দিবে। খানিক দূর যাইতে না যাইতেই দেখিবে তাহার কোমর সোজা হইয়া গিয়াছে। আর খানিক গেলে হয়ত বেদনার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইবে। কাজেই আর বেশী দূর যাইবার পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া আসিয়া রান্না ঘরের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারিবে। সেখানে যদি কেহ থাকে, তবে হয়ত তাহাকে বলিবে "মিঞাও!"—অর্থাৎ "কি মিঞা? বড় যে মারিয়াছিলে?" আর যদি কেহ না থাকে, তবে ত বুঝিতেই পার। বল দেখি, এ মত অবস্থায় নিতান্ত সাধু মহাপুরুষ ভিন্ন সাধারণ লোকের রাগ হয় কি না?

সাধু লোকের কথায় পরলোকগত পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীব জন্তুর প্রতি অসাধারণ দয়ার কথা মনে পড়ে। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়দের নিকট এ বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি। ইতর প্রাণীরা অনেক সময় যথার্থ দয়ালু লোককে চিনিতে পারে, এবং অন্য লোক দেখিয়া তাহাদের মনে যেরূপ ভয় আর অবিশ্বাস হয়, ঐ সকল দয়ালু লোকের সম্বন্ধে তাহা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বিড়ালের জন্য দুধ রোজ করা, গরু ছাগলকে নিয়মিত আহার দেওয়া এ সকল ত তাঁহার ছিলই, ইঁদুর আরশুলাগুলি পর্য্যন্ত নাকি ক্ষুধার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত! উহারা আসিয়া তাঁহার গা খুঁটিতে আরম্ভ করিলেই তিনি বলিতেন, "ওহে, ইহাদের আহার চাই, কিছু খাইতে দাও।" খাবার দেওয়া হইলে পর উহারা সন্তুষ্ট হইয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইত। যে সাপকে আমরা দেখিবা মাত্র তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, গোস্বামী মহাশয় সেই সাপকে পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া দুধ ভাত খাওয়াইয়াছেন। একটা সাপ ধ্যানের সময় আসিয়া তাঁহার শরীর বাহিয়া উঠিত, কিন্তু কখনও কোন অনিষ্ট করিত না।

সকলের চাইতে বানরগুলি তাঁহাকে বেশী করিয়া ভালবাসিত। আব্দারও তাঁহার নিকট কম করিত না। তাঁহার গায় হাত দিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া টিপিয়া নানা উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে খাবার ত আদায় করিতই; খাবার জিনিষ মনঃপুত না হইলে আবার

আঁচড়াইয়া তাঁহাকে সাজাও দিত। তিনি ইহাতে রাগ করা দূরে থাকুক, বরং হাসিয়া বলিতেন, "ওহে, কি দিয়াছ, উহার পছন্দ হয় নাই ; ভাল জিনিষ দাও !"

বানরীগুলি তাঁহার নিকট ছানা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজে মন দিত, কিছু মাত্র সন্দেহ করিত না। এক দিন গোস্বামী মহাশয়ের পরিচিত একটা বানর তাহার বানরীকে লইয়া উপস্থিত হইল। বানরী কখন সেখানে আসে নাই, কাজেই তাহার সংকোচ বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে দরজা অবধি আসিয়া আর কাছে আসিতে চাহিল না। বানরটা আগে নানা উপায়ে তাহাকে উৎসাহ দিল। তবুও যখন সে আসিল না, তখন বানর গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতখানি টানিয়া নিজের হাতের ভিতরে লইয়া বানরীর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহাকে এই কথা জানাইল যে "দেখ, এ বড় ভাল মানুষ, কিছু করে না।" ইহার পর বানরী আর কাছে আসিতে কোন আপত্তি করিল না। গোস্বামী মহাশয় এই সকল বানরকে বুড়ো দাদা, কাণী, লেজকাটি ইত্যাদি নামে ডাকিতেন। ইহাদের অনেকে নাকি এখনও পুরীর লোকনাথের মন্দিরের কাছে বাস করে। (চৈত্র, ১৩১৩)।

হারকিউলিস

মহাভারতে যেমন ভীম, গ্রীস দেশের পুরাণে তেমনই হারকিউলিস। হারকিউলিস দেবরাজ জুপিটারের পুত্র কিন্তু তাঁর মা এই পৃথিবীরই এক রাজকন্যা ; সুতরাং তিনিও ভীমের মত এই পৃথিবীরই মানুষ, গদাযুদ্ধে আর মল্লযুদ্ধে তাঁর সমান কেহ নাই। মেজাজটি তাঁর ভীমের চাইতেও অনেকটা নরম, কিন্তু তাঁর এক একটি কীর্ত্তি এমনই অদ্ভুত যে পড়িতে পড়িতে ভীম অর্জ্জুন, কৃষ্ণ আর হনুমান এই চার মহাবীরের কথা মনে পড়ে।

হারকিউলিসের জন্মের সংবাদ যখন স্বর্গে পৌঁছিল, তখন তাঁর বিমাতা জুনো দেবী হিংসায় জ্বলিয়া বলিলেন, "আমি এই ছেলের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িব"। জুনোর কথামত দুই প্রকাণ্ড বিষধর সাপ হারকিউলিসকে ধ্বংশ করিতে চলিল। সাপ যখন শিশু হারকিউলিসের ঘরে ঢুকিল, তখন তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ঘর শুদ্ধ লোকে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, কেহ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিল না। কিন্তু হারকিউলিস্ নিজেই তাহার দুইখানি কচি হাত বাড়াইয়া সাপ দুটার গলায় এমন চাপিয়া

ধরিলেন, যে তাহাতেই তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। জুনো বুঝিলেন, এ বড় সহজ শিশু নয়।

বড় হইয়া হারকিউলিস সকল বীরের গুরু বৃদ্ধ চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গেলেন। চীরণ্ জাতিতে সেণ্টর্—তিনি মানুষ নন। সেণ্টর্‌দের কোমর পর্য্যন্ত মানুষের মত, তার নীচে একটা মাথাকাটা ঘোড়ার শরীর বসান। চীরণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া হারকিউলিস অসাধারণ যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, "এইবার পৃথিবীটাকে একবার দেখিয়া লইব"।

হারকিউলিস পৃথিবীতে বীরের উপযুক্ত কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় দুটি আশ্চর্য্য সুন্দর মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হারকিউলিস্ দেখিলেন দুটি মেয়ে—তাহাদের মধ্যে একজন খুব চঞ্চল, সে নাকে চোখে কথা কয়, তার দেমাকের ছটায় আর অলঙ্কারের বাহারে যেন চোখ ঝলসাইয়া দেয়। সে বলিল, "হারকিউলিস্, আমাকে তুমি সহায় কর, আমি তোমায় ধন দিব, মান দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইবার উপায় করিয়া দিব"। আর একটি মেয়ে শান্ত শিষ্ট, সে বলিল, "আমি তোমাকে বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ দিব, শক্তি দিব, সাহস দিব। যেমন বীর তুমি তার উপযুক্ত জীবন তোমায় দিব।" হারকিউলিস খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন. "আমি ধন মান সুখ চাই না—আমি তোমার সঙ্গেই চলিব। কিন্তু, তোমার পরিচয় জানিতে চাই"। তখন দ্বিতীয় সুন্দরী বলিল, "আমার নাম পুণ্য। আজ হইতে আমি তোমার সহায় থাকিলাম".।

তারপর কত বৎসর হারকিউলিস দেশে দেশে কত পুণ্য কাজ করিয়া ফিরিলেন—তাঁর গুণের কথা আর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। থেবিসের রাজা ক্রয়ন্ তাঁহার সঙ্গে তাঁর কন্যা মেগারার বিবাহ দিলেন। হারকিউলিস নিজের পুণ্যফলে কয়েক বৎসর সুখে কাটাইলেন।

কিন্তু বিমাতা জুনোর মনে হারকিউলিসের এই সুখ কাঁটার মত বিঁধিল। তিনি কি চক্রান্ত করিলেন, তাহার ফলে একদিন হারকিউলিস হঠাৎ পাগল হইয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র সকলকে মারিয়া ফেলিলেন। তার পর যখন তাঁহার মন সুস্থ হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পাগল অবস্থায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তখন শোকে অস্থির হইয়া এক পাহাড়ের উপরে নির্জ্জন বনে গিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন "আর বাঁচিয়া লাভ কি ?"

হারকিউলিস দুঃখে বনবাসী হইয়াছেন, এদিকে জুনো ভাবিতেছেন "এখনও যথেষ্ট হয় নাই"। তিনি দেবতাদের কুমন্ত্রণা দিয়া এই ব্যবস্থা করাইলেন যে একবৎসর সে আর্গসের দুর্দ্দান্ত রাজা ইউরিস্‌থিয়ুসের দাসত্ব করিবে।

হারকিউলিস প্রথমে এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে রাজি হ'ন নাই—কিন্তু দেবতার হুকুম লঙ্ঘন করিবার আর উপায় নাই দেখিয়া শেষে তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা ইউরিস্‌থিউস্ ভাবিলেন, এইবার হারকিউলিসকে হাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে দিয়া এমন সব অদ্ভুত কাজ করাইয়া লইব যাহাতে আমার নাম পৃথিবীতে অমর হইয়া থাকিবে।

নেমিয়ার জঙ্গলে এক দুর্দ্দান্ত সিংহ ছিল, তার দৌরাত্ম্যে দেশের লোক অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল—রাজা ইউরিস্‌থিউস্ বলিলেন "যাও হারকিউলিস্! সিংহটাকে মারিয়া আইস।" হারকিউলিস্ সিংহ মারিতে চলিলেন। "কোথায় সেই সিংহ"? পথে যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে "কেন বাপু সিংহের হাতে প্রাণ দিবে? সে সিংহকে কি মানুষে মারিতে পারে? আজ পর্য্যন্ত যে কেহ সিংহ মারিতে গিয়াছে সে আর ফিরে নাই।" কিন্তু হারকিউলিস্ ভয় পাইলেন না। তিনি একাকী গভীর বনে সিংহের গহ্বরে ঢুকিয়া সিংহের টুঁটি চাপিয়া তাহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন। তারপর সেই সিংহের চামড়া পরিয়া তিনি রাজার কাছে সংবাদ দিতে ফিরিলেন।

রাজা বলিলেন, "এবার যাও লের্ণার জলাভূমিতে। সেখানে হাইড্রানামে সাতমুণ্ড সাপ আছে, তাহার ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। জন্তুটাকে না মারিলেত আর চলে না।" হারকিউলিস তৎক্ষণাৎ সাতমুণ্ড জানোয়ারের সন্ধানে বাহির হইলেন।

লের্ণার জলাভূমিতে গিয়া আর সন্ধান করিতে হইল না, কারণ হাইড্রা নিজেই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে আকাশ কাঁপাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। হারকিউলিস একঘায়ে তাহার একটা মাথা উড়াইয়া দিলেন—কিন্তু, সে কি সর্ব্বনেশে জানোয়ার—সেই একটা কাটা মাথার জায়গায় দেখিতে দেখিতে সাতটা নূতন মাথা গজাইয়া উঠিল। হারকিউলিস্ দেখিলেন এ জন্তু সহজে মরিবার নয়। তিনি তাঁহার সঙ্গী ইয়োলাস্‌কে বলিলেন, একটা লোহা আগুনে রাঙাইয়া আনত। তখন জ্বলন্ত গরম লোহা আনাইয়া তারপর হাইড্রার এক একটা মাথা উড়াইয়া কাটা জায়গায় লোহার ছ্যাঁকা দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এত করিয়াও নিস্তার নাই, শেষ একটা মাথা আর কিছুতেই মরিতে চায় না—

সাপের শরীর হইতে একেবারে আলগা হইয়াও সে সাংঘাতিক হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে। হারকিউলিস্ তাহাকে পিটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। ফিরিবার আগে হারকিউলিস্ সেই সাপের রক্তে কতগুলা তীরের মুখ ডুবাইয়া লইলেন, কারণ তাঁহার গুরু চীরণ বলিয়াছেন—হাইড্রার রক্তমাখা তীর একেবারে অব্যর্থ মৃত্যুবাণ।

হারকিউলিস ইউরিস-থিউসের দেশে ফিরিয়া গেলে পর কিছুদিন বাদেই আবার তাঁহার ডাক পড়িল। এবারে রাজা বলিলেন "সেরিনিয়ার হরিণের কথা শুনিয়াছি, তাহার সোণার শিং, লোহার পা, সে বাতাসের আগে ছুটিয়া চলে। সেই হরিণ আমার চাই—তুমি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া আন।" হারকিউলিস আবার চলিলেন। কত দেশ দেশান্তর, কত নদী সমুদ্র পার হইয়া, দিনের পর দিন সেই হরিণের পিছন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শেষে উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে বরফের মধ্যে হরিণ যখন শীতে অবশ হইয়া পড়িল, তখন হারকিউলিস সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া রাজার কাছে হাজির করিলেন।

ইহার পর রাজা হুকুম দিলেন এরিম্যান্থাসের রাক্ষসবরাহকে মারিতে হইবে। সে বরাহ খুবই ভীষণ বটে, কিন্তু তাহাকে মারিতে হারকিউলিসের বিশেষ কোন ক্লেশ

হইবার কথা নয়। তাছাড়া, বরাহ পলাইবার পাত্র নয়, সুতরাং তাহার জন্য দেশবিদেশে ছুটিবারও দরকার হয় না। হারকিউলিস সহজেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু মাঝে হইতে একদল হতভাগা সেন্টর আসিয়া তাঁহার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া বসিল। হারকিউলিস তখন সেই হাইড্রার-রক্তমাখান বিষবাণ ছুঁড়িয়া তাহাদের মারিতে লাগিলেন। এদিকে বৃদ্ধ চীরণের কাছে খবর গিয়াছে যে "হারকিউলিস নামে কে একটা মানুষ আসিয়া সেন্টরদের মারিয়া শেষ করিল"। চীরণ তখনই ঝগড়া থামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ হারকিউলিসের একটা তীর ছুটিয়া তাঁহার গায়ে বিঁধিয়া গেল। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল, হারকিউলিসও অস্ত্র ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেন্টরেরা অনেক রকম ঔষধ জানে, হারকিউলিসও তাঁহার গুরুর কাছে অস্ত্রাঘাতের নানারকম চিকিৎসা শিখিয়াছেন—কিন্তু সে বিষবাণ এমন সাংঘাতিক, তাহার কাছে কোন চিকিৎসাই খাটিল না। চীরণ আর বাঁচিলেন না। এবার হারকিউলিস তাঁহার কাজ সারিয়া নিতান্ত বিষণ্ণমনে গুরুর কথা ভাবিতে ভাবিতে দেশে ফিরিলেন।

হারকিউলিস একা সেন্টরদের যুদ্ধে হারাইয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলে বলিল "হারকিউলিস না জানি কত বড় বীর! এমন আশ্চর্য্য কীর্ত্তির কথা আমরা আর শুনি নাই"। আসলে কিন্তু হারকিউলিসের বড় বড় কাজ এখনও কিছুই করা হয় নাই—তাঁর কীর্ত্তির পরিচয় সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অলঙ্কারের কথা

সুন্দর শরীরটিকে সাজাইয়া আরও সুন্দর করিব, মানুষের এই ইচ্ছাটি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু শরীরটি কি রকম হইলে যে ঠিক সুন্দর হয়, আর কেমন করিয়া সাজাইলে যে তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে, এ বিষয়ে নানা জাতির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী মেয়ে বলিতে আমরা যা বুঝি আফ্রিকার বাসুটো বা হটেন্টট্ জাতির কাছে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তাহারা হয়ত আমাদের নিতান্তই বেয়াকুব ঠাওরাইবে।

যে ছেলেটা একেবারে ধ্যাপ্‌সা মোটা, আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাকে পাইলে প্রশংসা করা দূরে থাকুক, বরং তাহাকে খ্যাপাইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু

অষ্ট্রেলিয়ার কাছে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে যে সব অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদের অনেকের মধ্যে মোটা হওয়ার সখটা খুবই বেশী। বিশেষত ছেলে পিলেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে মোটা না হয়, তবে বাপ মায়ের আর দুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদের চাইতে আবার মেয়েদের মোটা হওয়াটা আরও বেশী দরকার। যে সহজে মোটা হয় না তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইবার এবং ঘরে বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাকে কোন রকম কাজকর্ম্ম করিতে দেওয়া হয় না, পাছে সে খাটিয়া রোগা হইয়া পড়ে!

আফ্রিকার মূর জাতি এবং পারস্য তুরস্ক ও আমেরিকার কোন কোন জাতির পছন্দটা ঠিক ইহার উল্টা। সেখানে মেয়েরা যে যত রোগা হইতে পারে ততই তার কদর বেশী। তাহারা কত কষ্টে কত সাবধানে আহার কমাইয়া নানারকম পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া চলে। একটু মোটা হইবার লক্ষণ দেখা দিলে তাহাদের ভাবনা চিন্তার আর সীমা থাকে না।

চীন দেশে পা ছোট করিবার জন্য মেয়েরা কত যন্ত্রণা সহ্য করে, তাহা তোমরা বোধ হয় জান। তাহারা ছেলেবেলা থেকেই মুড়িয়া বাঁধিয়া পাগুলাকে এমন অস্বাভাবিক অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিয়া ফেলে যে দেখিলে আতঙ্ক হয়। আবার এমন জাতিও আছে যাহারা হাঁটুর নীচে তাগা আঁটিয়া পাটাকে জন্মের মত ফুলাইয়া দেয়, আর মনে করে পায়ের চমৎকার শোভা বাড়িয়াছে!

অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতি চ্যাপ্টা নাকের ভারি ভক্ত। সে দেশের মায়েরা নাকি খোকাখুকীদের নাকের ডগাগুলি প্রতিদিন চাপিয়া চাপিয়া অল্পে অল্পে দমাইয়া দেয়। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের নাক দেখিয়া তাহারা ভারি নাক সিট্‌কায়, আর বলে যে, "ইহাদের বাপ মায়েরা নিশ্চয় ছেলেপিলেদের নাক ধরিয়া টানাটানি করে, নহিলে নাকগুলা এমন বিশ্রী রকম বাড়ে কি করিয়া!"

উত্তর আমেরিকার "রেড্ ইণ্ডিয়ান"দের মধ্যে চ্যাপ্টা কপালের ভারি খাতির। তাহারা ছেলেবেলায় কপালে এমন ভাবে পট্টি বাঁধিয়া রাখে যে কপালটি বন-মানুষের কপালের মত চ্যাপ্টা ও ঢালু হইয়া দাঁড়ায়।

কাণটা মাথার পাশে লাগিয়া থাকিবে, কি বাদুড়ের মত আল্‌গা হইয়া থাকিবে এ বিষয়েও মত ভেদ দেখা যায়। সুতরাং দেশ বিশেষে ও জাতি বিশেষে কাণের উপরেও নানারকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলির কৌশল খাটান হয়। শরীরটিকে এই রকমে যতটা সম্ভব গড়িয়া পিটিয়া কোন রকমে পছন্দ সই করিতে পারিলে তারপরেও তাহাকে

সাজাইবার দরকার হয়। সাজাইবার সব চাইতে সহজ উপায় তাহাতে রং মাখান। এই রং লেপিবার সখটি অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় এবং তাহার রকমারিও অনেক প্রকারের। লাল হলদে সাদা এবং কালো, সাধারণতঃ এই কয় রকম রঙেই সব কাজ চলিয়া থাকে। এই সকল রঙে সমস্ত দেহখানি চিত্র বিচিত্র করিয়া আঁকিলে দেখিতে কেমন সুন্দর হয় বল দেখি? কেবল যে সৌন্দর্য্যের জন্যই রং লাগান হয় তাহা নয়, অনেক দেশে লড়াইয়ের সময় বড় বড় যোদ্ধারা নানা রকম রং লাগাইয়া অদ্ভুত বিকট চেহারা করিয়া বাহির হয়। রং লাগাইবার কায়দা কানুন আবার এমন হিসাব মত যে তাহাতে জাতি ব্যবসায় বংশ প্রভৃতি সমস্ত পরিচয়ই দেওয়া হয়।

কিন্তু রঙের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে জীবন্ত চামড়ার উপর তাহাকে পাকা করিয়া মাখান চলে না। স্নান করিতে গেলেই বা বৃষ্টিতে ভিজিলেই সমস্ত ধুইয়া যায়— সুতরাং যাহাদের সখ বেশী তাহারা কাঁচা রং ছাড়িয়া উল্কি আঁকিতে সুরু করিল। উল্কি আঁকা এক বিষম ব্যাপার। শরীরের মধ্যে ক্রমাগত ছুঁচ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া চামড়ার ভিতরে ভিতরে রং ভরিয়া তবে উল্কি আঁকিতে হয়। সৌখিন লোকেরা অল্পে অল্পে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর, এইরূপে শরীরকে রীতিমত যন্ত্রণা দিয়া উল্কি রচনা করে। উল্কি আঁকার ওস্তাদ যাহারা, লোকে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তাহাদের কাছে উল্কি আঁকাইতে যায়। মারকোয়েসাস দ্বীপের রাজা বা সর্দ্দারের একটা ছবি দেওয়া হইল—এই লোকটার সর্ব্বাঙ্গে উল্কি করা। ছেলে বেলা হইতে এই উল্কি আঁকা সুরু হইয়াছে, সমস্তটা আঁকিতে প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া উল্কিওয়ালা নিয়ম মত আসিয়াছে আর অল্পে অল্পে উল্কি ফুটাইয়া তুলিয়াছে! উল্কির কাজ অনেক দেশেই প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীদের মত কারিকর আর বোধ হয় কোথাও দেখা যায় না।

উল্কির অসুবিধা এই যে গায়ের রংটা নিতান্ত ময়লা হইলে তাহার উপর উল্কি ভাল খোলে না। সুতরাং আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে বিশেষত কঙ্গো অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে এবং আরও অনেক দেশের কৃষ্ণবর্ণ লোকেদের মধ্যে উল্কির প্রচলন নাই। তাহাদের

মধ্যে উল্কির বদলে একরকম ঘা-মরা দাগের ব্যবহার দেখা যায়, সে জিনিষটা উল্কির চাইতেও সাংঘাতিক। প্রথমত শরীরে অস্ত্র খোঁচাইয়া বড় বড় ঘা বানাইতে হয়, তারপর নানারকম উপায়ে সেই তাজা ঘাগুলিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত জিয়াইয়া রাখিতে হয়। এত রকম কাণ্ড কৌশলের পর শেষে ঘা যখন শুকাইয়া উঠে তখন উঁচু উঁচু দাগের মত তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যের খাতিরেই স্ত্রী পুরুষ সকলে সখ করিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করে! ছবিতে দেখ উত্তর কঙ্গোপ্রদেশের এই সৌখিন লোকটি কেবল মুখভরা ঘা খোঁচাইয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই আবার দাঁতগুলিকেও উকা ঘষিয়া পেরেকের মত সরু ও ছুঁচাল করিয়াছে। শুনিয়াছি ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন সৌখিন মেম সাহেব দাঁতের মধ্যে ফুঁটা করিয়া তাহাতে হীরা মুক্তা বসাইয়া অলঙ্কারের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে অলঙ্কারের সখটা মানুষের এক অদ্ভুত খেয়াল বলিয়া মনে হয়। রসায়নশাস্ত্রে বলে হীরা আর কয়লা, এ দুইটা আসলে একই জিনিষ। যে মুক্তার এত আদর সেই মুক্তাও একটা পোকার রস ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্য দেশে সোণা রূপা দিয়া অলঙ্কার গড়ে, কিন্তু অনেক দেশে তামা লোহা দস্তা শীসা পর্য্যন্ত অলঙ্কার হিসাবে চলিয়া যায়। প্রবাল, নুড়ি, শঙ্খ, কড়ি, হাতীর দাঁত, হাঙ্গরের দাঁত, মানুষের হাড়, পাখীর পালক, সমুদ্রের শ্যাওলা, কাঁচের পুঁথি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ফলের বীচি, ফুল, পাতা, কাঠ—এমন কি জোনাকি পোকা বা জীবন্ত পাখী ও কচ্ছপ পর্য্যন্ত দেশ হিসাবে অলঙ্কার বলিয়া আদর পাইয়া থাকে! কিন্তু যত রকম আশ্চর্য্য অলঙ্কারের কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে যেটি আমার কাছে সব
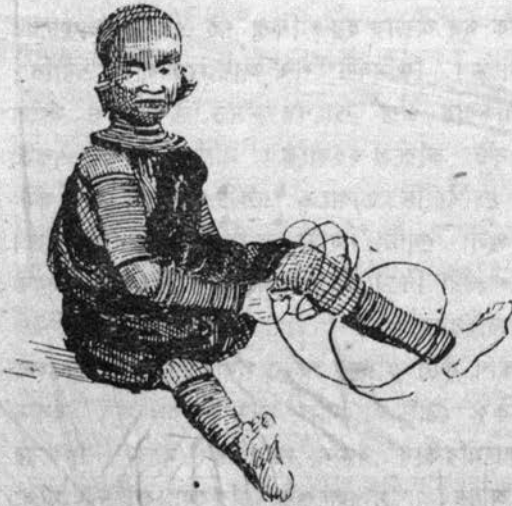
চাইতে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে, সেটি হচ্ছে—টেলিগ্রাফের তার! প্রথম যখন পূর্ব্ব আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা টেলিগ্রাফের নূতন পূরাতন তারগুলি খুব কিনিত তখন তাহার কারণ বুঝা যায় নাই। পরে দেখা গেল, ঐ তারগুলিকে তাহারা মজবুত করিয়া হাতে বা পায়ে প্যাঁচাইয়া সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত সৌখিন, তাহারা হাত পা ও গলা একেবারে তারে ঢাকিয়া ফেলে। কেহ কেহ এমন মজবুত করিয়া তার বাঁধে যে গায়ের চামড়ায় একেবারে স্ক্রূর মত দাগ বসিয়া যায়। বর্ম্মাতে কোন কোন জায়গায় মেয়েরা গলায় এমন করিয়া তার জড়ায় যে তাহাতে গলা অস্বাভাবিক রকম লম্বা হইয়া পড়ে।

গলার অলঙ্কারের কথা বলিতে গেলে কঙ্গোপ্রদেশের আরেক জাতির কথা মনে পড়ে। তাদের মেয়েরা গলায় গোল যাঁতার মত পিতলের হাঁসুলি পরে, সেগুলি যত বড় আর যত ভারি হয় ততই লোকে বেশী করিয়া বাহবা দেয়। তাহার এক একটা প্রায় আধমণ পর্য্যন্ত ভারি হইতে দেখা গিয়াছে!

তারপর নাক কাণের কথা আর বেশী কি বলিব। আমাদের দেশেই এক এক সময় নথ বা মাকড়ির যেরকম উৎকট চেহারা হয়, তাহা দেখিয়া বিদেশী কেহ যদি হাসে, তবে সেটা কি খুব অন্যায় হয়? কিন্তু এই একটি অলঙ্কারের চেহারা দেখ ত। জিনিষটি শঙ্খ আর লোহার তৈয়ারি; এটিকে ঝুলাইবার জন্য কাণের নীচে উপরে ও মাঝে অনেকগুলা ফুঁটা করিতে হইয়াছে। নাকের গহনার একটা অদ্ভুত ছবি দেখিয়াছি তাহাতে একটি মেয়ের নাক ফুঁটা করিয়া কতগুলা মোটা মোটা কাঠি বসান হইয়াছে। কাঠিগুলা শিকারী বিড়ালের গোঁফের মত মুখের দুই দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে।

নাক কাণ ফুঁটা করিয়া গহনা পরা এদেশে সকলেই দেখিয়াছ, কিন্তু ঠোঁট বা গাল ফুঁড়িয়া অলঙ্কার বসান কোথাও দেখিয়াছ কি? দক্ষিণ আমেরিকার বামন জাতির মধ্যে উপরের ঠোঁটে আঁংটি গাঁথিবার প্রথা চলিত আছে। গ্রীণলণ্ডের এস্কিমো জাতির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন স্থানে তলার ঠোঁট চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঠের

চাক্‌তি গুঁজিয়া রাখা হয়। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ঠোঁট বা গাল ফুঁটা করিয়া তাহাতে হাতীর দাঁতের ছিপি বসাইবার দস্তুর আছে। সৌন্দর্য্যের জন্য লোকে এত কষ্টও সহ্য করে!

এখন চুলের কথা বলিয়া শেষ করি। নানা ফ্যাসানের চুল ছাঁটা, টেরি কাটা, বাবড়ি রাখা, ঝুঁটি বাঁধা, এসব ত আমরা সর্ব্বদাই দেখি। কিন্তু কোন মেয়ে যদি মাথায় আঠা লেপিয়া, চুলগুলিকে দড়ির ছড়ের মত ঝুলাইয়া তাহার উপর লাল রং মাখাইয়া আসে, তবে সেটা কেমন দেখাইবে? কিম্বা যদি মাথায় চূণকাম করিয়া চুলগুলাকে একেবারে ইঁটের মত চাকা বাঁধিয়া রাখে, তাহলেই বা কেমন হয়? আফ্রিকাদেশে অনেক জায়গায় এরকম জিনিষ অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়।

হাবা গবা

হাবা-গবা দুই ভাই বাপ মায়ের আদুরে ছেলে। দুজনেই বেশ লম্বা চওড়া, মাথায় সুন্দর কোঁকড়ান চুল;—দেখ্‌তে অনেকটা একই রকম। কিন্তু স্বভাব ছিল দুজনের ঠিক উল্টা রকম;—গবা ছিল রাগী, হিংসুটে আর স্বার্থপর, আর হাবা ছিল ঠাণ্ডা, খোলা মন আর নিতান্ত ভাল মানুষ। তাদের বাবা বুড়ো হয়েছেন; আর খাট্‌তে পারেন না;—কাজেই তাঁর ইচ্ছা হ'লো যে ছেলেরা নিজে উপার্জ্জন ক'রে তাঁর সাহায্য করুক। তাই তিনি এক দিন গবাকে ডেকে বল্‌লেন, "বাবা গবা, আমি তো বুড়ো হয়েছি, এখন তুমি নিজে উপার্জ্জন ক'রে আমাকে সাহায্য না কর্‌লে, আর তো আমি পারি্‌না।" এই ব'লে তিনি গবাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, সঙ্গে কিছু খাবার টাবার দিয়ে, তাকে চাকরীর খোঁজে পাঠালেন।

গবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে মনে মনে ভাব্‌ল, "বেশ মজা হ'লো। এখন বাড়ী ছেড়েছি—আর কাজ কর্‌তে হবে না। কেবল খাও দাও গান গাও আর স্ফূর্ত্তি কর।" এই ব'লে সে রাস্তা দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিছু দূর গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় সে আরাম ক'রে খেতে বস্‌ল। কতগুলো পিঁপড়ে অর হাতে উঠে এসে বল্‌ল, "আমাদের একটু খেতে দাও না ভাই।" গবা

গিয়ে পিঁপ্‌ড়েগুলোকে হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। পিঁপ্‌ড়েরা বল্‌ল, "আচ্ছা দেখা যাবে; তুমি যেমন আমাদের খেতে দিলে না, তেম্‌নি তোমার দরকারের সময় আমরাও তোমার সাহায্য কর্‌ব না।" গবা বল্‌ল, "এই টুকু পিঁপ্‌ড়ে, তার আবার কথা শোন না!" এই ব'লে সে চল্‌তে লাগ্‌ল। যেতে যেতে সে একটা নদীর ধারে কাদার উপর একটা মাছ দেখ্‌তে পেল;—বেচারা জলের থেকে তীরে এসে প'ড়ে হাঁপাচ্ছে। গবাকে দেখে সে বল্‌ল, "আমায় জলে ফেলে দাও না ভাই। না হ'লে যে আমি মরেই যাব।" গবা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাকে এক লাথি মেরে চ'লে গেল। কিন্তু মাছটা কোনমতে জলে লাফিয়ে প'ড়ে বল্‌ল "যেমন দুষ্টু তেমন কষ্ট পাবে তুমি। তোমার দরকারের সময় কোন মাছ তোমার সাহায্য কর্‌ব না।" গবা মাছের কথায় কাণ না দিয়ে সোজা রওনা হ'ল।

খানিক দূর গিয়ে একটা চৌমাথায় এসে দেখ্‌ল কতকগুলো ছোট মানুষ ঘুঁষি বাগিয়ে, মুখ ভেঙ্‌চিয়ে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ ক'রেছে। গবা তাদের দেখে কোন কথা জিজ্ঞাসা না ক'রেই বা মারামারি থামাবার চেষ্টা না ক'রেই, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তাদের মাঝখান দিয়ে চ'লে গেল। এই ব্যাপার দেখে ছোট্ট মানুষেরা এত চ'টে গেল যে তারা ঝগড়া থামিয়ে গবার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চোখ পাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের একজন বল্‌ল, "তুমি ভারি স্বার্থপর; কোন দিন তোমার কোন উন্নতি হবে না।"

তাদের কথাই ঠিক হ'লো; কারণ গবা অনেক দেশ ঘুরে, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌ল বটে, কিন্তু কিছুতে তার উন্নতি হ'লো না। শেষটায় তাকে পেটের দায়ে আবার দেশে ফিরে আস্‌তে হ'লো। তার মা সব কথা শুনে খুব কাঁদলেন কিন্তু তিনি গবাকে কিছু বল্‌লেন না। বাবার কাছ থেকে এর জন্য কিন্তু সে খুবই বকুনি খেল। তারপর হাবার যাবার পালা। যাবার সময় সে তার বাবাকে বল্‌ল, "ভয় নাই বাবা আমি যদি নিজের জন্য কিছু নাও কর্‌তে পারি; তবু তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব"।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হাবা একটা গাছের নীচে ছায়া দেখে সেখানে ব'সে পড়ল, আর একখানা রুটি বের করে খেতে আরম্ভ কর্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পাল পিঁপড়ে এসে তাকে ঘিরে ফেল্‌ল। তাদের একজন বল্‌ল, "আমাদেরও যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে ভাই; দাও না কিছু খেতে।" হাবা তাদের কথা শুনেই খুব বড় এক টুকরো রুটি তাদের খেতে দিল; পিঁপ্‌ড়েরাও খুব খুসী হয়ে বল্‌ল, "তুমি তো বেশ লোক ভাই;

তোমার বিপদের সময় আমরা তোমায় প্রাণপণে সাহায্য করব। যখন দরকার হয়, এই ঢিপির কাছে এলেই আমাদের দেখা পাবে। হাবাও খুসী হয়ে তাদের অনেক ধন্যবাদ দিল।

রুটি খাওয়া হয়ে গেলে সে আবার পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূর গিয়ে আবার দেখ্‌তে পেল যে একটা মাছ নদীর ধারে ডাঙার উপর প'ড়ে হাঁপাচ্ছে;—জলে ছেড়ে না দিলে সে হয় তো ম'রেই যাবে। দেখেই হাবার বড় দয়া হ'লো, আরসে মাছটাকে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিয়ে নদীর জলে ছেড়ে দিল। মাছও জলে থেকে বল্‌ল, "তুমি তো বড় ভাল লোক ভাই। যদি কোনদিন বিপদে পড়, মাছেদের ডেকো; তা'রা নিশ্চয় তোমার সাহায্য করবে।

হাবা একটু হেসে মাছকে ছেড়ে রওয়ানা হ'লো, কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই সে সরুগলার চেঁচামেচি শুনে, তাড়াতাড়ি সে দিকে গেল। গিয়ে দেখে একদল ছোট্ট মানুষ ঘুঁষোঘুঁষি মারামারি

আরম্ভ করেছে। হাবা তাড়াতাড়ি তাদের মাঝে গিয়ে বল্‌ল, "ঝগড়া ক'রে কি হবে ভাই? এস সবাই রাগ ভুলে গিয়ে মিলে মিশে ফূর্ত্তি করি। ছোট্ট মানুষের সঙ্গে আমার বড় আলাপ করতে ইচ্ছা করছে ভাই।"

অমনি তারা সবাই ঝগড়া ঝাঁটি ছেড়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল, আর বল্‌ল, "ভাই, আমরা সবাই তামাসা ক'রে ঝগড়া করছিলাম। তুমি বড় ভাল মানুষ ভাই। তোমার দরকারের সময় আমাদের ডেকো; তোমার যথেষ্ট সাহায্য কর্‌ব আমরা।"

হাবা তাদের ধন্যবাদ দিয়ে, আবার রওয়ানা হ'লো। চল্‌তে চল্‌তে সে এক দেশে এল, সে দেশের লোকের মুখে আর হাসি নাই; তারা সকলেই বিষণ্ণ। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করায় তা'রা বল্‌ল, "এ দেশের রাজকন্যাকে ডাইনীতে ধ'রেছে। দিন দিন তিনি রোগা হয়ে যাচ্ছেন; আর বেশীদিন বাঁচ্‌বেন না। যে তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে তাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য দেবেন, আর রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন তার। কিন্তু উদ্ধার কর্‌তে যে না পার্‌বে, ডাইনীর হাতে তার মৃত্যু নিশ্চয়।"

হাবা সে কথা শুনেই রাজবাড়ী গিয়ে হাজির হয়ে বল্‌ল, "আমি ডাইনীর হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার কর্‌ব।" রাজামশাই হাবাকে দেখে বল্‌লেন, "ডাইনীর হাতে তো তোমার মরণ নিশ্চয়ই। তবে যখন তোমার নিতান্ত ইচ্ছা তখন একবার চেষ্টাই ক'রে দেখ।"

রাজকন্যা দেখ্‌তে যেমন সুন্দরী, গুণেও তেমনই। কিন্তু তা' হ'লে কি হয়? ডাইনী তাকে সাপ দিয়ে গেছে যে, "যতদিন না আমার তিনটে কাজ করিয়ে দিতে পারিস্‌, ততদিন পর্য্যন্ত তুই কেবল শুখিয়ে যেতে থাক্‌বি। তোর ক্ষিদে হবে না, মনে ফূর্ত্তি হবে না,—তোদের রাজ্যের কারো মনে সুখ থাক্‌বে না। যে আমার কাজ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, সে যদি না পারে, তবে নিশ্চয় ম'রে যাবে; আর যদি সে পারে, তবে আমি মর্‌ব।" এই ব'লে সে কাজগুলি কি রকম তা' বলে, সেখান থেকে চ'লে গেল—আর এল না।

সেই থেকে কত লোক যে ডাইনীর দেওয়া কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে তার ঠিকানাই নাই। রাজকন্যাও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন; রাজা প্রজা কারও মনে শান্তি নেই।

হাবা তো খুব সাহস ক'রে রাজকন্যার কাছে গিয়ে বল্‌ল যে সে ডাইনীর দেওয়া কাজ কর্‌তে চায়। রাজকন্যা তাকে অনেক বারণ কর্‌লেন, সে কিছুতেই শুন্‌ল না।

তখন রাজকন্যা বল্‌লেন, "প্রথম কাজটি হচ্ছে ;—এই যে থলির মধ্যে সর্‌ষে আর বালি মেশান রয়েছে, এর প্রত্যেকটি দানা বেছে, কাল সকালের মধ্যে বালি আর সর্‌ষে আলাধা ক'রে ফেল্‌তে হবে।"

সাহসের কাজ বা পরিশ্রমের কাজ যতই কঠিন হোক, হাবা তা করতে রাজি ; কিন্তু এ যে তার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। হাবা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল। কিছুক্ষণ বাদে সে দেখ্‌ল যে কতগুলো পিঁপ্‌ড়ে তার গা বেয়ে উঠ্‌ছে আর বল্‌ছে, "হাবা! তোমার কোন ভয় নেই। আমরা মিলে তোমার সর্‌ষে আর বালী বেছে দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও গিয়ে। যে ঘরে সেই সর্‌ষে আর বালী মেশান বস্তা ছিল, হাবা তার পাশের ঘরে শুয়ে রইল, কিন্তু তার আর ঘুম হ'লো না। সে উঁকি মেরে দেখ্‌ল যে কোটি কোটি পিঁপড়ে এসে মুখে ক'রে সেই সর্‌ষে আর বালী নিয়ে আলাধা ক'রে রাখ্‌ছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ শেষ হয়ে গেল!

রাজকন্যা ভোরের বেলায় এসে যখন দেখ্‌লেন যে প্রথম কাজটি হ'য়ে গেছে, তখন তিনি একটু হাস্‌লেন ;—ডাইনীর শাপের পর এই তাঁর প্রথম হাসি। তারপর হাবাকে তিনি বল্‌লেন, "এবারে দ্বিতীয় কাজটি কর্‌তে হবে। কাল ভোর হবার আগে পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় যে মুক্তো, সেটি আমার কাছে এনে দিতে হবে।"

একাজটি কি ক'রে করা যায় এই ভাবতে ভাবতে হাবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটা নদীর ধারে এসে সে শুন্‌তে পেল, একটা মাছ তাকে বল্‌ছে, "তোমার মনে নেই ভাই, আমরা তোমার বিপদের সময় সাহায্য কর্‌ব ব'লেছিলাম? সমুদ্রের তলায় যত মুক্তা আছে সব দেখে আমরা সকলের চেয়ে বড় মুক্তোটা তোমাকে এনে দিচ্ছি ; তোমার কোন ভয় নেই।" এই বলে মাছ চ'লে গেল ; হাবাও সেই গাছের নীচে ঘুমিয়ে রইল।

ভোর হবার আগেই সেই মাছ পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড এক মুক্তো মুখে ক'রে এনে হাবাকে দিল। সে রকম আশ্চর্য্য মুক্তো কেউ কখনও দেখেনি। হাবা সেই মুক্তো নিয়ে রাজকন্যাকে দিতেই তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্‌লেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার গায়ের জোর এত কমে গেছিল, কিন্তু এখন হঠাৎ আবার প্রায় আগের মত বোধ কর্‌ছি।" এবার তৃতীয় কাজটি কর্‌তে পার্‌লেই হয় ; কিন্তু সেটা বড়ই শক্ত। মাটির ভিতর কতশত হাত নীচে গোলকধাঁধার মত রাস্তা দিয়ে ইঁদুরের রাজা বাড়ী করেছেন। কোথায় সে বাড়ী কেউ জানে না। সে বাড়ীর বাগানে একটামাত্র গোলাপ গাছ,

তা'তে একটামাত্র ফুল ফুটেছে। সেই ফুল কাল সকালের আগেই এনে দিতে হবে।"

হাবা তখনই ফুলের খোঁজে বের হ'লো। চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে হয়রান হ'য়ে পড়েছে, এমন সময় সেই ছোট্ট মানুষদের সঙ্গে তার দেখা হ'লো। তারা হাবাকে বল্‌ল, "কি হয়েছে ভাই ? অত গম্ভীর হয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে কোথায় চ'লেছ ? আমাদের বল, দেখি আমরা তোমার সাহায্য কর্‌তে পারি কি না।" হাবা তাদের সব কথা বল্‌ল ; শুনে তারা হেসে বল্‌ল "এই কাজ ? এর জন্য এত ভাবনা কিসের ? তুমি ঘুমিয়ে থাক, আমরা তোমার ফুল এনে দিচ্ছি"। এই ব'লে তারা ইঁদুরের রাজার বাগান খুঁজবার জন্য হৈ হৈ ক'রে ছুটে চল্‌ল। আর যেখানে যে গর্ত্ত দেখ্‌ল, তার মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। হাবা সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে রইল।

ভোর হবার আগেই তাদের একজন লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে একটা টক্‌টকে লাল গোলাপ ফুল হাবাকে এনে দিল। এমন সুন্দর গোলাপ কখনও দেখা যায় না ; যেমন তার চেহারা, তেমনই সুন্দর গন্ধ তার।

সেই ফুল নিয়ে হাবা রাজকন্যার হাতে দিতেই কোত্থেকে সেই দুষ্টু বুড়ী ডাইনী চীৎকার ক'রে এসে হাজির হ'লো। তা'র মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ; সে আর চল্‌তেই পার্‌ছে না। হাবাকে দেখেই সে রাগে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কর্‌তে কর্‌তে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যাও ভাল হয়ে গেলেন ; রাজ্যের লোকের মুখেও আবার হাসি দেখা দিল।

তারপর কত ধূমধাম ! হাবাকে রাজপোষাক পরিয়ে, রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হলো ; আর কত যে খাওয়া দাওয়া, বাজনা, ঘটা হ'লো, সে কি আর বল্‌ব ! হাবার মা বাবাও বিয়েতে এসে এত টাকা কড়ি, জিনিষ পত্র পেয়ে গেলেন, যে তাই দিয়ে তাঁদের চিরদিন সুখে কেটে গেল।

শ্রীসুবিনয় রায়।

কুমীরের জাতভাই

টিকটিকি গিরগিটি বহুরূপী তক্ষক গোসাপ এঁরা সকলে হ'লেন কুমীরের জ্ঞাতিবর্গ। পৃথিবীর যেকোন দেশে যাও এঁদের কোন না কোনটির সাক্ষাৎ পাবেই, কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সব সময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে ক'রো না। প্রমাণস্বরূপ এই ছবিখানা দেখ। অষ্ট্রেলিয়ার এই কাঁটাওয়ালা ভীষণমূর্ত্তি জানোয়ারটি যে নিতান্ত নিরীহ গিরিগিটি মাত্র একথা আগে থেকে না জানলে কি কেউ বুঝতে পারতে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে হয়, তাহ'লে অনেকেই হয়ত বেচারীর উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্ম্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপরে এরা প'ড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখী দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয় এদের প্রধান খাদ্য পিঁপ্‌ড়ে। সব চাইতে আশ্চর্য্য এই যে, এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটিকে ছেড়ে

দাও, তবে দেখ্তে দেখ্তে এর গায়ের চামড়ায় সমস্ত জল শুষে নেবে। শুক্‌নো বালিতে থাকে কি না, সব সময়ে ত স্নানের স্মবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেকদিনের মত জল বোঝাই ক'রে নেয়।

এবারের রঙিন্ ছবিতে দেখ কতগুলা গিরগিটি জাতীয় জন্তুর চেহারা দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে গাছের ডালের নীচে সবুজ রঙের জন্তুটি মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙ্গুলগুলি আর গায়ে রঙের বাহার। তার উপরেই গাছের ডালে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। তার সমস্ত গায়ের রং সে চট্‌পট্ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মত সবুজ রং, হয়ত এক মিনিট বাদেই দেখবে ওই ছবির মত ফ্যাকাসে! তারপর ঘুরে এসে দেখ, শুক্‌নো পাতার রং কিম্বা শীসার মত ময়লা। বহুরূপীর চালচলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হ'লে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে; হয়ত একটা পা অর্দ্ধেকখানা তুলে পাঁচ মিনিট চুপ ক'রেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না ফেলবে এর জন্য তার কত হিসাব আর কত ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও এ কথা বিশ্বাস করত—যে বহুরূপীরা শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে! এ রকম বিশ্বাসের কারণ এই যে বহুরূপী একেত খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চটপট শেষ হয়ে যায় যে একটু ঠাওর ক'রে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা; সেই জিভটি তীরের মত ছটকিয়ে পোকা মাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরী লাগে।

বহুরূপীর আর একটি অদ্ভুত জিনিষ তার চোখ দুটি। বড় বড় চোখ দুটি, এমন ভাবে তৈরী যে একবার চোখ পাকলেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙ্গা এবং আকাশের প্রায় সবখানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটা চোখ একেবারে আল্‌গাভাবে গাঁথা; একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর একটা হয়ত ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘর বাড়ী গাছ পালা সব তদ্বির করছে!

বহুরূপীর পিছনে, ছবির কোণের দিকে, বৃদ্ধ জরদ্গবের মত জন্তুটি আমেরিকার গেছো-গিরগিটি। গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায়

গলকম্বল, পিঠে সংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোন কোনটার গায়েমাথায় বড় বড় আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপজাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এসিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। "হিংস্র" বল্‌তে যা বুঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয় কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে "কচ্ছপের কামড়," সাহেবেরা বলেন "বুল্‌ডগের কামড়"—কিন্তু গোসাপ খেপ্‌লে পরে
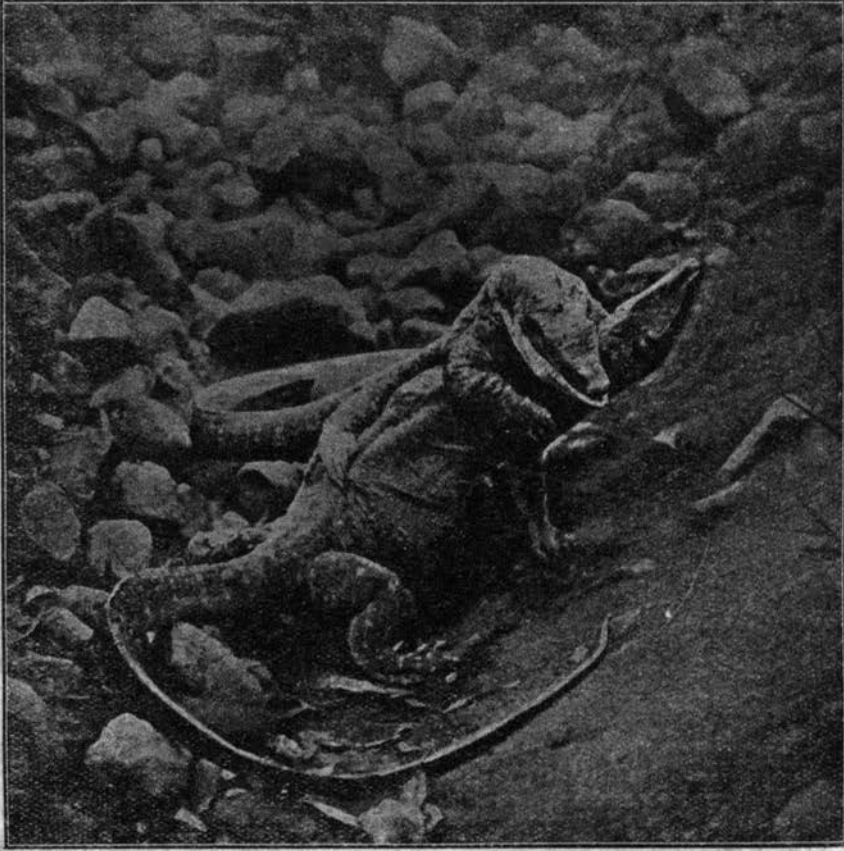
তার কামড় ছাড়ানও বড় কম শক্ত নয়। এই ছবিতে দেখ অষ্ট্রেলিয়ার ছুটো গোসাপ

লড়াই করছে, তার ফটো নেওয়া হয়েছে। ছবি যখন তোলা হয়, তখন সবে রক্তপাত আরম্ভ হ'চ্ছে—তারপর দেখতে দেখতে আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি ক'রে, মাংস ছিঁড়ে, রক্ত মেখে, দুটার অবস্থা এমন ভীষণ হ'য়ে উঠ্‌ল যে তাদেব গুলি ক'রে মেরে তবে ঝগড়া মিটাতে হয়েছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে যে গিরগিটিটাকে খুব বড় করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হ'য়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু কিছু তফাৎ আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বাগোছের, আর তার জিভটা সাপের মত চেরা, চল্‌তে ফিরতে লক্‌লক্ করে। গোসাপেরা আমিষখোর, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাং, পাখী, এই সব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয়খাদ্য নাকি কুমীরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙ্গায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলা চ্যাটাল হয়। যে সব গোসাপ কেবল শুক্‌নো ডাঙ্গায় বা গাছে থাকে তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মত গোল।

রঙিন্ ছবিতে আরও দুটা জন্তুর ছবি আছে তাদের কথাও বলা দরকার। একেবারে সাম্‌নে মাটির উপরে যে জন্তুটা দেখছ, যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হ'চ্ছে মেক্সিকোর "বীভৎস গিলা" (Gila monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোট ছোট পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আল্‌গাই হয় না—তাকে সাপের মত এঁকে বেঁকে মাটি ঘষে চল্‌তে হয়। ছোট্ট দুটি চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট্ ক'রে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। হ্রস্ব ভেড়ার মত ল্যাজটি চর্ব্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্ব্বি সমস্ত শরীরে শুষে গিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিষটা ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ কর তবে দেখবে ঠিক সাপের মত তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোট খাট জন্তু বা পাখী ত মরেই, মানুষ পর্য্যন্ত মারা গেছে ব'লে শোনা যায়।

এই জন্তুটার পিছনেই দেখ একটা অদ্ভুত গিরগিটি রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন্ ছাতার মত দেখ্‌ছ, ওটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চারিদিকে পর্দ্দার মত ঝুলান থাকে কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মত ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুণের মত চোখ, তার উপর ঐ রকম ধারাল দাঁত আর টক্‌টকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফেঁস্ ফেঁস্ শব্দ ক'রে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হ'য়ে বেশ রীতিমত ছুটতে পারে। ল্যাজশুদ্ধ এক একটা প্রায় দুহাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ী অষ্ট্রেলিয়ায়।

মালায়দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর এক রকম গিরগিটি আছে তাকে "উড়ুক্কু গিরগিটি" বলা যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুঁটো ক'রে দুপাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো পাৎলা পর্দ্দার মত চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দ্দাটাকে পাখার মত ছড়িয়ে এরা একগাছ থেকে আর এক গাছ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোট খাট পোকা বা ফড়িং গাছের কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ ক'রে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ ওড়া অবশ্য পাখীর মত ওড়া নয়, কারণ এরা রীতিমত বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—লাফিয়ে বাতাসে ভর ক'রে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড় বড় গাছের আগায়, ক্বচিৎ কখনও নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে যেতে হ'লে এরা শূন্যে দিয়েই যাতায়াত করে। এপর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি রকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়াছে—তাদের সবগুলোরই রং অতি চমৎকার—কোন ফুল বা প্রজাপতির রংও তার চাইতে সুন্দর বা উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নক্সা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগ্‌তে জানে, আর রাগ্‌লে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এছাড়াও আরো কত রকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নাই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মত গিরগিটি, মাছের মত গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নাই। একটা আছে, তার কোন্ দিকটা ল্যাজ আর কোন্ দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর একটার হাতপাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মত, ল্যাজটা গোড়ায় সরু মাঝখানে মোটা আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি! এদের অনেকে আবার রং বদ্‌লাতে জানে—কেউ কেউ এবিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে কারও বা একেবারে ছানা হয়। আবার কেউ বা এমন ঠুনকো যে ধরবামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়!

সত্যি ?

ইনি কে জান না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল।

কোন্ নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দূৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয়—প্র-ফে-সার্ নিধিরাম!

ইনি কি করেন?

কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তর মেরুতে যায়—যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা—মানুষজন সব মরে যায়—

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বল্লেই বুঝি উত্তর মেরু বুঝতে হবে, বা দেশবিদেশে ঘুর্‌তে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তা হ'লে?

মানে, বিজ্ঞান শিখে নানারকম রাসায়ণিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন নতুন নতুন জিনিষ বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত কত কি আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরী সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোননি? সেই তেলের আশ্চর্য্য গুণ। আমি নিজে মাখিনি বা খাইনি, কিন্তু আমাদের বাড়ীওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ঙ্কর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে—দেড় দিনে আদ হাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কি মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয় ! বল্লে বিশ্বেস কর্‌বে না কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিস্ত্রিরের খোকাকে ওই তেল মাখিয়ে তার এয়া মোটা গোঁফ হ'য়ে গেছিল।

কি আবোল তাবোল বক্‌ছেন মশাই !

বিশ্বেস্ কর্‌তে না চাও তা বিশ্বেস করো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস কর্‌বে ত ? কি কাণ্ড হচ্ছে দেখছ ত ? ঐ দেখ নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান
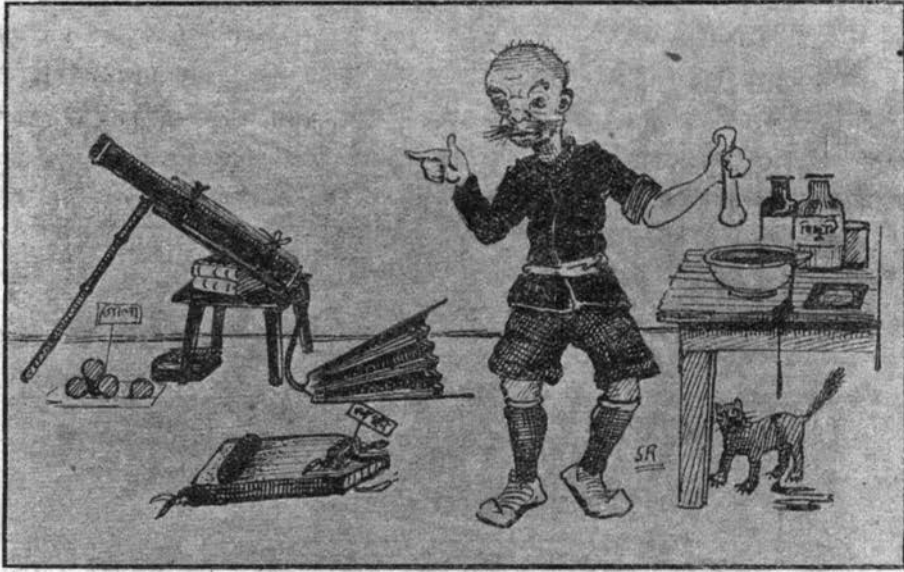
তৈরী হ'চ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। এ কি সহজ কথা ভেবেছ ? ওই রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরী হলেই উনি লড়াই কর্‌তে বেরুবেন।

সব নূতন রকম হচ্ছে বুঝি ?

নতুন নাত কি ? নতুন অথচ সস্তা। ওই দেখ কামান আর ঐ দেখ গোলা। কামানে কি আছে ? নল আছে আর বাতাস ভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভ'রে খুব খানিক দম নিয়ে ভ—শ্ ক'রে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হুশ্ ক'রে গোলা গিয়ে ছিট্‌কে পড়বে আর ফট্ ক'রে ফেটে যাবে।

তার পরে ?

তার পরেই ত হ'চ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কি আছে জান? বিছুটির আরক আছে, লঙ্কার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচামূলোর একষ্ট্রাক্ট্ আছে, আরও যে কত কি আছে, তার নামও আমি জানি না। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যত রকম ঝাঁঝালো তেজাল বিট্‌কেল জিনিষ আছে, আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সে দিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে ফেটে গিয়েছিল শুনেছ ত?

তাই নাকি? তার পর হ'ল কি?

যেম্নি গোলা ফাট্‌ল অম্নি ভাগ্যিস্ তিনি চট্ ক'রে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন নইলে কি হ'ত কে জানে। তবু দেখছ ওষুধের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসারের চেহারা কেমন হ'য়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্ত্তিকের মত; মাথা ভরা কোঁকড়া চুল আর এক হাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না ত কি?

নূতন ধাঁধা

১। সার বেঁধে দুই দল আছি মুখামুখি
প্রতিদিন রেষারেষি চলে ঠোকাঠুকি
একবার পড়ে পড়ে ফের উঠি তেড়ে
আবার পড়িলে যাব রণভূমি ছেড়ে।

২। যাহা কিছু ঘটে ভাই আমি আছি মূলে
কেহ বা দেখিতে পাও কেহ থাক ভুলে।
প্রথম ছাড়িলে লাগে ঘোর হানাহানি,
শেষ বাদে কাহার সে কেহ নাহি জানি।
মধ্যম ছাড়িলে ভাই যাহা থাকে বাকী,
সে না হ'লে গান হয় একেবারে ফাঁকি।

তারা মাছ

(গত বারের "সন্দেশ" দেখ)
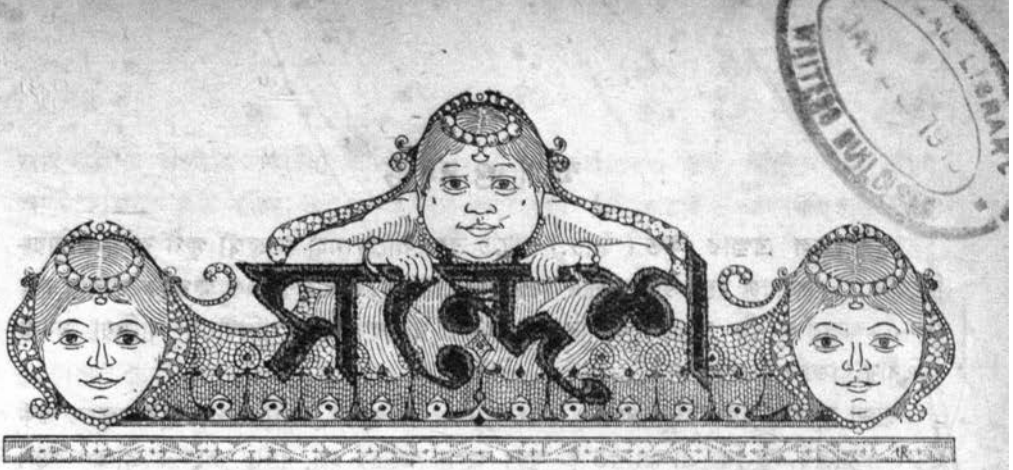
পঞ্চম বর্ষ পৌষ, ১৩২৪ নবম সংখ্যা

দুলাল

কাজ ভুলান দুলাল আমার,
বস্‌ল এসে কোলটি জুড়ে,
রচি তিলক, পরাই কাজল,
দুধ মুখে দি ঝিণুক পূরে!
দুধে ভরা যত কড়া বলক ধরে উথলে পড়ে,
উঠ্‌তে গেলে, পাগল ছেলে, কেঁদে কেঁদে জড়িয়ে ধরে,
আবদারে তার রাণী হারে
হয় না যাওয়া একটু দূরে!
দেখে বৃথা অপচয়, প্রাণে বড় ব্যথা হয়,
তিলেক যদি উঠে চলি' রক্ষা তবে নাহি রয়,
মাটীর পরে আপসে পড়ে,
কাঁদন তুলে আটাস্‌ ধরে,
সেই কাঁদন বাজে নূপুর বাজে
সকল ঘরের অন্তঃপুরে।
মোর নিরালা অন্তঃপুরে॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ক্ষুপ ও দধীচ

পুরাকালে ব্রহ্মার ক্ষুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে মহা তেজস্বী ক্ষুপ রাজা জন্মিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার শত্রু অসুরদিগকে মারিবার জন্য এই ক্ষুপকে তাঁহার বজ্র দেন। অসুর জয়ের পরে ক্ষুপ নিজের ইচ্ছায় মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন।

রাজা ক্ষুপের পরম বন্ধু ছিলেন দধীচ মুনি। একদিন কথায় কথায় দুই বন্ধুতে তর্ক হইল—ক্ষত্রিয় বড় কি ব্রাহ্মণ বড় ? ক্ষুপ বলেন ক্ষত্রিয় বড়, দধীচ বলেন ব্রাহ্মণ বড়। ক্রমে তর্ক অনেক দূর গড়াইলে পর মুনিবর দধীচ রাগিয়া ক্ষুপের মাথায় এক প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিলেন। তেজস্বী ক্ষুপ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বজ্রের আঘাতে দধীচের শরীর চুরমার করিয়া দিলেন !

দধীচ মুনি মরার মত মাটিতে পড়িয়া মনে মনে শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিলে শুক্রাচার্য্য আসিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে দধীচকে সুস্থ করিয়া পরামর্শ দিলেন—"তুমি মহাদেবকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট কর এবং তাঁহার নিকট বর লইয়া তুমি অমর হও আর প্রার্থনা কর তোমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত শক্ত হয়।"

মহর্ষি ভার্গবের উপদেশে দধীচ কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর মহাদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস ! আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।" দধীচ করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু ! আমাকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে এবং আমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত কঠিন হয়।" মহাদেব "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আর কথা কি ! বর পাইয়া দধীচ নির্ভয়ে ক্ষুপ রাজার নিকটে গিয়াই তাঁহার মাথায় সজোরে এক লাথি মারিলেন ! ক্ষুপও তৎক্ষণাৎ দধীচের বুকে বজ্র ছুড়িয়া মারিলেন বটে কিন্তু তাহাতে দধীচমুনির কোনই অনিষ্ট হইল না ! রাজা ক্ষুপ দধীচের ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে অবাক্ ! এ দিকে দারুণ অপমানে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে অতি কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূজায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিলে পর রাজা ক্ষুপ বলিলেন—"হে প্রভু ! দধীচ নামে এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি মহাদেবের বরে সকলের অবধ্য। সেই দধীচ আমার সভায় আসিয়া সকলের সমক্ষে আমার মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন।

আর ভারি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন—আমি কাহাকেও ভয় করি না'। এখন, আমি তাঁহাকে জয় করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই—আপনি ইহার উপায় করিয়া দিন্।"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—"দধীচ শিবের ভক্ত এবং তাঁহার বরে অবধ্য, সুতরাং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাইতেছি না। আর আমার ভয় হয় কোনরূপ চেষ্টা করিতে গেলে পাছে মুনি রাগিয়া আমাকে ও দেবগণকে শাপ দেন! যাহা হউক তবু আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব তোমার উপকার করিতে পারি কিনা।"

ইহার পর বিষ্ণু ব্রাহ্মণের বেশে দধীচের আশ্রমে গিয়া বলিলেন—"হে শিবভক্ত মুনিঠাকুর! আমি আপনার নিকট একটি বর চাই, আমাকে সেই বর দিন।" দধীচ বিষ্ণুর চালাকি এবং ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন—"হে ঠাকুর! আর কেন, এখন ব্রাহ্মণ-রূপ ছাড়ুন। মহাদেবের অনুগ্রহে আমি সবই বুঝিতে পারিয়াছি—আপনি ক্ষুপ রাজার পূজায় তুষ্ট হইয়া ভক্তের মান রক্ষার জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের অনুগ্রহে পৃথিবীতে দেব, দৈত্য, দ্বিজ কাহাকেও আমি ভয় পাইনা। আমার ভয়ের যদি কোন কারণ থাকে তবে বলুন।" তখন বিষ্ণু নিজরূপ ধরিয়া বলিলেন—"হে দধীচ! তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, কিন্তু আমার আদেশে একবার ক্ষুপ রাজার সভায় গিয়া বল—'আমি ভয় পাইতেছি'।"

শিবভক্ত দধীচ বলিলেন—"আমি সে কথা বলিতে পারিব না, কারণ মহাদেবের প্রসাদে আমি কাহাকেও ভয় করি না।" এই কথা শুনিয়া ক্রোধে বিষ্ণুর শরীর জ্বলিয়া গেল, দধীচকে বধ করিবার জন্য সুদর্শন চক্র উঠাইলেন। কিন্তু দধীচ মুনির তেজে সুদর্শন চক্র নিস্তেজ হইয়া গেল। তখন মুনিবর দধীচ একটু হাসিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"হে প্রভু! পূর্ব্বকালে আপনি শিবের নিকট হইতে এই চক্র পাইয়াছিলেন, মহাদেবদত্ত এই চক্র আমাকে আঘাত করিবে না। অতএব ব্রহ্মাস্ত্র কিংবা অন্য কোন মহা অস্ত্র দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করুন।" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু নানারূপ অস্ত্র দ্বারা দধীচকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায় হইলেন সমস্ত দেবতাগণ আর দধীচ মুনি একা। তখন দধীচ মুনি করিলেন কি? এক মুঠা কুশ লইয়া মহাদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক দেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। তখন এক ভারি অদ্ভুত কাণ্ড হইল—দধীচের সেই এক মুঠা কুশ ভয়ঙ্কর ত্রিশূল হইয়া দেবতাদের দিকে ছুটিল। ত্রিশূলের

মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইয়া দেবতাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যে সব অস্ত্র ছাড়েন সকলে ত্রিশূলকে প্রণাম করে! ইহা দেখিয়া দেবতারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

দেবতারা পলায়ন করিলে পর বিষ্ণু নিজের শরীর হইতে তাঁহারই মত বলবান লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত সৈন্যগণ দধীচ মুনির তেজে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল। এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বিষ্ণুকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। বিষ্ণু তখন আর কি করেন! ব্রহ্মার কথায় যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন এবং মুনি ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া সেখানে আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিলেন না।

ইহার পর ক্ষুপরাজ দধীচ মুনির বন্দনা করিয়া বলিলেন—"হে ঠাকুর! হে সখা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন"। দধীচ মুনি ক্ষুপরাজকে ক্ষমা করিলেন বটে কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে শাপ দিলেন—"দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ শিবের কোপানলে বিনষ্ট হইবে।"

দেবতাগণকে অভিসম্পাত করিয়া দধীচ ক্ষুপকে বলিলেন—"মহারাজ! দেখিলেন ত? আমার কথাই ঠিক হইল। ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত বলবান্ এবং ক্ষত্রিয়দের চাইতে বড়।" এই বলিয়া দধীচ নিজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বানর ও মকর

(কথা সরিৎসাগর)

সমুদ্রের তীরে এক বনের মধ্যে বলীমুখ নামে বানরের রাজা থাকিত। জলের ধারেই একটা জামের গাছ, তাহার ডালে বসিয়া প্রতিদিন বলীমুখ জাম খায় আর সমুদ্রের শোভা দেখে। একদিন বানরের হাত হইতে একটা জাম জলে পড়িবামাত্র একটা মকর মাছ জামটা খাইল। কি মিষ্ট ফল! খাইয়া মকরের আহ্লাদ দেখে কে! তখন সে মনের আনন্দে সুন্দর সুর বাহির করিয়া তান ধরিল।

মকরের সুরটি বানরের নিকট ভারি মিষ্ট বোধ হওয়ায় সে আরও কতগুলি জাম জলে ফেলিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা সেগুলি খাইয়া মকর তাহাকে আরও তান শুনাইবে। বাস্তবিক তাই—মকর যত জাম খায় তত মিষ্টি সুর ভাঁজে আর বানরও মহা খুসী হইয়া

ততই জাম ফেলিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে দুজনের মধ্যে ভারি বন্ধুত্ব জন্ময়া গেল। মকর প্রত্যহ আসিয়া সারাটা দিন বানরকে গান শুনায় আর জাম খায়।

ক্রমে এই সংবাদ মকরপত্নীর কাণে গেল; বানরের সহিত তাহার স্বামীর বন্ধুতা সে একেবারেই পছন্দ করিল না। সারাদিন স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া একটা বানরের কাছে থাকে—এটা মকরপত্নী পছন্দ করিবেই বা কেন? সুতরাং একদিন সে গুরুতর পীড়ার ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। এ দিকে মকর বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ! স্ত্রী বুঝি বা যায়! স্ত্রীকে সে বাস্তবিক ভালবাসিত, তাই নিতান্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া পীড়ার কারণ জানিবার জন্য এবং কি করিলে সারিবে ইত্যাদি বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রী একেবারে নিরুত্তর!

অনেকক্ষণ পরে মকরপত্নীর এক সখী বলিল—"কর্ত্রীঠাকুরাণীর পীড়া বড় গুরুতর! কবিরাজ বলিয়াছে—বানরের আত্মার ঝোল না খাইলে এ রোগ কিছুতেই সারিবার নয়!"

ব্যারামের ঔষধের নাম শুনিয়া মকরের চক্ষুস্থির! সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"হায়, হায়! এখন উপায় কি? যেরূপেই হউক স্ত্রীকে বাঁচাইতেই হইবে; কিন্তু বানরের আত্মা কোথায় পাইব? বলীমুখ আমার এমন বন্ধু, আমি কি তাহার অনিষ্ট করিতে পারি? বিশ্বাসঘাতকতা যে মহা পাপ!" মনে মনে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে মকর স্ত্রীকে বলিল—"তোমার কোন চিন্তা নাই, একটা আস্ত বানর তোমার জন্য লইয়া আসিব।"

পরদির মকর বানরের নিকট গেল এবং নানা কথাবার্ত্তার পর বলিল—"বন্ধু! আজ পর্য্যন্ত তুমি একদিনও আমার বাড়ীতে গেলে না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলে না—চল একবার আমার বাড়ী তোমাকে লইয়া যাই। ডাকিবার আগেই যদি বন্ধুর বাড়ী না গেলাম, তার স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না করিলাম তবে আর বন্ধুতা কি?" দধীমুখ দেখিল যে বন্ধু মকর সত্যই বলিয়াছে। তখন সে গাছ হইতে জলে নামিয়া আসিল। মকরও তাহাকে পিঠে লইয়া চলিল তাহার বাড়ীতে।

বানরকে লইয়া মকর চলিল বটে কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই—পথে যাইতে যাইতে মুখ গম্ভীর করিয়া কেবলই ভাবিতেছে। বানর বন্ধুর এরূপ মলিন মুখ দেখিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বন্ধু! আজ তোমার কি হইয়াছে, তোমার মুখ এত বিমর্ষ কেন?" বানর বার বার প্রশ্ন করিলে পর মকর বলিল—"আমার স্ত্রীর বড় ব্যারাম। সে ক্রমাগতই

বলিতেছে বানরের আত্মার ঝোল খাইলে নাকি তাহার ব্যারাম সারিয়া যাইবে। এই কারণেই বন্ধু আমার মনটা আজ এত খারাপ।”
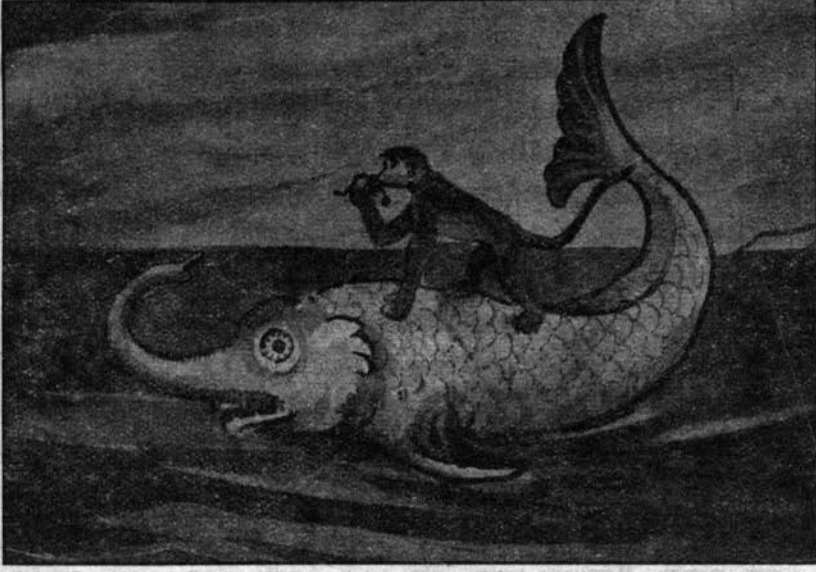
চতুর বানর মকরের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল—“বটে! হতভাগা মকর এই জন্য আমাকে তার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে? বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্ত্রীকে বাঁচাইবে!” এইরূপ চিন্তা করিয়া বানর বলিল—“বন্ধু! এ কথাটা তুমি আগে বলিলে না কেন? আসিবার সময় যে আমার আত্মাটা গাছের কোটরে রাখিয়া আসিয়াছি! যা হোক্ চল এখন ফিরিয়া গিয়া তোমার স্ত্রীর জন্য আমার আত্মা লইয়া আসি।”

মকর তখনই বানরকে পিঠে করিয়া জামগাছের নিকট ফিরিয়া গেল। গাছের নিকটে যাইবামাত্র বানর এক লাফে ডাঙ্গায় পড়িয়া একেবারে গাছের উঁচু ডালে চড়িয়া বসিল আর মকরকে বলিল—“ওরে মূর্খ! কেহ কি কখনও আত্মাটাকে শরীরের বাহিরে রাখে? এটা শুধু তোর সঙ্গে চালাকি খেলিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম! এখন এ স্থান হইতে পলায়ন কর্, তোর মত বিশ্বাসঘাতকের মুখ দেখিলেও পাপ!”

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পল্টন তৈয়ারী

রাস্তা দিয়ে যখন মচ্ মচ্ ক'রে পল্টন যায়, তখন দেখ্তে পাওয়া যায় তারা কেমন চট্পট্ ফিট্ফাট্! কথায় বলে "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয়," কিন্তু এই সব পল্টন যে কি রকম আনাড়ি লোককে শিখিয়ে তৈয়ারী করা হয়, না দেখ্লে তোমাদের সে বিষয়ে কোন ধারণাই হবে না। একদিন আমি মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ষ্টেশনে দেখ্লাম কতগুলি রোগা লোক তাদের গায়ের জামা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন ভদ্রলোক তাদের বুকে যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা কর্ছেন। সে সব লোকের চেহারা দেখ্লে মনে হয় নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে নিরীহ মানুষ—তারা ভাল ক'রে দাঁড়াতে জানে না, চল্তে ফির্তে জানে না; চেহারাও তেম্নি অকর্ম্মণ্য গোছের। শেষে শুন্লাম তারা নাকি সেপাই হবার জন্য পল্টনে ঢুক্তে চায় ব'লে ডাক্তার তাদের পরীক্ষা কর্ছেন! এবার স্বচক্ষে সেই রকম আনাড়ি লোকদের পল্টনের কাজ শিখ্তে দেখে কথাটা বিশ্বাস হয়েছে। সাম্না সাম্নি দেখ্লাম আনাড়ি লোক কেমন ক'রে অল্প দিনের মধ্যে ফিট্ফাট্ চট্পট্ হয়ে যায়।

যেখানে পল্টন তৈয়ারী হয়, সে জায়গাটা এক প্রকাণ্ড মাঠ। তার এক পাশে অনেক তাঁবু আর খড়ের চালা। মাঠের মধ্যে নানা জায়গায় পল্টনের কাজ শেখান হচ্ছে। এক জায়গায় দেখ্লাম আনাড়ির দলকে দাঁড় করিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার রকমটা, আর হাত পা ঠিক ভাবে রাখ্বার নিয়ম শেখান হচ্ছে; তারপর সারি বেঁধে দাঁড়াবার কায়দা কানুন শেখান হচ্ছে। আরেক দলকে হুকুম মত ডাইনে বাঁয়ে ফেরা, আর দুই, তিন কি চার জনে সারি বেঁধে তালে তালে পা ফেলে চল্বার রকমটা শেখান হচ্ছে। এ সব লোকেদের কোন সরকারী পোষাক দেওয়া হয়নি; যার যার নিজের পোষাকই প'রে আছে। সামান্য কিছু যারা শিখেছে, তাদের 'খাকী' রঙের একটা সার্ট আর পায়জামা দেওয়া হয়েছে;—তখনও তারা খালি পায়ে, আর বন্দুকের বদলে লাঠি ঘাড়ে। এর পর আরও কিছু চলা ফেরা, দাঁড়ানর কায়দা ইত্যাদি শিখ্লে এদের বুট জুতো আর পট্টি দেওয়া হয়। তখন তারা বন্দুকও ব্যবহার কর্তে আরম্ভ করে। বন্দুক ধরা, বন্দুক মাটিতে রাখা, ঘাড়ে তুলে নেওয়া, গুলি ছোঁড়া—দাঁড়িয়ে, ব'সে, শুয়ে ছোঁড়া—এই সব নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হয়। বন্দুকের কল কব্জাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কি ক'রে নিশানা কর্তে হয় সেটা খুব ওস্তাদ লোক দিয়ে ভাল রকমে শেখান হয়। লক্ষ্য খুব দূরে রেখে, নানা রকম অসুবিধার জায়গায় পল্টনকে বসিয়ে, শুইয়ে, গুলি মার্তে

শেখান হয়। বন্দুক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনের ব্যবহারও শেখান হয়। কি রকম ক'রে তাড়াতাড়ি সঙ্গিন লাগান যায়, সঙ্গিন-চড়ান বন্দুক কেমন ক'রে ধর্‌তে হয়, সঙ্গিন কেমন ক'রে ব্যবহার করে, সঙ্গিনের গুঁতো কেমন ক'রে এড়াতে হয়, এই সব শেখান হয়। সঙ্গিনের ব্যবহার শেখাবার উপায়টা বড় মজার; এক সারি খড়-ভরা বস্তা দু'তিন হাত অন্তর ঝুলান থাকে; সৈন্যেরা দৌড়ে এসে তাতেই সঙ্গিনের গুঁতো লাগায়। যখন সকলে দল বেঁধে বন্দুকে সঙ্গিন চড়িয়ে 'আক্রমণ' কর্‌বার জন্য দৌড় শেখে, সে সময় দেখ্‌তে বড় সুন্দর দেখায়। এর মধ্যে যে দু'একজন পড়ে না যায় এমনও নয়।

আজকালকার যুদ্ধে সৈন্যদের মাটিতে লম্বা খাদের মত গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌তে হয়। এ সব সৈন্যদের সেই গর্ত্তখোঁড় ও শেখান হয়। বালী-ভরা বস্তা সাজিয়ে দেয়াল করা, মাটিতে খাদ কাটা, এ রকম নানা কাজ তাদের শেখান হয়। সেই মাঠের এক কোণায় দেখ্‌লাম খুব লম্বা খাদ কাটা হয়েছে, আর তার সাম্‌নে বালীর বস্তার দেওয়াল দেওয়া হয়েছে।

এক দল লোক 'ফ্লাগ্‌সিগ্‌নাল' করা শিখ্‌ছে। যুদ্ধের সময় কথা শোনা যায় না ব'লে নানা রকম নিশানের সাহায্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর দেওয়া হয়। কোন্‌ নিশান কেমন ক'রে ধরলে নাড়্‌লে কোন্‌ কথা হয়, সেটা খুব ভাল ক'রে শিখ্‌তে হয়, আর যে যত তাড়াতাড়ি, যত ভাল করে খবর দিতে পারে, তার আদরও তত বেশী হয়, মাইনাও বেশী হয়। সাধারণ লোকে এ কাজটা পারে না।

এই তো গেল যুদ্ধ শেখার কথা। এদের রান্না বান্না দেখ্‌তেও বড় মজা। একটা প্রকাণ্ড উনুনের উপর একটা প্রকাণ্ড বড় তাওয়া চাপান হয়েছে। তারই চারিদিকে ব'সে কয়েকটি লোক ক্রমাগত রুটি বানাচ্ছে আর সেক্‌ছে। সে রুটি আমাদের এ সব রুটির চেয়ে অনেক পুরু। কাজেই এক এক জনে যে পরিমান রুটি তৈরী ক'রেছে সে সব থাক্‌ দিয়ে সাজিয়ে রেখে প্রায় তার মাথার সমান উঁচু হয়েছে। রুটি ছাড়া আরও কিছু রান্না হচ্ছিল অন্য সব উনুনে বড় বড় হাঁড়ীতে; কিন্তু আমি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি কাউকে, কাজেই জান্‌তেও পারিনি ঠিক ক'রে;—তবে যতদূর মনে হ'লো, তাতে ডাল রান্না হচ্ছিল। রান্না হয় সব চালার নীচে, আর ময়দা, ঘী, তেল, ডাল চাল, এ সব রসদ থাকে অনেক তাঁবুর ভিতরে।

শ্রীসুবিনয় রায়।

জাপানের কথা

পূজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেল বছর যখন জাপানে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এণ্ড্রুজ্ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব আর আমি ছিলাম। জাপানে থাক্‌তে বেশীর ভাগ সময় আমরা য়োকোহামার প্রসিদ্ধ গুণী ও ধনী মিষ্টার হারার বাড়ীতে অতিথি ছিলাম। মিষ্টার হারা সেখানকার খুব বড় একজন লাখপতি এবং চিত্রকলার একজন চমৎকার সমজদার। অতি সদাশয় লোক।

য়োকোহামা সহর থেকে মাইল দুই তিন দূরে গ্রাম ও লোকালয় ছাড়িয়ে নির্জ্জন পাহাড়ের তলায় হারাসান্ সপরিবারে খড়ের ঘরে বাস করেন।

জাপানী ভাষায় মিষ্টার না ব'লে সান্ বলে। তাই আমরাও বল্‌তাম হারাসান্। হারাসানের বাড়ীর চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। এসকল পাহাড় ও যায়গা সমস্তই তাঁর নিজের। এই পাহাড়গুলি আগাগোড়া পাইন গাছে ভরা।

মাঝখানের এই যায়গাটিতে একটি মস্ত বড় পদ্ম পুকুর আছে। তাতে শীতকালে ছাড়া প্রায় সারা বছরই লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটে থাকে। জাপানীতে পদ্মফুলের নাম
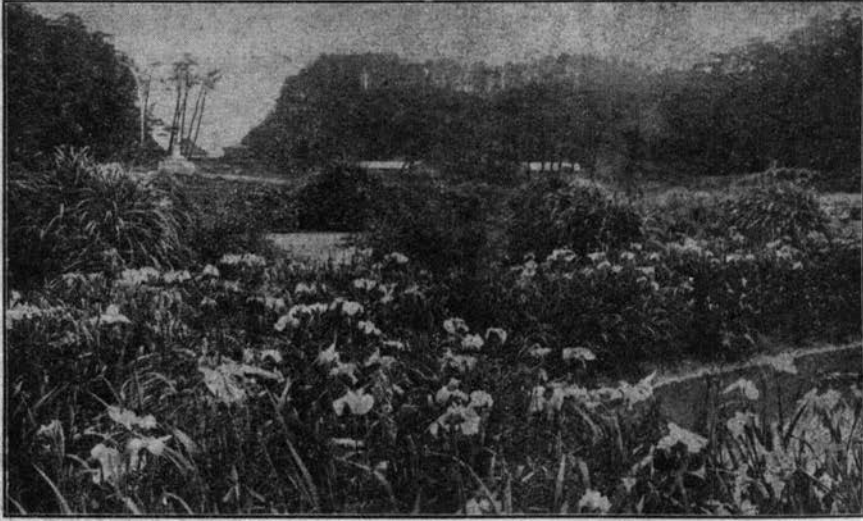
"হাস্নু-ন-হানাঁ"। সেই পদ্মবনের চারিদিক ঘিরে পাহাড়ের গা পর্য্যন্ত নানা রকম ফুল

ও ফলের মস্ত বড় বাগান। এই বাগানটি হারাসান্ সাধারণের জন্য সর্ব্বদাই খোলা রেখেছেন। নিকটের গ্রাম ও সহর থেকে ছেলে মেয়েরা যখন তখন এখানে বেড়াতে ও Picnic করতে আসে। তাদের জন্য বাগানে ছোট বড় অনেক রকমের ঘর আছে। সেই ঘরে জ্বালানী কাঠ, ভাল ভাল চুলো, পানীয় জল, জল গরমের পাত্র সমস্ত ঠিক করা থাকে। বস্‌বার যায়গা, মন্দির, টি হাউস্ আরো কত কি চারদিকে ছড়ান আছে। এই সকল জিনিষের মধ্যে আর্টের নৈপুণ্য দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

শনি রবিবারে দল বেঁধে স্কুলের ছেলেরা শিক্ষকের সঙ্গে এই বাগানে বেড়াতে ও মাঝে মাঝে চড়িভাতি করতে আসে। প্রথমে তারা লাইন করে বাগানে ঢোকে। তারপর বরাবর বাগানের ভিতর দিয়ে মার্চ করে তারা সমুদ্রের ধারে যায়। সমুদ্রের ধারে একটি ছোট মাঠ আছে, সেই মাঠে খানিক্ষণ ড্রিল ও ব্যায়াম করে কাপড় চোপড় ছেড়ে Bathing suit (স্নানের পোষাক) প'রে তারা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তারা জলে পড়ে যা খুসি তাই করে। সে জায়গায় সমুদ্রে জল খুব কম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে জল থেকে উঠে তারা বাগানের ভিতরে যায়। সেখানে সকলে মিলে খাবার দাবার খেয়ে সারা বাগানটা ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে যায়। স্কুলের মেয়েরাও ঐ রকম কতবার এই বাগানে বেড়াতে এসেছে দেখেছি। দিনে রাতে সারাক্ষণ এই বাগানে কেউ না কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অথচ এখানে লোকের কোন গোলমাল নেই। কেবল কাঠের জুতোর (জাপানী নাম "গেতা") খট্ খট্ শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায়।

হারাসানের বাড়ীর পিছনে লম্বা পাইন বনের পাহাড় উঠে গেছে। ঠিক তাঁর বাড়ীর সামনে এই মস্ত পদ্মপুকুর, আর বাগান। সর্ব্বদাই তিনি যেন এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে থাকেন। আমাদের বাড়ীটি ছিল পাহাড়ের উপর ঠিক সমুদ্রের ধারে। সামনেই নীল প্রশান্ত মহাসাগর ধূ ধূ করছে। এই সমুদ্রের পাড় থেকে ঠিক খাড়া খাড়া পাহাড় উঠেছে। পাহাড় ভরা পাইন গাছ। এরই ভিতরে আমাদের বাড়ীটি। আমাদের বাড়ীর পিছনেই ছিল একটি পুরাতন কাঠের মন্দির। হারাসান্ চীন দেশ থেকে এ মন্দিরটি কিনে এনেছেন। এটি দূর থেকে ভারি সুন্দর ছবির মত দেখায়। আমরা যে বাড়ীতে ছিলুম সে একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী। জাপানী ধরণে আগাগোড়া কাঠ দিয়ে তৈরী। ভিতরে বাইরে চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব তক্ তক্ করছে। কোন যায়গায় এতটুকু ময়লা ধূলোটি পর্য্যন্ত নেই। এবং আশ্চর্য্য রকমের

সব সাজান গোছান। এই বাড়ীর একধারে ছাদের উপর বেড়াবার সুন্দর খানিকটা খোলা যায়গা আছে। সেখান হতে দেখা যেত পাইন গাছের সবুজ মাথা, নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ। এই ছাদেই কত সকাল সন্ধ্যা আমরা কাটিয়েছি। পাহাড়ের উপরে আমাদের বাড়ীর সামনেই ঠিক সমুদ্রের উপর একটি ছোট্ট ঘর ছিল। সেটিতে একটি ছোট "টি হাউস্"। সেই ঘরে গেলে মনে হত এই বুঝি বাড়ীটা সমুদ্রে পড়ে যাবে। নীচে তাকালেই অনেক নীচে দেখা যেত সমুদ্রের ছোট ছোট নীল ঢেউ পাহাড়ের গায়ে লেগে ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ঘরটি থেকে জাপানের আশ্চর্য্য জিনিষ "ফুজি" পাহাড় বড় সুন্দর দেখা যেত। "ফুজি" পাহাড়ের মাথা সব সময়েই সাদা বরফে ঢাকা থাকে। প্রত্যেক জাপানীর সর্ব্বাপেক্ষা আদরের ও পবিত্র জিনিষ এই "ফুজি" পাহাড়। জাপানের প্রত্যেক বড় কবি ও চিত্রকর এই "ফুজি য়ামা" ("য়ামা" মানে পাহাড়) এঁকে ধন্য হয়ে গেছেন।

কাঠের মন্দির।

হারাসান্ এ যায়গার নাম দিয়েছেন "সান্-ও-তানি", (পাইনের মর্ম্মর) অর্থাৎ পাইন গাছের ভিতর দিয়ে বাতাস গেলে যে শব্দ হয় তাই। আমাদের বাড়ীতে অনেক দাসদাসী ছিল। সকলে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকৃত। কোন জিনিষ চাবার আগেই সামনে হাজির হত। সেখানে চাকর দাসীদের ডাকৃতে হলে নাম ধরে চেঁচাতে

হত না। হাতে একটু তালি দিলেই ঝি চাকর ছুটে এসে নুয়ে জিজ্ঞাসা করত কি চাই। বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম নিঃশব্দে হত। একদিন দুপুরে আহারের পর টেবিলে আমরা চারজনে বসে গল্প কর্‌ছি, গুরুদেব কি একটা ভারি হাসির কথা বল্‌ছিলেন। আমরা সকলেই খুব হাসছিলুম, এণ্ড্রুজ্ সাহেবও একেবারে হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। আর কথা নেই নীচে থেকে দৌড়ে দুই দুই জন দাসী এসে সাম্‌নে উপস্থিত। আমাদের হাসি হঠাৎ থেমে গেল। এর পর থেকে আমরা এ বিষয়ে খুব সাবধান হয়েছিলুম। আমাদের প্রত্যেকের ছিল আলাদা ঘর। প্রতি ঘরের দেয়ালে কেবল একটি করে লম্বা ছবি ঝোলান থাক্‌ত। আর সেই দেয়ালের কোণে একটি বাঁশের চোঙ্গায় কিংবা ভাঙ্গা হাঁড়িতে কিংবা ঐ রকমের কিছুতে দুটি একটি করে ফুল সাজান থাক্‌ত। দু তিন দিন পরে পরে দেয়ালে অন্য ছবি বদ্‌লে দেওয়া হত। কিন্তু দাসীরা রোজ নূতন নূতন ফুল এনে ঘরের সেই কোণটিতে সাজিয়ে রেখে যেত। একটি ঘরে বেশী ছবি বা ফুল তারা রাখে না। জাপানীদের মাদুর মোড়া ঘরে টেবিল চেয়ার খাট পালঙের কোন বালাই নেই। রাত্রিতে সেই মাদুরের উপর ঢালা বিছানা করে তারা শোয়। ভোরে বিছানা পত্র তুলে দেয়ালের ফোকরের মধ্যে বেমালুম ঢুকিয়ে দরজা এঁটে দেয়। চোখে আর কিছুই পড়ে না। কেবল এককোণে ঐ ফুল আর একটি ছবি। বস্‌বার একটি ছোট গদির মত থাকে, তাতে তারা হাঁটু গেড়ে বসে—ঘরে বড় জোর একটি ছোট হাত টেবিল আর লেখবার জন্য কালি তুলি থাকে। বাস্ আর কিচ্ছু না।

প্রায় রোজই বিকেলে চায়ের পর আমরা পাহাড় হতে নেমে নীচে হারাসানের বাড়ী যেতুম। বাড়ীর দুয়োরে পৌঁছলেই চাকর দাসীরা ছুটে এসে নুয়ে হাঁটু গেড়ে নমস্কার কর্‌ত। আর ঘরে ঢুক্‌বার জন্যে ঠাসা কাপড়ের চটি এগিয়ে দিত। জাপানে ঘরের ভিতর জুতো পরে ঢুক্‌বার নিয়ম নেই; পরিষ্কার দামী মাদুর দিয়ে সমস্ত মেজে মোড়া কিনা। পায়ের জুতো খুলে দুয়োরে রেখে তবে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। রোজ বিকেলে হারাসান্ আমাদের নূতন নূতন ছবি দেখাতেন ও ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। ছবি দেখাতে তিনি বড় আনন্দ পেতেন। এই রকমে মাস দুই তিনে হারাসানের বাড়ীতে আমরা চীনের ও জাপানের অনেক পুরাতন ও নূতন ভাল ভাল ছবি দেখেছি। সর্ব্বসাধারণের দেখ্‌বার জন্য হারাসান্ শীঘ্রই তাঁর বাগানে একটি ছবির মিউজিয়ম্ তৈরী কর্‌বেন শুনেছি।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বল্‌তে হ'লে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়—"তরোরিব সহিষ্ণুণা"। গাছের মহত্ত্বের কথা ছেলেবেলায় কত যে পড়েছি এখনও তা'র কিছু কিছু মনে পড়ে। "ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ"—যে লোক পাশে ব'সে গাছের ডাল কাট্‌ছে তার কাছ থেকেও গাছ তার ছায়াটুকু সরিয়ে নেয় না। আরও শুনেছি, "কঠিন অপ্রিয় বাক্য করিলে শ্রবণ, রক্তজবা রাগ ধরে মনুজ লোচন। ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে"। এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ, সেও নাকি আবার অত্যাচার করে! নানা রকম কৌশল ক'রে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে, হুল ফুটিয়ে, সঙ্গীন চালিয়ে, গোলা মেরে, সাঁড়াশি বিঁধিয়ে কত উপায়ে যে তারা দৌরাত্ম্যি করে, তা শুন্‌লে পরে তোমরা বল্‌বে "গাছের পেটে এত বিদ্যে"!

তিন বছর আগে "সন্দেশে" শিকারী গাছের কথা বেরিয়েছিল। তাতে গাছেরা কেমন ক'রে আশ্চর্য্য রকম ফাঁদ পেতে পোকা মাকড় ধ'রে খায়, তার গল্প আর ছবি দেওয়া হয়েছিল। তারা নানা রকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে, পোকাদের সব ডেকে আনে; কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না; কখন হঠাৎ টপ্‌ ক'রে ফাঁদের মুখ বুজে যায়, কিংবা গাছের আঠাল রসে তাদের পা আটকিয়ে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিছল পথে উঠ্‌তে গিয়ে আর উঠতে পারে না, তখন বেচারাদের ছটফটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ, পোকা মাকড় খেয়ে এরা বেঁচে থাকে, তাই প্রাণের দায়ে একটু আধটু হিংসাবৃত্তি না করলে এদের চল্‌বে কেন?

খোঁজ কর্‌লে দেখা যায়, অনেক সময় গাছে গাছেও লড়াই চলে। অল্পে অল্পে দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চল্‌তে থাকে। এক জায়গায় দশ বিশটা গাছ থাক্‌লেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষারেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো আর বাতাস পেতে—সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলে ঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্ব্বল বেচারীরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক এক রকম গাছ থাকে তাদের কেমন অভ্যাস, তারা অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে উঠে তারপর তাদের চিপ্‌সে মারে। এই একটা গাছের লড়াইয়ের ছবি দেখ

একটা লতানে গাছ কেমন ঠগীর মত পাক দিয়ে আরেকটা গাছকে চেপে ধরেছে। এই দস্যু গাছ প্রথমটা নিরীহ লতার মত বড় গাছটির গায়ের উপর আশ্রয় নিয়ে আত্মীয়তা করতে এসেছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে দখল বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন সে তার আশ্রয়দাতার প্রাণটি শুদ্ধ টান মেরে নিতে চায়। এক এক সময় দেখা যায় একটা গাছ সিন্ধবাদের বুড়োর মত আর একটা গাছের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। গাছের অন্য বিদ্যা যেমনই থাক্, সে ত হনুমানের মত লাফাতে পারে না, তা হ'লে সে অন্যের ঘাড়ে চড়্‌ল কি ক'রে?—চড়্‌তে হয়নি, ঐ ঘাড়ের উপরেই তার জন্ম হয়েছে। ঐখানে কবে কোন্ পাখী এসে ফলের বীজ ফেলে গেছে, সুবিধা পেয়ে সেই বীজ এখন ডালপালা মেলে, মাটি পর্য্যন্ত শিকড় ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড গাছ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নীচের গাছটার খুবই আপত্তি থাকবার কথা, কিন্তু আপত্তি থাকলেই

বা শোনে কে? যেখানে সেখানে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠায় এক একটি গাছের বেশ একটু বাহাদুরি দেখা যায়। আমাদের দেশের অশ্বত্থ গাছ এ বিষয়ে একেবারে পাকা ওস্তাদ। ছাতে দালানে পোড়ো মন্দিরে অন্য গাছের ঘাড়ে, কারখানার চিম্‌নির চূড়ায়, যেখানে তাকে সুযোগ দেবে, সেখানেই সে মাথা উঁচিয়ে বেড়ে উঠ্‌বে।

বটগাছের জন্মও অনেক সময়ে অন্য গাছের ঘাড়ের উপর হয়—সেইখানে বাড়তে বাড়তে সে যখন বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়, তখন নীচের গাছটিকে সে অল্পে অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। এই রকম ক'রে সে বড় বড় তাল গাছকেও কাবু ক'রে ফেলতে পারে।

আর এক দল গাছ আছে তারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরী থাকে, পাছে কেউ তাদের অনিষ্ট করে। শুকনা বালির দেশে মনসাগাছের বাড়তি খুব বেশী। মনসাগাছের পুরু ছাল, তার মধ্যে জলভরা নরম শাঁস, তাতে ক্ষুধাও মেটে তৃষ্ণাও দূর হয়। কিন্তু মনসাগাছের গা'ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষে। গরু ছাগলে কত সময়ে ক্ষুধার তাড়ায় কাঁটার কথা ভুলে গিয়ে মনসাগাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে মুখে কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হ'য়ে পালিয়ে আসে। মনসাজাতীয় গাছ নানা রকমের হয়, কোনটা ছোট খাট তার পুরু পুরু চ্যাটাল পাতা, কোনটার পাতা নাই একেবারে
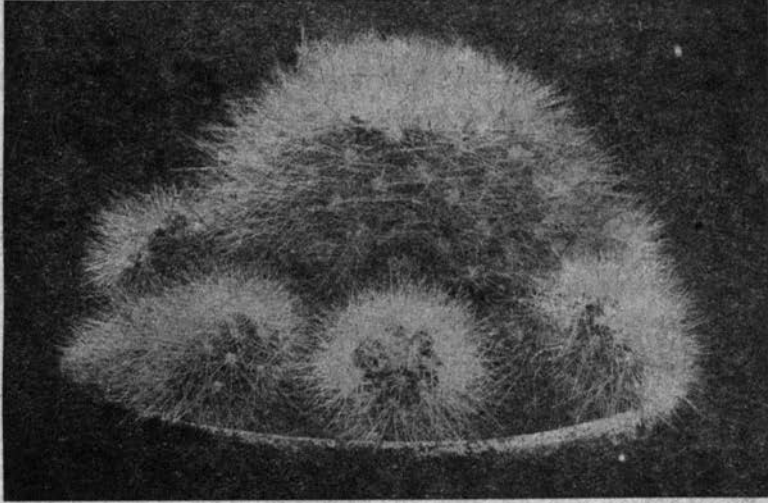
থামের মত খাড়া, কোনটার চেহারা ঝোপের মত, কোনটা ভুট্টার মত, কোনটা চল্লিশ হাত লম্বা, কোনটা বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে সজারুর মত কাঁটা। এইখানে একটা অদ্ভুত মনসার ছবি দিলাম। কদম ফুলের মত সুন্দর চেহারা, দেখে হাত দিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু একটিবার হাত দিলেই বুঝবে কেমন মজা।

এই গাছগুলার কাঁটা এক এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না—কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁটা চামড়ার মধ্যে ফুটে যায়। কাঁটাওয়ালা গাছ নানারকমের আছে, তার মধ্যে কোন কোনটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভ'রে রাখে। তাতে কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটাই বেশ একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। আবার দু একটার কাঁটা নিতান্তই সামান্য—সরু শুঁয়ার মত, কিন্তু তাদের বিষ বড় তেজাল। বিছুটির পাতা অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য হুল উঁচিয়ে আছে—তাতে হাত দিবামাত্র তার আগাটুকু ভেঙে গিয়ে ভিতর থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে। এক এক জাতীয় বিছুটি আছে—তাদের বিষে অসহ্য রকম যন্ত্রণা হয় এবং সপ্তাহ ভ'রে তার জের চলে। এক সাহেব একবার এই রকম এক বিছুটি ঘাঁটতে গিয়ে তারপর নয় দিন শয্যাগত ছিলেন! তিনি বলেছেন যে বিছুটি লাগবার পর সারাদিন তাঁর মনে হ'ত যেন তপ্ত লোহা দিয়ে কে তাঁর হাতের মধ্যে ঘা মারছে।

"ওল খেয়ো না ধরবে গলা"—একথা আমিও জানি তোমরাও জান; কিন্তু জঙ্গলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে একথা গরু ছাগলে কি ক'রে জানবে? এই সব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও সরু অতি সূক্ষ্ম দানা থাকে সেইগুলি গলায় জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক ক'রে তোলে। West Indies দ্বীপে একরকম বেত পাওয়া যায় তার পাতা খেলে গলা ফুলে কথা ত বন্ধহ হয়ই, অনেক সময় দমবন্ধ হ'য়ে যেতে চায়। শোনা যায় সেখানকার নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীরা এই পাতা খাইয়ে ক্রীতদাসদের শাসন করত। এই বেতের নাম Dumb Cane বা "বোবা বেত"।

আত্মরক্ষার জন্যই অধিকাংশ গাছে নানা রকম ফন্দী ফিকিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কেবল নিজেকে বাঁচিয়েই সকলে সন্তুষ্ট নয়, বংশরক্ষার জন্যও তাদের যে সব উপায় খাটাতে হয়, সেগুলিও এক এক সময় কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ দেখা যায় যেন কাঁটায় ভরা। এই রকম কাঁটাওয়ালা নখওয়ালা ফল সহজেই নানা জানোয়ারের গায়ের চামড়ায় লেগে এক জায়গার ফল আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে। তাতে জানোয়ারের অসুবিধা খুবই হ'তে পারে—কিন্তু গাছের বংশ বিস্তারের খুব সুবিধা হয়। এক একটা ফলের কাঁটার সাজ অনাবশ্যক রকমের সাংঘাতিক ব'লে মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম ফল হয় সে ফল মানুষে খায় না, তার গুণের মধ্যে তার

প্রকাণ্ড দুইটি বঁড়শির মত শিং আছে, তার একটি কোন জন্তুর গায়ে বিঁধলে তার সাধ্য কি যে ছাড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে এই ফলের কামড় ছাড়াতে গিয়ে গরু ছাগল বা হরিণের মুখের মধ্যে বঁড়শি আটকে গিয়েছে। পোষা জন্তু হ'লে মানুষের সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়ে যায়, কিন্তু বনের জন্তু নিরুপায়। তারা কেবল অস্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটে বেড়ায়—তাতে আধ-খোলা ফলের ভিতরকার বীচিগুলা চারি দিকে ছিটিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, কিন্তু নিরীহ জন্তুর প্রাণটি যায়। এই ফলকে সে দেশের লোকে "সয়তানের শিং" বলে।
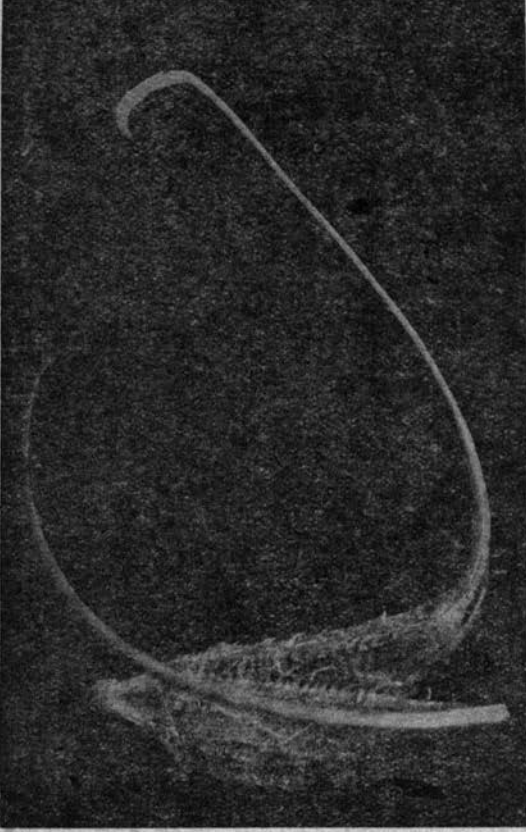
এর চাইতেও ভয়ানক হ'চ্ছে আফ্রিকার সিংহমারা ফল। আঁকড়শির মত চেহারা, তার চারি-দিকে "বাঘনখা" ফলের মত বড় বড় নখ। নখের গায়েভীষণ রকম কাঁটা তাদের একমুখ এক এক দিকে—একটাকে একটার ছাড়াতে গেলে আর একটা বেশী ক'রে বিঁধে যায়। পরের ছবিতে দেখ একটা আফ্রিকা দেশের ভেড়ার পায়ে কি রকম ভাবে কাঁটা বিঁধেছে। এ রকম একটা দুটা নয়, প্রতি বছর সে দেশে হাজার হাজার হরিণ, ভেড়া আর ছাগল এই ভাবে জখম হয়। যেখানে নখ বসে সেখানে ঘা হয়ে পচে ওঠে, তাতে ফল যদি খসে যায় তাহ'লে কতক রক্ষা ; না হ'লে শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও যে এর হাত থেকে সকল সময়ে নিস্তার পেয়ে থাকেন তা নয়। এর জন্য সিংহের প্রাণ দিতে হ'য়েছে এমনও দেখা দিয়েছে।

আর এক রকম গাছ আছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বীচিগুলা

সব ছিটিয়ে পড়ে। কোন কোন গাছে এই বীজ ছড়ান কাজটি বেশ একটু জোরের সঙ্গে হয়। এক বাঁদরের গল্প শুনেছি, সে খুব বাহাদুরী ক'রে গিলার গাছে বসে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। গিলার ফল হয় বড় বড় শিমের মত—সেগুলা পেকে পট্‌কার মত আওয়াজ ক'রে ফেটে যায় আর চারিদিকে গিলা ছিটায়; বাঁদর ত সে খবর রাখে না, সে আরাম ক'রে ল্যাজ ঝুলিয়ে ব'সে খুব একটা উৎকট রকম দুষ্টুমির ফন্দি আঁট্‌ছে—এমন সময় ফট্‌ ক'রে গিলা ফেটে তার কাণের কাছে চাঁটি মেরে গেল। বাঁদরটা হঠাৎ হাত পা ছেড়ে পড়তে পড়তে সাম্‌লে গেল—তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দেখে কেউ নাই! এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তার ভয় হ'ল, না কি হ'ল, তা জানি না—কিন্তু সে এক লাফে সেই যে পালাল, একেবারে বিশ ত্রিশটা গাছ না ডিঙিয়ে আর থামল না। দক্ষিণ আমেরিকায় এক রকম ফল আছে সে এই বিদ্যাতে গিলার চাইতেও ওস্তাদ।

তার ফলগুলো ফাটবার সময় বন্দুকের মত আওয়াজ করে আর তার ভিতরকার

বীচিগুলা এমন জোরে ছুটে যায়, যে ভাল ক'রে তার চোট লাগ্‌তে মানুষ পর্য্যন্ত জখম হ'তে পারে।

ছেলে বেলায় এক রকম গাছের গল্প পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধ'রে টেনে খায়। কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেন না—কারণ অনেক খোঁজ করেও সে গাছের কোন রকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে গাছ পোকা মাকড় খায় সে সুযোগ পেলে পাখীটা বা ইঁদুরটা পর্য্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু সে যদি মানুষ পর্য্যন্ত খেতে আরম্ভ করে তা হ'লে ত আর রক্ষা নেই।

———

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

পুরী

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একটি জেলের ছেলের হাতে ছোট ছোট কট্‌ল্‌ মাছ দেখিয়াছিলাম। আর সে বলিয়াছিল যে উহা রাঁধিয়া খাইবে। অনেকে এই জন্তুর মাংস খুব আদরের সহিত আহার করে, আর ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য বিস্তর ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করে। এ সকল লোকের বাস আমাদের দেশে নহে; কিন্তু আমি একটা পুস্তকে এ কথা দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের বাজারে নাকি কট্‌ল্‌ ফিসের মাংস বিক্রয় হয়। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে এ দেশের কেহ কেহ যে উহা খায়, তাহার প্রমাণ ত ঐ জেলের ছেলের কাছেই পাওয়া গেল।

এই সকল জেলেরা মাদরাজি; ইহাদিগকে নোরিয়া বলে। চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে, সকল বিষয়েই ইহারা উড়িয়াদের চাইতে অনেক বিভিন্ন। সেখানকার দেশীয় জেলেও আছে, কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরে না, তেমন সাহস আর উদ্যোগ তাহাদের নাই।

ভারতবর্ষের গরীব লোকেরা কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আর ক্লেশ পাইয়া দুবেলা দুই মুঠো ভাতের যোগাড় করে, তাহা এই নোরিয়াদিগকে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য আমাদের দেশের জেলেরাও কম কষ্ট পায় না। শীত, গ্রীষ্ম, রোদ, বৃষ্টি, কুমীরের ভয় ইহাদের বেলাও খুব আছে। কিন্তু সমুদ্রে মাছ ধরার যে ক্লেশ দেখিয়াছি, তাহার কাছে ঐ সকল কিছুই নহে।

সচরাচর তিন রকম উপায়ে ইহারা মাছ ধরিয়া থাকে। এক উপায়, ছোট ছোট জাল লইয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট মাছ ধরা। হাত পনর লম্বা আর হাত দেড়েক চওড়া একখানি জাল, তাহার মাঝে মাঝে এড়োবাগে সরু সরু কাঠি পরান। দুজন লোক জালের দুই মাথায় ধরিয়া জলের ধারে ধারে চলিতে থাকে। যাই একটা ঢেউ আসিয়া ডাঙ্গার উপরে খানিক দূর অবধি উঠিয়া যায়, অমনি তাহার ফিরিবার পথে জালখানিকে দুজনে বেড়ার মতন খাড়া করিয়া ধরিয়া তাহার পথ আগলায়। কাঠির সাহায্যে জালখানি বেশ দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং জল সরিবার সময় তাহাকে জালের ভিতর দিয়া সরিতে হয়, আর মাছ আটকা পড়ে। বড় ঢেউ থাকিলে এ উপায়ে মাছ

ধরা চলে না, আর ইহাতে ছোট ছোট মাছই পড়ে, তাহাও বেশী নহে। তবে ইহাতে ঝঞ্ঝাট নাই।

দ্বিতীয় উপায়, কাটমারণে করিয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়া জাল দিয়া মাছ ধরা। এ জাল কি রকম তাহা দেখি নাই। কারণ যাইবার সময় উহা গুটান থাকে, আর মাছ ধরিবার কাজটা সমুদ্রের ভিতরে এত দূরে হয় যে, ভাল করিয়া দেখাই যায় না। জেলেরা সকাল সকাল উঠিয়া মাছ ধরিতে বাহির হয়, আর দুপুর বেলায় ফিরিয়া আসে। যাইবার সময় ঢেউয়ের হাতে উহাদিগকে বিস্তর লাঞ্ছনা পাইতে হয়। কতবার কাটমারণ শুদ্ধ উল্টাইয়া জলে পড়ে। আবার সেই ঢেউয়ের অত্যাচারের ভিতরেই কাটমারণ সোজা করিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে হয়। কাটমারণে না গিয়া যদি নৌকায় যাইতে হইত, তবে আর মাছ ধরা সম্ভব হইত না। কাটমারণের কাঠগুলি কর্কের মতন জলে ভাসে, আর খুব হাল্‌কা। কাটমারণ উল্টিয়া গেলে তাহাকে সহজেই সোজা করা যায়। আর তাহার জল সেচিবার দরকার হয় না। নৌকা উল্টিয়া গেলে তাহাকে ঐ ঢেউয়ের মুখে সোজা করাই অসম্ভব হইত, তাহার উপর আবার উহার জল সেঁচার দরকার। এই জন্যই ঐ স্থলে নৌকা ব্যবহার হইতে পারে না। আর নৌকায় করিয়া ঐ প্রণালীতে মাছ ধরাও সহজ হইত না।

ছোট ছোট এক একটি কাটমারণে দুজন লোক ধরে। দুজনে মিলিয়া মাছও ধরে, কাটমারণও সামলায়, আর তাহা করিতেই তাহাদের সময় যায়। শরীরের যত্ন করিবার অবসরও হয় না, সুতরাং তাহার কোন চেষ্টাও হয় না। তবে টুপী পরিয়া মাথাটাকে বাঁচাইবার কতক চেষ্টা হইয়া থাকে বটে। এ সকল টুপী উহারা বাঁশের চটা দিয়া নিজেই বুনিয়া থাকে। দেখিতে ঠিক সেঁউতীর মতন।

এ সকল উপায়ে মাছ ধরিতে ছোট ছোট জালই ব্যবহার হয়। নভেম্বর মাস হইতে উহারা বড় বড় জাল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। আর সেই সময় হইতেই মাছ ধরা দেখিবার আমোদ আরম্ভ হয়। তখন আর কাটমারণে কাজ চলে না, নৌকার দরকার হয়। নৌকায় করিয়া অনেক দূর অবধি জাল ফেলিয়া আসে; তারপর ডাঙ্গার আসিয়া তাহাকে টানিয়া তোলে। এক একটা জালের পিছনে ২০।২৫ জন করিয়া লোক খাটিতে হয়। স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়ো, সকলে মিলিয়া উহাতে যোগ দেয়।

আসল যে জাল, সেটা একটা প্রকাণ্ড থলে; তাহার ভিতরে ২০।২২ জন মানুষ পূরিয়া রাখা যায়। এই থলের বিনুনী খুব ঘন আর মজবুত; একটা ডান্‌কোনা মাছও

তাহার ফাঁক দিয়া গলিতে পারে না। থলের মুখের দুই পাশ হইতে খুব লম্বা লম্বা দুখানা জাল বাহির হইয়াছে; তাহার এক ধার জলের উপরে ভাসে, আর এক ধার জলের নীচে ডুবিয়া ঝুলিতে থাকে। এই যে দুপাশের দুখানা জাল, তাহার বুনট থলের মতন এত ঘন নহে; আর থলের মুখ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই উহার ফোকর বড় হইয়া শেষটা এত বড় হয় যে তাহার ভিতর দিয়া তুমি আমিও ইচ্ছা করিলে গলিতে পারি। এত বড় ফোকরের ভিতর দিয়া মাছ কেন গলিয়া পালায় না, আমি অনেক সময় এ কথা ভাবিয়াছি।

জালখানিকে রীতিমত সমুদ্রে ফেলা হইলে, প্রায় সিকি মাইল জায়গা ঘেরা হয়। সিকি মাইল দূরে সমুদ্রের ভিতরে থলেটা থাকে। তাহার মুখের এক পাশ জলের উপরে, এক পাশ জলের নীচে থাকে; যেন সে মাছগুলিকে গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। এই হাঁ করা মুখের দুপাশ হইতে দুখানি জালের বেড়া ডাঙ্গা অবধি গিয়াছে; মাঝখানে মাছ রহিয়াছে। তাহাদের সমূহই বিপদ, কিন্তু তখনও তাহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যদি পারিত, তবে তাহাদের অধিকাংশই অনায়াসে ঐ সকল বড় বড় ফোকরের ভিতর দিয়া গলিয়া বাঁচিতে পারিত। কিন্তু তাহারা ত তখনও সেই সিকি মাইল দূরের সর্ব্বনেশে থলের সংবাদ পায় নাই। তাহারা প্রথমে খালি সেই বড় বড় ফোকরওয়ালা বেড়া দুখানিকেই দেখে, আর তাহাদের সাদাসিধা হিসাবে সেই বেড়াকেই সন্দেহ করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে। কাজেই সেই সকল বড় বড় ফোকরের মধ্য দিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ তাহাদের চলিয়া যায়।

এ দিকে জেলেরা ডাঙ্গায় থাকিয়া দুই বেড়ার দুই মাথা একত্র করিয়া জালে টান ফেলিয়াছে। তাহাদের দুজন জলে নামিয়া ক্রমাগত জাল ঠিক করিতেছে, যাহাতে ঢেউয়ের তাড়ায় জাল জড়াইয়া গিয়া মাছ পলাইবার সুবিধা না হয়। ইহাদের গোলমালে মাছগুলি একদিকে যেমন জাল হইতে দূরে থাকিতেছে, আরেক দিকে তেমনি ডাঙ্গার দিক হইতে থলের দিকে গিয়া জড় হইতেছে। সে দিকে জালের ফোকর ক্রমেই ছোট ছোট, সুতরাং সে পথে পলাইবার আর ভরসা নাই। তখন ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক, ঐ থলের ভিতরেই তাহাদিগকে ঢুকিতে হয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ!" অর্থাৎ যাহারা বোকা, বিপদ হইয়া গেলে পরে তাহাদের চৈতন্য হয়, সারা বছর নিদ্রায় কাটাইয়া পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্রবাবুদের যে দশা হয়, সেইরূপ!

এত পরিশ্রম করিয়া জালে কি উঠে, তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে ফল বড়ই অনিশ্চিত! এক এক দিন থলে এমনি বোঝাই হইয়া উঠে যে সকলে

মিলিয়া তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় আনাই কঠিন হয়। আবার একদিন দেখিলাম যে একটা জালে এক্ক্ষেপে মোটে সাড়ে পাঁচ আনার মাছ উঠিল। যে জেলের জালে ঐরূপ হইয়াছিল সে আমাকে বলিল "বাবু, কাল খুব মাছ পাইয়াছিলাম, তিন শ টাকার মাছ বেচিয়াছি।"

জালে জেলী ফিস্‌টা খুবই উঠে। জাল ডাঙ্গায় উঠিবার পূর্ব্বেই একথা বলা যায় যে আর কিছু উঠুক আর না উঠুক, ঝুড়ি খানেক জেলী ফিস্ উঠিবে। আর একটা বিষয় এই দেখা যায় যে, এক একটা জালে এক এক জাতীয় মাছই খুব বেশী পড়ে। খণ্ডবালিয়া উঠিল ত দেখিবে খালি খণ্ডবালিয়াতেই জাল বোঝাই। কোন দিন হয়ত দেখিবে, থলের প্রায় প্রত্যেক ফোকরেই একটা কাঁকাল মাছের ঠোঁট বাহির হইয়াছে! ইহাতে বুঝা যায় যে এই সকল মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায়, আর জালে পড়িলে ঝাঁক শুদ্ধই পড়ে। খুব বড় মাছ আমি জালে পড়িতে দেখি নাই।

হারকিউলিস

(২)

বরাহ মারিয়া হারকিউলিস অল্পই বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইলেন—কারণ তারপরই এলিস্ নগরের রাজা অগিয়াসের গোয়ালঘর সাফ করিবার জন্য তাঁহার ডাক পড়িল। আগিয়াসের প্রকাণ্ড গোয়ালঘরে অসংখ্য গরু, কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া সে ঘর কেহ ঝাঁট দেয় না, ধোয় না—সুতরাং তাহার চেহারাটি তখন কেমন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখ। গোয়ালঘরের অবস্থা দেখিয়া হারকিউলিস ভাবনায় পড়িলেন। প্রকাণ্ড ঘর, তাহার ভিতর হাঁটিয়া দেখিতে গেলেই ঘণ্টাখানেক সময় যায়। সেই ঘরের ভিতর হয়ত বিশ বৎসরের আবর্জ্জনা জমিয়াছে—অথচ একজন মাত্র লোকে তাহাকে সাফ করিবে। ঘরের কাছ দিয়া আল্‌ফিউস্ নদী স্রোতের জোরে প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে—হারকিউলিস ভাবিলেন "এই ত চমৎকার উপায় হাতের কাছেই রহিয়াছে!" তিনি তখন একাই গাছ পাথরের বাঁধ বাঁধিয়া স্রোতের মুখ ফিরাইয়া, নদীটাকে সেই গোয়ালঘরের উপর দিয়া চালাইয়া দিলেন। নদী হু হু শব্দে নূতন পথে বহিয়া চলিল, বিশ বৎসরের জঞ্জাল মুহূর্ত্তের মধ্যে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। তারপর যেখানকার নদী সেখানে রাখিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

এদিকে ক্রীট্‌দ্বীপে আর এক বিপদ দেখা দিয়াছে। জলের দেবতা নেপ্‌চুন সে দেশের রাজাকে এক প্রকাণ্ড ষাঁড় উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই জন্তুটিকে তুমি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলি দাও"। কিন্তু ষাঁড়টি এমন আশ্চর্য্য রকম সুন্দর যে তাহাকে বলি দিতে রাজার মন সরিল না—তিনি তাহার বদলে আর একটি ষাঁড় আনিয়া বলির কাজ সারিলেন। নেপ্‌চুন সমুদ্রের নীচে থাকিয়াও এ সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার ষাঁড়কে আদেশ দিলেন "যাও! এই দুষ্ট রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া ইহার অবাধ্যতার সাজা দাও"। নেপ্‌চুনের আদেশে সেই সর্ব্বনেশে ষাঁড় পাগলের মত চারিদিকে ছুটিয়া সারাটি রাজ্য উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। একে দেবতার ষাঁড়, তার উপর, যেমন পাহাড়ের মত দেহখানি, তেমনি আশ্চর্য্য তার শরীরের তেজ—কাজেই রাজ্যের লোক প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য ব্যস্ত। এমন জন্তুকে বাগাইবার জন্য ত হারকিউলিসের ডাক পড়িবেই। হারকিউলিসও অতি সহজেই তাহাকে শিং ধরিয়া মাটিতে আছড়াইয়া একেবারে পোঁটলা বাঁধিয়া রাজসভায় নিয়া হাজির করিলেন। রাজা ইউরিস্‌থিয়ুসের মেয়ে বাপের বড় আদুরে। সে একদিন আব্দার ধরিল তাহাকে হিপোলাইটের চন্দ্রহার আনিয়া দিতে হইবে। হিপোলাইট এসেজনদের রাণী। এসেজনদের দেশে কেবল মেয়েদেরই রাজত্ব। বড় সর্ব্বনেশে মেয়ে তারা—সর্ব্বদাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, পৃথিবীর কোন মানুষকে তারা ডরায় না। কিন্তু হারকিউলিসকে তাহারা খুব খাতির সম্মান করিয়া তাহাদের রাণীর কাছে লইয়া গেল। হারকিউলিস তখন রাণীর কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। রাণী বলিলেন, "আজ তুমি খাও দাও বিশ্রাম কর", কাল অলঙ্কার লইতে আসিও"। হারকিউলিসের সৎমা জুনোদেবী দেখিলেন নেহাৎ সহজেই বুঝি এবারের কাজটা উদ্ধার হইয়া যায়। তিনি নিজে এসেজন সাজিয়া এসেজন দলে ঢুকিয়া সকলকে কুমন্ত্রনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "এই যে লোকটি রাণীর কাছে অলঙ্কার ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, ইহাকে তোমরা বড় সহজ পাত্র মনে করিও না। আসলে কিন্তু এ লোকটা আমাদের রাণীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে চায়। অলঙ্কার টলঙ্কার ওসকল মিথ্যা কথা—কেবল তোমাদের ভুলাইবার জন্য"। তখন সকলে রুখিয়া একেবারে মার মার শব্দে হারকিউলিসকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিস একাকী গদাহাতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর এসেজনরা বুঝিল হারকিউলিসের সঙ্গে পারিয়া উঠা তাহাদের সাধ্য নয়। তখন তাহারা রাণীর চন্দ্রহার হারকিউলিসকে দিয়া বলিল "যে অলঙ্কার তুমি চাহিয়াছিলে,

এই লও। কিন্তু তুমি এদেশে আর থাকিতে পাইবে না"। হারকিউলিসের কাজ উদ্ধার হইয়াছে তাঁহার আর থাকিবার দরকার কি? তিনি তখনই তাহাদের নমস্কার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইউরিস্থিয়ুস্ মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "হারকিউলিস আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি আমার জন্য আটটি বড় কাজ করিলে এখন আর চারিটি কাজ করিলে তোমার ছুটি। প্রথম কাজ এই যে ষ্টাইম্‌ফেলাসের সমুদ্রতীরে যে বড় বড় লৌহমুখ পাখী আছে, সেগুলাকে মারিতে হইবে"। হারকিউলিস হাইড্রার রক্তমাখা বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়া সহজেই পাখীগুলাকে মারিয়া শেষ করিলেন।

ইহার পর তিনি রাজার হুকুমে গেরিয়ানিস্ নামে এক দৈত্যের গোয়াল হইতে তাহার গরুর দল কাড়িয়া আনিলেন। পথে ক্যাকাস নামে একটা কদাকার দৈত্য কয়েকটা গরু চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হারকিউলিস্ তাহাকে তাহার বাসা পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া শেষে গদার বাড়িতে তাহার মাথা গুঁড়াইয়া দেন।

পশ্চিমের দেবতা সন্ধ্যাতারার মেয়েদের নাম হেস্‌পেরাইডিস্। লোকে বলিত তাহাদের বাগানে আপেল গাছে সোণার ফল ফলে। একদিন রাজা সেই ফল হারকিউলিসের কাছে চাহিয়া বসিলেন। এমন কঠিন কাজ হারকিউলিস্ আর করেন নাই। ফলের কথা সকলেই জানে, কিন্তু কোথায় যে সে ফল, আর কোথায় যে সে আশ্চর্য্য বাগান, কেউ তাহা বলিতে পারে না। হারকিউলিস্ দেশ বিদেশ ঘুরিয়া কেবলই জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেউ তাহার জবাব দিতে পারে না। কত দেশের কত রকম লেকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, সকলেই বলে "হাঁ, সেই ফলের কথা আমরাও শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় সে বাগান তাহা জানি না"। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে একাদন হারকিউলিস্ এক নদীর ধারে আসিয়া দেখিলেন কয়েকটি মেয়ে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। হারকিউলিস বলিলেন, "ওগো, তোমরা হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের কথা জান? সেই যেখানে আপেল গাছে সোণার ফল ফলে"? মেয়েরা বলিল, "আমরা নদীর মেয়ে, নদীর জলে থাকি, আমরা কি দুনিয়ার খবর রাখি? আসল খবর যদি চাও তবে বুড়োর কাছে যাও"। হারকিউলিস্ বলিলেন, "কে বুড়ো? সে কোথায় থাকে"? মেয়েরা বলিল "সমুদ্রের থুড়্‌থুড়ে বুড়ো, যার সবুজ রঙের জটা, যার গায়ে মাছের মত আঁশ, যার হাত পা গুলো হাঁসের মত চ্যাটাল—সেই বুড়ো যখন তীরে ওঠে তখন যদি তাকে ধর্‌তে পার তবে সে তোমায় বল্‌তে পার্‌বে পৃথিবীর কোথায় কি আছে। কিন্তু

খবরদার! বুড়ো বড় সেয়ানা, তাকে ধর্‌তে পার্‌লে খবরটা আদায় না ক'রে ছেড়ো না"। হারকিউলিস্ তাহাদের অনেক ধন্যবাদ করিয়া বুড়োর খবর লইতে চলিলেন। সমুদ্রের তীরে তীরে খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন হারকিউলিস্ দেখিলেন শেওলার মত পোষাক পরা কে একজন সমুদ্রের ধারে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহার সবুজ চুল আর গায়ের আঁশেই তাহার পরিচয় পাইয়া। হারকিউলিস্ এক লাফে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "বুড়া! হেস্‌পেরাইডিসের বাগানের সন্ধান বল, নহিলে তোমায় ছাড়িব না"। এই বলিতে না বলিতেই বুড়া তাহার সামনেই কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার জায়গায় একটা হরিণ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। হারকিউলিস্ বুঝিলেন এ সব বুড়ার সয়তানী, তাই তিনি খুব মজবুত করিয়া হরিণের ঠ্যাং ধরিয়া থাকিলেন। হরিণটা তখন একটা পাখী হইয়া করুণ-স্বরে আর্ত্তনাদ আর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। হারকিউলিস্ তবু ছাড়িলেন না। তখন পাখাটা একটা তিন-মাথাওয়ালা কুকুরের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসিল। হারকিউলিস্ তখন তাহার ঠ্যাংটা আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

এট্‌লাস্।

তাহাতে কুকুরটা চীৎকার করিয়া গেরিয়ানের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। গেরিয়ানের শরীরটা মানুষের মত, কিন্তু তার ছয়টি পা। এক পা হারকিউলিসের মুঠার মধ্যে, সেইটা ছাড়াইবার জন্য সে পাঁচ পায়ে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল।

তাহাতেও হাত ছাড়াইতে না পারিয়া সে প্রকাণ্ড অজগর সাজিয়া হারকিউলিসকে গিলিতে আসিল। হারকিউলিস ততক্ষণে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, তিনি সাপটাকে এমন ভীষণ ভাবে টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন যে প্রাণের ভয়ে বুড়া তাহার নিজের মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইল। বুড়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "তুমি কোথাকার অভদ্র হে! বুড়া মানুষের সঙ্গে এরকম বেয়াদবি কর!" হারকিউলিস বলিলেন, "সে কথা পরে হইবে, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও"। বুড়া তখন বেগতিক দেখিয়া বলিল, "যাহার কাছে গেলে তোমার কাজটি উদ্ধার হইবে, আমি তাহার সন্ধান বলিতে পারি। এই দিকে আফ্রিকার সমুদ্রতীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি এট্‌লাস্ দৈত্যের দেখা পাইবে। এমন দৈত্য আর দ্বিতীয় নাই। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর সমস্ত আকাশটিকে ঘাড়ে করিয়া সে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। এক মুহূর্ত্ত তাহার কোথাও যাইবার যো নাই, তাহা হইলেই আকাশ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর উপর পড়িবে। মেঘের উপরে কোথায় আকাশ পর্য্যন্ত তাহার মাথা উঠিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে দুনিয়ার সবই সে দেখিতে পায়। সে যদি খুসী মেজাজে থাকে, তবে হয়ত তোমার সোণার ফলের কথা বলিতে পারে।" হারকিউলিস্ তাঁহার গদা ঘুরাইয়া বলিলেন "যদি খুসী মেজাজে না থাকে, তবু সোণার ফলের কথা তাহাকে বলাইয়া ছড়িব"। (ক্রমশঃ)

ডারুইন

ছেলেবেলায় আমারা শুনিয়াছিলাম "মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানর ছিল"। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে ডারুইন নামে কে এক পণ্ডিত নাকি একথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোন দিন বলেন নাই। আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীন কালে বানর ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ একই ছিল। সেই এক পূর্ব্বপুরুষ হইতেই বানর ও মানুষ, এ দুই আসিয়াছে—কিন্তু সে যে কত দিনের কথা তাহা কেহ জানে না।

তখন হইতেই আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল, পণ্ডিতেরা এত খবর জানেন কি করিয়া? তাঁহারা ত সেই প্রাচীন কালের পৃথিবীটাকে চক্ষে দেখিয়া আসেন নাই,

তবে তাহার সম্বন্ধে এত সব কথা তাঁহারা বলেন কিসের জোরে? যাহা হউক, আমরা ত আর পণ্ডিত নই, তাই অনেক কথাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। মানিতে হয় যে এই পৃথিবীটা ফুটবলের মত গোল, এবং সে লাট্টুর মত ঘোরে, আর সূর্য্যের চারিদিকে পাক দিয়া বেড়ায়—যদিও এসবের কিছুই আমরা চোখে দেখি না। ছেলেবেলায় ভাবিতাম, পণ্ডিতদের খুব বুদ্ধি বেশী, তাই তাঁহারা অনেক কথা জানিতে পারেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল তাহা নয়। বুদ্ধি ত চাইই, তা ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিষ চাই, যাহা না থাকিলে কেউ কোন দিন যথার্থ পণ্ডিত হইতে পারে না। তার মধ্যে একটি জিনিষ, ঠিকমত দেখিবার শক্তি। সাধারণ লোকে যেমন দু একবার চোখ বুলাইয়া মনে করে ইহার নাম "দেখা"—পণ্ডিতের দেখা সে রকম নয়। তাঁহারা একই বিষয় লইয়া দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তবু দেখার আর শেষ হয় না। মাথার উপর এত যে তারা সারারাত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, আবার দিনের আলোয় মিলাইয়া যায়, পণ্ডিতেরা কত হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা দেখিতেছেন তবু তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ তারা ঠিক কোন্খানে থাকে, কোন্ তারাটা কতখানি স্থির বা কিরকম অস্থির, তাদের রকম সকম কোন্টার কেমন—এই সবের সূক্ষ্ম হিসাব লইতে লইতে পণ্ডিতের বড় বড় পুঁথি ভরিয়া উঠে। সেই সব হিসাব ঘাঁটিয়া তাহার ভিতর হইতে কত আশ্চর্য্য নূতন কথা তাঁহারা বাহির করেন, যাহা সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত ও আজগুবি শুনায়।

আজ এক পণ্ডিতের কথা বলিব, তাঁহাকে কেহ খুব বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত না, মাষ্টারেরা তাঁহার উপর কোনদিনই কোন আশা রাখেন নাই—বরং সকলে দুঃখ করিত "এ ছেলেটার আর কিছু হইবে না"। অথচ এই ছেলেই কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে আপনার নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম চার্লস্ ডারুইন। পড়ার দিকে ডারুইনের বুদ্ধি খুলিত না, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। সেটি কেবল নানা অদ্ভুত জিনিষ সংগ্রহ করা! শামুক ঝিনুক হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গা জিনিষ বা পাথরের কুচি পর্য্যন্ত নানা জিনিষে তাঁহার বাক্স ও পড়িবার টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত। বালকের এই আগ্রহটা অন্য লোকের কাছে অন্যায় বাতিক বা উপদ্রব বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু তবু কেহ তাহাতে বড় একটা বাধা দিত না। কারণ, ডারুইনের মনটা স্বভাবতই এমন কোমল এবং তাঁহার স্বভাব এমন মিষ্ট ছিল যে সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত।

ছেলেবেলায় পড়ার মধ্যে একটি বই ডারুইন খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলেন—তাহাতে পৃথিবীর নানা অদ্ভুত জিনিষের কথা ছিল। সেই বই পড়িয়া অবধি তাঁহার মনে দেশ বিদেশ ঘুরিবার সখটা জাগিয়া উঠে। কলেজে আসিয়া ডারুইন প্রথমে গেলেন ডাক্তারি শিখিতে। সে সময় ক্লোরোফর্ম্ম ছিল না, তাই রোগীদের সজ্ঞানেই অস্ত্রচিকিৎসার ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া করুণহৃদয় ডারুইনের মন এমন দমিয়া গেল যে তাঁহার আর ডাক্তারি শেখা হইল না। তখন তিনি ধর্ম্মযাজক হইবার ইচ্ছায়, স্কট্লণ্ড ছাড়িয়া ইংলণ্ডে ধর্ম্মতত্ত্ব শিখিতে আসিলেন। শিক্ষার দশা এবারও প্রায় পূর্ব্বের মতই হইল—কারণ, বাল্যকালে তিনি গ্রীক্ প্রভৃতি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন এ কয় বছরে তাহার সবই প্রায় ভুলিয়া বসিয়াছেন, ভুলেন নাই কেবল সেই নানা জিনিষ সংগ্রহের অভ্যাসটা। কলেজে তাঁহার সহপাঠি বন্ধুরা দেখিত, ডারুইন সুযোগ পাইলেই মাঠে ঘাটে জঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন। হয়ত সারা-দিন কোন পোকার বাসার কাছে পড়িয়া তাহার চালচলন স্বভাব সমস্ত যারপর নাই মনযোগ করিয়া দেখিতেছেন। এ বিষয়ে কেবল নিজের চোখে দেখিয়া তিনি এমন সব আশ্চর্য্য খবর সংগ্রহ করিতেন, যাহা কোন পুথিতে পাওয়া যায় না। বন্ধুরা এই সব ব্যাপার লইয়া নানা রকম ঠাট্টা তামাসা করিত, কেহ কেহ বলিত "ডারুইন পণ্ডিত হইবে দেখিতেছি"। ডারুইন যে পণ্ডিত হইতে পারেন, এটা কাহারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া বোধ হইত না।

এইরূপে বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে "বীগল্" নামে এক জাহাজ পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইল—ডারুইন বিনা বেতনে প্রাণীতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পাঁচ বৎসর জাহাজে করিয়া তিনি পৃথিবীর নানা স্থান ঘুরিয়া

বেড়াইলেন এবং প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে এমন আশ্চর্য্য নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন যে তাহা তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও জীবনকে, একেবারে নূতন পথে লইয়া চলিল। ডারুইন বলেন ইহাই

তাঁহার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনা।
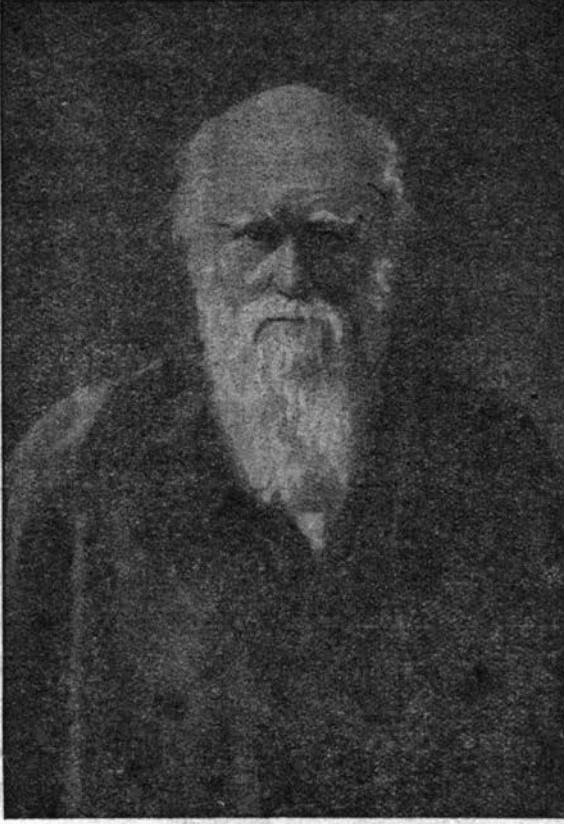
তার পর কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডারুইন এই সমস্ত বিষয় লইয়া গভীর ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীনকালে যে সকল জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল, আজ তাহারা নাই, কেবল কতগুলি কঙ্কালচিহ্ণ দেখিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। আজ যেসকল জীবজন্তু দেখিতেছি, তাহারাও ভুঁইফোঁড় হইয়া হঠাৎ দেখা দেয় নাই—ইহারাও সকলেই সেই আদিম কালের কোন না কোন জন্তুর বংশধর। কেমন করিয়া এ পরিবর্ত্তন হইল? এরূপ পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি? যে গাছের যে ফল তাহার বীচি পুঁতিলে সেই ফলেরই গাছ হয়, তাহাতে সেইরূপই ফল ফলে, আমরা ত এইরূপই দেখি। যে জন্তুর আকার প্রকার যেমন, তার ছানাগুলাও হয় সেইরূপ। শেয়ালের বংশে শেয়ালই জন্মে। শেয়ালের ছানা, তার ছানা, তার ছানা, তার ছানা, এরূপ যতদূর দেখিতে পাই সকলেই ত শেয়াল। তবে এ আবার কোন্ সৃষ্টিছাড়া নিয়ম, যাহাতে এক জন্তুর বংশে ক্রমে এমন জন্তুর জন্ম হয়, যাহাকে আর সেই বংশের সন্তান বলিয়া চিনিবার যো

থাকে না ? ডারুইন দেখিলেন, তিনি নিজে যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতেই নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের অতি চমৎকার মীমাংসা করা যায়।

যাহারা ওস্তাদ মালী, তাহারা ভাল ভাল গাছের 'কলম' করিবার সময়, বা বীজ পুঁতিবার সময় যে-সে গাছের বীজ বা কলম লইয়া কাজ করে না। ভাল গাছ, ভাল ফুল, ভাল ফল বাছিয়া বাছিয়া, তাহাদের মধ্যে নানা রকম মিশাল করাইয়া খুব সাবধানে পছন্দমত গাছ ফুটাইয়া তোলে। যেগুলা তাহার পছন্দসই নয়, সেগুলাকে সে একেবারেই বাদ দেয়। তাহার ফলে অনেক সময় গাছের চেহারার আশ্চর্য্যরকম উন্নতি ও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। একটা সামান্য জংলি ফুল আজ মানুষের চেষ্টা ও যত্নে সুন্দর গোলাপ হইয়া উঠিয়াছে—নানা লোকে গোলাপের চর্চ্চা করিয়া আপন পছন্দমত নানারূপ বাছাই করিয়া, নানা রকম মিশাল দিয়া কত যে নূতন রকমের গোলাপ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। যাহারা ব্যবসার জন্য বা সখের জন্য নানারূপ জন্তু পালে তাহারা জানে যে কোন জন্তুর বংশের উন্নতি করিতে হইলে রুগ্ন-কুৎসিৎ বা অকর্ম্মণ্য জন্তুগুলাকে বাদ দিতে হয়। তাহার পর যেরূপ গুণ ও লক্ষণ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া জোড় মিলাইবে, বংশের মধ্যে সেই সব লক্ষণ ও গুণ পাকা হইয়া উঠিবে। লম্বা শিংওয়ালা ভেড়া চাও ত বাছিবার সময় লম্বা শিং দেখিয়া বাছিবে। তাহাদের যে সব ছানা হইবে, তাহাদের মধ্যে যেগুলার শিং ছোট, তাহাদের বাদ দিবে। এইরূপে ক্রমে লম্বা শিঙের দল গড়িয়া উঠিবে।

ডারুইন দেখিলেন, মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানারকম বাছাবাছি চলে, প্রাণিজগতেও সর্ব্বত্রই স্বাভাবিকভাবে সেইরূপ বাছাবাছি চলে। যারা রুগ্ন যারা দুর্ব্বল মরিবার সময় তাহারাই আগে মরে, যাহারা বাহিরে নানা অবস্থার মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে তাহারাই টিঁকিয়া যায়। কাহারও গায়ে জোর বেশী, সে লড়াই করিয়া বাঁচে ; কেহ খুব ছুটিতে পারে, সে শত্রুর কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচে ; কাহারও চামড়া মোটা সে শীতের কষ্ট সহিয়া বাঁচে, কাহারও হজম বড় মজবুত সে নানা জিনিষ খাইয়া বাঁচে, কাহারও গায়ের রং এমন যে হঠাৎ চোখে মালুম হয় না, সে লুকাইয়া বাঁচে। বাঁচিবার মত গুণ যাহার নাই, সে বেচারা মারা যায়, আর সেই সব গুণ আর লক্ষণ যাহাদের আছে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, তাহাদেরই বংশ বিস্তার হয়, আর বংশের মধ্যে যেই সব বাছা বাছা গুণগুলিও পাকা হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য

সংগ্রাম করিতে করিতে বাহিরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জন্তুর চেহারা নানারকম ভাবে গড়িয়া উঠে।

ডারুইন দেখাইলেন, এইরূপে এবং আরও নানাকারণে আপনা হইতেই এক একটা জন্তুর চেহারা নানারকমে বদলাইয়া যায়। সেই হুঁকার গল্প তোমরা শুনিয়াছ, যার সবই ঠিক ছিল কেবল নল্‌চে আর মালাটি বদল হইয়াছিল? এক একটা জানোয়ারও ঠিক সেইরূপ নল্‌চে মালা সবই বদল করিয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে—তখন তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন জন্তু বলিয়া ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

ডারুইনের কথা বলিতে গেলে দুটি গুণের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয়—একটি তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায় তার একটি তাঁর মিষ্ট স্বভাব। তাঁর শরীর কোন কালেই খুব সুস্থ ছিল না—জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর সে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের শক্তি আশ্চর্য্য রকম সতেজ ছিল। প্রতিদিন ভোরের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি বাগানে যাইতেন—সেখানে ফুল ফল মৌমাছি আর প্রজাপতির সঙ্গে পরিচয় করিতে করিতে কোন্ দিক দিয়া যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত কত সময় তাঁহার সে খেয়ালই থাকিত না।

ডারউইনকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা বলেন যে, সকলকে প্রাণ দিয়া এমন ভালবাসিতে আর কেহ পারে না। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী নয়, গাছের ফুলটিকে পর্য্যন্ত তিনি এমন ভাবে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, যে লোকে অবাক হইয়া যাইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ জাতি সেই "অল্পবুদ্ধি" ছাত্রকে পরম আদরে বিজ্ঞানবীর নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। দাঁত। ২। কারণ।
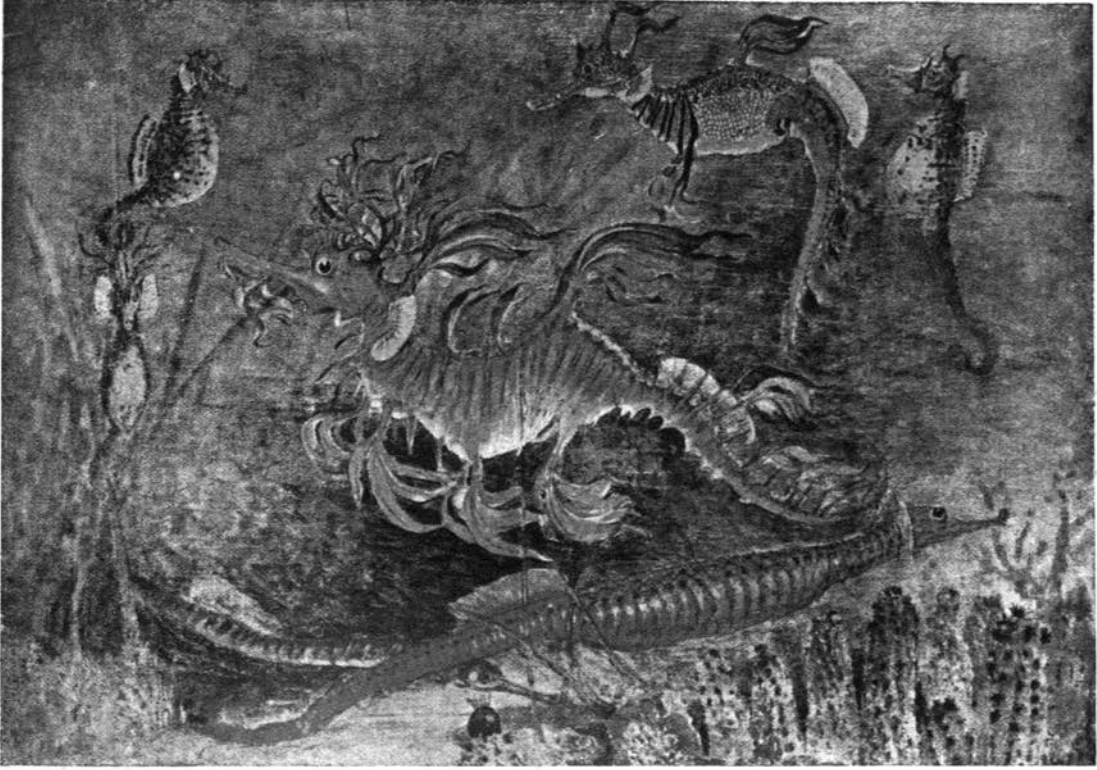
"সমুদ্রের ঘোড়া"

পঞ্চম বর্ষ মাঘ, ১৩২৪ দশম সংখ্যা

সাথী

নাই কি খেলার সাথী আমার ?
গাছ পালারে যতন করি, যোগায় তারা কুসুম ভার !
দুপুর বেলা মাঠের দূরে,
রাখাল চরে বাঁশীর সুরে,
চরায় ধেনু ছায়ার পথে, আমায় করে দোসর তার !
নাইকি খেলার সাথী আমার !
বনের মাঝে কতই পাখী
কতই কি যে বলছে ডাকি,
নতুন সুরে, নতুন পথে পরাণ যেতে ঘরের বা'র !
তারার চোখে খবর আসে,
চাঁদনি ডাকে জলের পাশে,
আলোর পথে ভাসিয়ে ভেলা, দেখবে এস নতুন পার !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

নকল বাসুদেব

(বিষ্ণু পুরাণ)

১

পৌণ্ড্রবংশীয় কোন রাজাকে তাঁহার প্রজাগণ সর্ব্বদাই এই বলিয়া স্তব করিত—"মহারাজ! আপনিই পৃথিবীতে বাসুদেবরূপে জন্মিয়াছেন। যদুকুলের কৃষ্ণকে যে বাসুদেব বলে সে কথা মিথ্যা।" সকলেই এরূপ স্তব করাতে ক্রমে তিনি বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। মূর্খ রাজাও ভাবিলেন তিনি সত্যসত্যই বাসুদেব। তখন তিনি করিলেন কি,—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি কৃষ্ণের সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে রথের চূড়াটি পর্য্যন্ত ঠিক গরুড়ের মত পক্ষী দিয়া প্রস্তুত করাইলেন। তারপর দূতদ্বারা কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি বাসুদেব নাম ছাড়, তোমার চিহ্ন সকলও পরিত্যাগ কর—আমিই প্রকৃত বাসুদেব। আর, ভাল চাও ত এখনই আসিয়া আমার শরণ লও।"

দূত দ্বারকায় গিয়া এই সংবাদ জানাইলে কৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। আর বলিলেন—"দূত! তোমার রাজাকে গিয়া বল, কৃষ্ণ শীঘ্রই আপনার পুরীতে আসিবেন এবং আপনার সাক্ষাতেই তাঁহার চিহ্ন চক্র আপনার প্রতি পরিত্যাগ করিবেন।" দূতকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিঠে চড়িয়া তিনি পৌণ্ড্রক রাজার পুরীতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দূতমুখে সংবাদ পাইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সহায় হইলেন প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজ। এই দুই দল একত্র হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। দূর হইতে কৃষ্ণ দেখিলেন রাজা পৌণ্ড্রক সত্যসত্যই তাঁহার চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছে, তাহার রথের চূড়ায় পর্য্যন্ত গরুড়ের মত পক্ষী। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ হাসিয়াই খুন! যাহা হউক, ক্ষণকাল মধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার—মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন, তাঁহার সহিত কে যুদ্ধ করিয়া পারিবে? তাঁহার শার্ঙ্গ ধনুর আগুনের মত উজ্জল বাণগুলি দেখিতে দেখিতে পৌণ্ড্রকের সৈন্য লণ্ডভণ্ড করিল। তারপর কৃষ্ণ নিমেষমধ্যে কাশীরাজের সৈন্যগণেরও সেই দশা করিলেন। এইরূপে উভয় সৈন্যদলকে পরাজয় করিয়া মূর্খ পৌণ্ড্রককে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হে বাসুদেব! তুমি দূতদ্বারা আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ

করিতে বলিয়াছিলে, এখন তাহা করিতেছি। এই আমার চক্র ছাড়িলাম, তোমার জন্য আমার গদাও ছাড়িলাম। আর আমার গরুড়ও তোমার রথের চূড়ায় আরোহণ করুক।" এই বলিয়া কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ও গদা ছাড়িয়া পৌণ্ড্রককে বিনাশ করিলেন। আর তাঁহার বাহন গরুড়ও পৌণ্ড্রকের রথে চড়িয়া গরুড় ধ্বজটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

বন্ধুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কাশীরাজের ভয়ানক রাগ হইল, তিনি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায়! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়া গেল! কৃষ্ণ অতি সাংঘাতিক এক বাণে কাশীরাজের মাথাটি কাটিয়া সেই মাথা কাশীপুরীতে ফেলিলেন। তার পর সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না।

এদিকে কাশীরাজের পুরীতে তাঁহার কাটামাথা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া রাজবাড়ীর লোকজন "হায় কি সর্ব্বনাশ! হায় কি সর্ব্বনাশ! কে এ কাজ করিল?" বলিয়া ভীষণ কোলাহল আরম্ভ করিলে রাজবাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমে সকলে জানিতে পরিল যে কৃষ্ণই এ কাজ করিয়াছেন। তখন কাশীরাজপুত্র পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যেরূপেই হউক ইহার প্রতিশোধ লইব। এবং সে জন্য মহাদেবের উদ্দেশে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তাহার পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও বল।" তখন কাশীরাজপুত্র বর চাহিলঃ—

"এই কৃষ্ণ দুরাচার পিতৃহন্তা মম
বধার্থে ইহারে দাও কৃত্যা অগ্নিসম।"

অর্থাৎ এই দুরাচার কৃষ্ণ আমার পিতৃহন্তা, ইহাকে মারিবার জন্য অগ্নিময়ী কৃত্যা সৃষ্টি করিয়া দাও।

মহাদেব "আচ্ছা, তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেবের বরে তখনই মহাকৃত্যা শক্তির সৃষ্টি হইল। সে অতি ভীষণ দেবতা! তাঁহার মুখ দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইতেছে, মাথার চুলগুলি আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। এই ভীষণ কৃত্যা "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীগণ এই মহা ভয়ঙ্কর কৃত্যা দেবীটিকে দেখিয়া ভয়ে কৃষ্ণের শরণ লইল। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে কাশীরাজপুত্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই কৃত্যা উৎপাদন করিয়াছে। তখন তিনি "এই কৃত্যাকে বধ কর" বলিয়া সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন।

সুদর্শন চক্র দেখিবামাত্র কৃত্যা ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, চক্রও তাঁহার

পিছনে তাড়া করিয়া চলিল। ছুটিতে ছুটিতে কৃত্যা বারাণসী পুরিতে প্রবেশ করিলেন চক্র কিন্তু তবু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। তখন কাশীরাজ সৈন্য সাজিয়া গুজিয়া চক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু চক্রের তেজে শুধু যে সৈন্যগণ দগ্ধ হইল তাহা নহে, সেই ভীষণ কৃত্যা এবং বারাণসী পুরীটিও চক্ষের নিমেষে পুড়িয়া ছার খার হইয়া গেল। সেই পুরীতে রাজপুত্র, রাণী, দাসদাসী লোকজন যাহারা ছিল সকলকেই দগ্ধ করিয়া সুদর্শন চক্র পুনরায় কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—রাজকুমার মহাদেবের বর পাইয়াও কেন নিস্ফল হইল? এ কথার উত্তর এই—কাশীরাজপুত্রের প্রার্থনার ইহাও অর্থ করা যায় যে—"এই যে পিতৃহন্তা দুরাচার কৃষ্ণ, আমার বধের জন্য, ইহাকে অগ্নিময়ী কৃত্যা গড়িয়া দাও।" সুতরাং মহাদেবের বর এই উল্টা অর্থেই সফল হইল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

মুলদেবের উপাখ্যান

রাজা বিক্রমাদিত্যের এক অতিশয় চতুর সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মুলদেব। ব্রাহ্মণ মুলদেবের মত তেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি উজ্জয়িনী নগরে অন্য কাহারও ছিল না, এমন কি দেশ বিদেশেও মুলদেবের বুদ্ধির কথা অনেকেই জানিত। এই সব কারণে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন।

একবার মুলদেব শুনিলেন যে পাটলিপুত্রের লোকেরা না কি বড় প্রসিদ্ধ চতুর। তখন তিনি ভাবিলেন—"পাটলিপুত্র গিয়া নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিব এ কথা সত্য কি না।" ইহার পর একদিন তিনি তাঁহার বন্ধু শশী এবং অপর কয়েক জনের সঙ্গে পাটলিপুত্র যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া সহরের বাহিরে একটা পুকুরের পাড়ে দেখিলেন এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া কাপড় কাচিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ী মা! এখানে আগন্তুক পথিকদিগের থাকিবার স্থান কোথায়?" বুড়ি বলিল—"এই পুকুরের পাড়ে হাঁস থাকে, জলে মাছ থাকে আর পুকুরের পদ্ম ফুলে মৌমাছি থাকে। কিন্তু বাপু! পথিকদিগের থাকিবার স্থান ত এ পুকুরে কোথাও দেখি নাই!" এইরূপ ফাঁকা উত্তর শুনিয়া মুলদেব একেবারে অপ্রস্তুত! যাহা হউক বৃদ্ধাকে কিছু না বলিয়া তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিলেন।

সহরে এক বাড়ীর দরজায় বসিয়া এক বালক হাতে একবাটি গরম পায়স লইয়া কাঁদিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া শশী বলিল—"কি বোকা ছেলে! হাতের পায়স না খাইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে।" এ কথায় বালক চক্ষু মুছিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"মূর্খ তোমরা না আমি? কাঁদিবার দরুণ আমার কতটা সুবিধা হইতেছে তা ত বুঝ না? পায়সটা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আস্বাদ বাড়ে আর মুখে বেশী লালা উঠাটাও ক্রমে কমিয়া আসে। তোমরা পাড়াগেঁয়ে মূর্খ কি না, সে জন্য কাঁদিবার আসল কারণটা বুঝিলে না।"

বালকের এই কথায় নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া মুলদেব লজ্জায় মরিয়া গেলেন এবং সবিস্ময়ে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সহরের অন্য দিকে চলিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন এক পরমসুন্দরী কন্যা বাড়ীর বাগানে আম গাছে চড়িয়া আম পাড়িতেছে আর তাহার সহচরীগণ গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। মুলদেব কন্যাকে বলিলেন—"সুন্দরি! কয়েকটা আম দাও না—আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।" কন্যা বলিল—"নিশ্চয় দিব। ঠাণ্ডা আম খাইবে না গরম আম খাইবে?" কন্যার কথা শুনিয়া মুলদেব ভাবিলেন—

ব্যাপারখানা কি? তারপর বলিলেন—"আচ্ছা! প্রথম গরম আমই দাও খাই, পরে না হয় ঠাণ্ডা খাইব।" তখন কন্যা কয়েকটা আম মাটিতে ধূলার মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিল আর মুলদেবরাও ফুঁ দিয়া আমগুলির ধূলা ঝাড়িয়া খাইলেন। ইহা দেখিয়া সেই কন্যা ও তাহার সখীরা ত হাসিয়াই খুন! তারপর কন্যা বলিল—"গরম আম দিলাম কিন্তু তোমরা সেগুলিতে ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইলে। এখন তবে কাপড় পাত, ঠাণ্ডা আমই দিতেছি—আর ফুঁ দিবার আবশ্যক হইবে না।"

মুলদেব ঠাণ্ডা আম লইয়া বন্ধুদিগের সহিত সেখান হইতে চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের লজ্জার আর সীমা রহিল না। পথে যাইতে যাইতে মুলদেব বন্ধুদিগকে বলিলেন—"এই চতুর মেয়েটিকে যেরূপে হউক বিবাহ করিতে হইবে। আমি চালাক বলিয়া প্রসিদ্ধ! কিন্তু আজ সে আমাকে যেরূপ লজ্জা দিল এখন তাহাকে বিবাহ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ না লইলে আমার ইজ্জৎ থাকে না!" তখন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পরদিন ছদ্মবেশে কন্যার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কন্যার পিতা যজ্ঞস্বামী তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ বাবা? কি চাও?" মুলদেব বলিলেন—"মহাশয়! মায়াপুরী নগরে আমাদের বাড়ী, আমরা এ দেশে শাস্ত্র পাঠ করিতে আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া যজ্ঞস্বামী বলিলেন—"তোমরা যখন এত দূর হইতে আসিয়াছ তখন অনুগ্রহ করিয়া মাস চারি আমার বাড়ীতে থাকিয়া শাস্ত্রপাঠ করিলে আমি নিতান্ত সুখী হইব।" তখন মুলদেব বলিলেন—"মহাশয়! আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে চার মাস পরে যাইবার সময় আমরা যাহা চাই তাহাই দিবেন তবেই আপনার বাড়ীতে থাকিতে পারি।" এ কথায় যজ্ঞস্বামী বলিলেন—"তোমরা যাহা চাহিবে তাহা যদি নিতান্ত অসাধ্য কিছু না হয় তবে নিশ্চয়ই দিব।" তারপর সকলে যজ্ঞস্বামীর বাড়ীতে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চার মাস গত হইলে যাইবার কালে যজ্ঞস্বামী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি চাও?" তখন শশী মুলদেবকে দেখাইয়া বলিল—"ইনি আমাদিগের গুরু। আমরা এই চাই যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইঁহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন।" ইহা শুনিয়া যজ্ঞস্বামী ভাবিলেন—"ইহারা দেখিতেছি বেশ চালাকি করিয়া আমাকে ঠকাইল। যাহা হউক ছেলেটি উত্তম, আমার কন্যার উপযুক্ত স্বামীই হইবে।" এই ভাবিয়া যজ্ঞস্বামী সন্তুষ্ট চিত্তে মুলদেবের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

বিবাহের কিছুকাল পরে একদিন রাত্রিতে মুলদেব স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি

গো! সেই ঠাণ্ডা আম আর গরম আমের ব্যাপারটা মনে পড়ে কি?" প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"হাঁ! সহরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে পাড়াগেঁয়ে ভোঁতা বুদ্ধি এরূপ ভাবে ঠকিয়াই থাকে।" তখন মুলদেব স্ত্রীকে বলিলেন—"তবে সবুর কর, সহরের চালাক মহাশয়া! তোমাকে সাজা না দিয়া ছাড়িব না। পাড়াগেঁয়ে ভোঁতা বুদ্ধিও প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কালই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে আর ফিরিবে না।" ইহা শুনিয়া মুলদেবের স্ত্রী বলিলেন—"আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, তোমার ছেলেকে দিয়া তোমাকে ধরাইয়া লইয়া আসিব।" দুইজনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর ব্রাহ্মণকন্যা পাশ ফিরিয়া ঘুমাইলেন। আর ঘুমন্ত অবস্থায় মুলদেব স্ত্রীর আঙ্গুলে তাঁহার নিজের নাম লেখা আংটিটি পরাইয়া দিয়া চুপিচুপি বাহিরে আসিয়া বন্ধুদিগের সহিত সেই রাত্রেই উজ্জয়িনী প্রস্থান করিলেন।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা দেখিলেন স্বামী ঘরে নাই। তারপর আঙ্গুলে নামলেখা আংটি দেখিয়া ভাবিলেন—"তবে ত দেখিতেছি সত্য সত্যই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আর দুঃখ করিয়া কি হইবে? তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন এখন আমাকেও আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। আর আংটিতে যখন 'মুলদেব' নাম লেখা তখন আমার স্বামী যে উজ্জয়িনীর সেই প্রসিদ্ধ চতুর মুলদেব সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক তিনি যখন এখানে ছদ্মবেশে ছিলেন তখন তাঁহার পরিচয় এখন আর প্রকাশ করিব না। যে দিন আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে এবং তিনি এখানে আসিবেন সে দিনই সকলে তাঁহার পরিচয় পাইবে।" এই ভাবিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতার নিকট গিয়া স্বামী যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন সে সংবাদ জানাইলেন। এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া যজ্ঞস্বামী ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর দুঃখের সীমা রহিল না। জামাতার কোন সংবাদই জানেন না, তাঁহার সন্ধানই বা লইবেন কি করিয়া? সুতরাং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে হরি! তুমি বিপদভঞ্জন—আমার জামাতাকে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের এই বিপদ দূর কর।"

ইহার পর যথাসময়ে ব্রাহ্মণকন্যার একটি পুত্র জন্মিল। দেখিতে দেখিতে পুত্র বড় হইয়া সকল বিষয়ে নিপুণ হইল। ক্রমে তাহার বার বৎসর পূর্ণ হইলে একদিন সমবয়সী বালক-দিগের সহিত খেলা করিতে করিতে একটি বালককে আঘাত করিলে সে রাগিয়া বলিল—"বাপের নাম জানিস্ না আবার মারিতে আসিয়াছিস্—যা, তোর সঙ্গে খেলা করিব না।"

এ কথায় মনে আঘাত পাইয়া এবং নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সে বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলিল—"মা! আমার বাবার নাম কি? কিনি কোথায় থাকেন?" তখন ব্রাহ্মণকন্যা পুত্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার পিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ সভাসদ্, মূলদেব। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীনগরে তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বালক বলিল—"মা! তুমি চিন্তা করিও না। আমি গিয়া পিতাকে ধরিয়া লইয়া আসিব এবং তবেই তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে।"

তারপর মায়ের নিকটে পিতার আকৃতি ও তাঁহাকে চিনিবার উপায় জানিয়া লইয়া বালক উজ্জয়িনী যাত্রা করিল। উজ্জয়িনীনগরে গিয়া সে দেখিল একস্থানে জুয়ার আড্ডায় বসিয়া কতগুলি লোক পাশা খেলিতেছে। ঘটনাক্রমে মুলদেবও সেই দলে বসিয়া খেলিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বালক চিনিতে পারিয়া তাঁহাদের সঙ্গেই খেলিতে বসিল। তখন সকলে দেখিল অল্প বয়স্ক বালক হইলেও তাহার অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি। শুধু তাহাই নহে, ক্ষণকাল মধ্যে সে সকলের টাকা কড়ি সব জিতিয়া লইয়া গরীবদিগকে তাহা দান করিয়া ফেলিল। বালকের এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও মহত্ত্ব দর্শনে সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

যাহা হউক, বালক চলিয়া গেলে পর রাত্রিতে সেই আড্ডাতেই সকলে শয়ন করিল। মুলদেব যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন তখন বুদ্ধিমান্ বালক আড্ডায় ঢুকিয়া অদ্ভুত কৌশলে মুলদেবকে মাটিতে শোয়াইয়া তাঁহার খাটিয়াখানি লইয়া চম্পট! ঘুম হইতে উঠিয়া মুলদেব দেখিলেন, তিনি মাটিতে একরাশ ধূলার উপর শুইয়া আছেন, আর তাঁহার খাটখানি কে লইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে বাজারে গিয়াছিলেন, সেখানে দেখিলেন একস্থানে সেই বালক তাঁহারই খাটিয়াখানি বিক্রয় করিতেছে। মুলদেব খাটিয়ার দাম জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল—"চতুরচূড়ামণি মহাশয়! টাকা দিয়া এই খাটিয়া কিনিতে পারিবেন না। তবে কি না আমাকে যদি নিতান্ত অদ্ভুত এবং অতিশয় আশ্চর্য্য একটা কিছু কথা বলিতে পারেন তবেই খাটিয়া আপনার হইবে।" ইহার উত্তরে মুলদেব বলিলেন—"আচ্ছা বেশ! তোমাকে আমি একটা অদ্ভুত কথা বলিতেছি, তুমি যদি তাহা বুঝিয়া উত্তর দিতে পার তবে আমি খাটিয়া চাই না, নতুবা খাটিয়া আমাকে দিতে হইবে।" বালক ইহাতে সম্মত হইলে তিনি বলিলেন—"পূর্ব্বে এক সময়ে এক রাজার রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। রাজা সাপের রথের জলের সাহায্যে

শুকরের প্রিয় বস্তুর পিঠটাকে চাষ করিলেন এবং তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মিলে তাহা দিয়া প্রজাদিগের অন্নকষ্ট দূর করিয়াছিলেন—বল দেখি বালক! ইহার অর্থ কি বুঝিলে?"

বালক এ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"মহাশয়! এটা ত অতি সহজ কথা। মেঘকে সাপের রথ বলিয়া থাকে আর বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন তখন পৃথিবীটাই যে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল সে কথা কে না জানে? সুতরাং মেঘের জলের সাহায্যে পৃথিবীতে শস্য জন্মিবে সেটা আর নূতন কথা কি বলিলেন?" বালকের উত্তর শুনিয়া মূলদেব হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। যাহা হউক উত্তর দিয়াই বালক তাঁহাকে বলিল—"আচ্ছা! আমি আপনাকে একটা অদ্ভুত কথা বলিতেছি, যদি তাহা বুঝিয়া উত্তর দিতে পারেন তবে খাটিয়া দিব আর যদি না পারেন তবে প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি আমার চাকর হইয়া আমার সঙ্গে যাইবেন?"

মূলদেব এ কথায় সম্মত হইলে বালক বলিল—"বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছিল। জন্মের পরেই সে তাহার পদভরে পৃথিবীকে কাঁপাইয়া দেয় তারপর আর একটু বড় হইয়াই সে তাহার একখানা স্বর্গে বাড়াইয়া দিয়াছিল। এখন বলুন দেখি চতুরচূড়ামণি—এ কথার অর্থ কি?" বালকের কথা শুনিয়া মূলদেব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"এ মিথ্যা কথা। ইহার মধ্যে এক বিন্দুও সত্য নাই।"

ইহা শুনিয়া বালক বলিল—"মহাশয়! বিষ্ণু যখন বামন অবতার হইয়াছিলেন তখন কি তিনি হাঁটিয়া পৃথিবীটাকে কাঁপাইয়া দেন নাই? আর তখনই যে তিনি ক্রমে বড় হইয়া স্বর্গে পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা কি আপনি শুনেন নাই? যাহা হউক আপনি হারিয়া গিয়াছেন—সুতরাং আপনি আমার দাস। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন সকলেই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। তবে চলুন এখন আমার সঙ্গে, আমি যেখানে বলিব সেখানেই আপনাকে যাইতে হইবে।"

তখন উপস্থিত সকলেই এ কথায় সায় দিলে বালক মূলদেবকে লইয়া পাটলিপুত্রে তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। বাড়ীতে গেলে পর সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। যজ্ঞস্বামী জামাতাকে ফিরিয়া পাইয়া এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রিতে মূলদেবের স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—"কেমন! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছি কি না? ছেলেকে দিয়া তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছি ত?" মূলদেবের তখন মনে রাগ ছিল না সুতরাং স্ত্রীর কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্বশুরবাড়ীতে বহুকাল সুখে বাস করিয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত উজ্জয়িনীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

দেনার হিসাব

দস্যু রবিন হুডের কথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। ফ্রায়ার টাক্ নামে এক ফুর্ত্তিবাজ পাদ্রি তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

রবিন হুড্ আর ফ্রায়ার টাক্ একদিন নটিংহাম সহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে ফ্রায়ার টাকের বড্ড ক্ষিদে পেল, আর তিনি এক বুড়ীর সরাইখানায় গিয়ে, তার কাছ থেকে কিছু খাবার চাইলেন। বুড়ীর ঘরে রুটি মাখন আর ডিম ছাড়া আর কিছু ছিল না। ফ্রায়ার টাক্ চারটে ডিম সিদ্ধ, রুটি আর মাখন খেলেন। তারপর যাবার সময় যখন বুড়ী তার হিসাব দিল, তখন ফ্রয়ার টাক্ দেখ্‌লেন যে তাঁর কাছে যে পয়সা আছে তা' দিয়ে কেবল রুটি মাখনের দাম তিনি দিতে পার্‌বেন। তাই তিনি বুড়ীকে বল্‌লেন, "আজ তো আমার কাছে বেশী পয়সা নাই, তাই কেবল রুটি মাখনের দামটা দিচ্ছি তোমায়; এর পরে যখন নটিংহামে আস্‌ব তখন ডিমের দামটা চুকিয়ে দেবো।" এই ব'লে তাঁরা চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর অনেক বৎসর চ'লে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে ফ্রায়ার টাকের আর নটিংহামে আসার সুবিধা হয়নি। এতদিনে তাঁদের অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। রবিন হুড এখন হান্টিংডনের 'আর্ল' হয়েছেন; ফ্রায়ার টাক্‌ও আগের চেয়ে অনেক ফিটফাট হয়েছেন। এই অবস্থায় একদিন নটিংহামে গিয়ে সেই বুড়ীকে ফ্রায়ার টাক্ বল্‌লেন, "আমার দেনাটা চুকিয়ে দিতে এসেছি; তুমি কত পাবে বল।" বুড়ীতো ফ্রায়ার টাকের চেহারা দেখে চিন্‌তেই পারে নি—এখন ফায়ার টাক্ দিব্যি মোটা গোল গাল হয়েছেন, পোষাকও সুন্দর ফিট্‌ফাট্—তাই সে বল্‌ল, "তোমার আবার কিসের দেনা?" ফ্রায়ার টাক্ তখন বুড়ীর হাতে একটা শিলিং দিয়ে বল্‌লেন, "সেই যে বহুদিন আগে আমি তোমার এখানে ৪টা ডিম সিদ্ধ খেয়েছিলাম, তার দাম-স্বরূপ এই শিলিংটা নাও।" শিলিং দেখেই বুড়ীর লোভ বেড়ে গেল; সে বল্‌ল, "এত বছর পরে ডিমের দাম দিতে এসেছ, আবার একটা শিলিং দিয়ে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কর্‌ছ? একবার হিসাব ক'রে দেখি আমার কত পাওনা হয়।"

এই ব'লে সে হিসাব কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল—সে ডিম থেকে যে ছানা হ'তো, বড় হয়ে তার এতগুলো ছানা হ'তো; তার আবার ছানা, তার ছানা, তার ছানা—এম্‌নি করে

এত বৎসরে হাজার হাজার ছানা হয়ে যেতো। এই হিসাবে দেখা গেল যে বুড়ীর প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা পাওনা হয়। ফ্রায়ার টাকের সঙ্গে কিছু টাকা ছিল বটে, কিন্তু ৪।৫ হাজার টাকা মোটেই ছিল না। তিনি টাকাও দিতে পারলেন না; বুড়ীও তাঁর নামে নালিশ ক'রে তাঁকে গ্রেপ্তার করাল।

মোকদ্দমার দিনে ফ্রায়ার টাকের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য কোথাকার কে এক উকিল এসে হাজির হ'লো ;—তার পোষাক যেমন নোংরা ছেঁড়া, গায়েও তেমনি কাদা মাখা। আসলে কিন্তু রবিন হুডই ঐ রকম ছদ্মবেশে এসেছেন।

বিচার আরম্ভ হ'তে বিচারপতি রবিন হুডকে জিজ্ঞাসা করলেন, "উকিল মশায়,

আপনার গায়ে এত কাদা, আর জামা এত নোংরা কেন?" রবিন বল্ল, "ধর্ম্মাবতার, আমি স্নান করারও সময় পাই নি; কাপড় বদ্‌লাবারও সময় পাই নি। সেই ভোরের বেলা থেকে কেবলই ভাজা বাদামের চাষ করছিলাম।" বিচারপতি বল্‌লেন, "ভাজা বাদামের চাষ কি রকম? বাদাম ভাজ্‌লে কি তার গাছ হ'তে পারে?"

রবিন বল্লেন, "কেন হবে না? সিদ্ধ ডিম ফুটে যখন ছানা বেরুতে পারে তবে ভাজা বাদামের গাছ কেন হবে না?" বিচারালয়ের যত লোক এ কথা শুনে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল, আর বুড়ীও লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে চম্পট দিল।

কাঠবিড়ালের মা

আমাদের বাড়ির ছাতে একটা কুঠরী আছে, সেখানে বাড়িওয়ালা তাঁর জিনিস পত্র রাখেন। ঘরটা প্রায়ই তালা বন্ধ থাকে, কেউ সেখানে যায় না, তাই যত রাজ্যের আরশুলো, ইঁদুর আর কাঠবিড়াল সেখানে বাসা বেঁধেছে। রাত্রে সেই আরশুলো আর ইঁদুরগুলো নেমে এসে আমাদের ভাঁড়ার ঘরে ভারি উৎপাৎ করে। সকাল হতেই তারা পালিয়ে যায়, তখন আরম্ভ হয় কাঠবিড়ালের পালা।

যেই সূর্য্য ওঠে, অমনি দেখি ছাতের উপর থেকে কাঠবিড়ালরা উঁকি ঝুঁকি মারছে। তারপর ক্রমে যত বেলা বাড়ে, ততই তাদের ফূর্ত্তি বাড়ে। তখন তারা নীচে নেমে এসে প্রথমে যা কিছু খাবার সামনে পায়, পেটভরে খেয়ে নেয়; তারপর ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, ডিগবাজী আরম্ভ করে দেয়।

ওদের খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। ওদের জন্য রোজ আমি চাল ডালের খুদ, রুটি, ফল, বাদাম, এইসব খাবার ছড়িয়ে রাখি, আর ওরা এসে কেমন আমোদ ক'রে খায়। পিছনের দু পায়ে ভর ক'রে খাড়া হয়ে ব'সে, সামনের দু পায়ে খাবার জিনিষটি ধ'রে কুট্ কুট্ করে খায়, আর গোল গোল উজ্জ্বল চোখ দুটি ঘুরিয়ে চারিদিক দেখতে থাকে। কাছে গেলেই সুট্ করে উপরে উঠে যায়। কত খাবারের লোভ দেখাই, কিন্তু ওরা কিছুতেই ভাব করতে চায় না।

একদিন আমরা বারান্দায় বসে আছি, হঠাৎ উপর থেকে একটা কাঠবিড়ালের ছানা পড়ে গেল। নিতান্ত ছোট্ট ছানা, তখনও চোখ ফোটেনি, কেবল পড়ে চিঁ চিঁ করছে— তাকে আমরা তুলে নিয়ে তুলোর মধ্যে রেখে দিলাম। পলতে করে তাকে দুধ খাইয়ে দিতাম, আর রোজ সেই বারান্দায় রেখে আসতাম—যদি তার মা এসে নিয়ে যায়। কিন্তু মাও এল না, আর ছানাটাও ক্রমে রোগা হয়ে যেতে লাগল, তারপর একদিন বেচারা মরে গেল।

ছানাদের জন্য আমাদের ভারি কষ্ট হল। ভাবলাম যে একটু বড় একটা ছানা

পেলে তবে পুষ্‌ব। কিছুদিন পরে একটা ছানা পেলাম, তার চোখ ফুটেছে আর বেশ দৌড়াতে পারে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করে যেই তাকে ধরলাম অমনি সে কট্ করে আমার হাতে কামড়িয়ে দিল। কি ধারাল দাঁত! ঐ দাঁত দিয়ে ওরা বাদাম প্রভৃতির শক্ত খোলা কুরে খায়। ছানাটার পায়ে একটা লম্বা সুতো বেঁধে তাকে খাবার খেতে দিলাম। সে প্রথমে বড্ড ভয় পেয়েছিল, কিন্তু খানিক পরে বেশ খেলতে আরম্ভ করল। তখন আমাদের খুব আনন্দ হ'ল। ভাবলাম তাকে পোষ মানিয়ে তারপরে পায়ের দড়ি খুলে দিব, তখন আর পালাবে না।

বিকাল বেলায় দেখি, একটা কাঠবিড়ালি চারিদিকে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে, খানিক পরে ছানাটাও এমন করে ডাকতে লাগল—ঠিক যেন ওর ডাকের উত্তর দিচ্ছে। তখন আমরা বুঝলাম যে ওটা এর মা। ওরা কি করে দেখবার জন্য আমরা আড়ালে সরে এলাম, তখন মাটা আস্তে আস্তে নেমে এসে ছানাকে বুকে তুলে নিল। পা বাঁধা আছে বলে নিয়ে যেতে পারছে না, কিন্তু কোলে নিয়ে যে কি সুন্দর করে আদর করতে লাগল! আমরা যেমন করে আমাদের খোকা খুকিদের কোলে নিয়ে নাচাই, ঠিক তেমনি করে তাকে সামনের দুই পায়ে তুলে ধরে নাচাতে লাগল, আর ছানাটি তার ছোট্ট পা দুখানি দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। এই দেখে আমাদের এমন মায়া লাগল, আমি তাড়াতাড়ি ছানার পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম। যতক্ষণ পা খুলছিলাম, ততক্ষণ মাটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—ছানার মায়াতে পালাতেও পারছে না, আবার ভয়ে কাছে আসতেও পারছে না। যেই আমরা সরে এলাম, অমনি সে এসে ছানাকে কোলে নিয়ে, লেজটি তুলে প্রাণপণে ছুটে পালাল।

কাঠবিড়ালের শরীরের পক্ষে লেজটি কত বড় আর মোটা, তা লক্ষ্য করেছ কি? ঝড় বৃষ্টির সময়ে নাকি তারা লেজটিকে ছড়িয়ে তুলে ধরে, আর শরীরটিকে গুটিয়ে তার নীচে রক্ষা করে। ওদের পিঠের উপরে কেমন লম্বা লম্বা কালো ডোরা আছে তাতে বড় সুন্দর দেখায়। ছেলে বেলায় শুনেছিলাম, রাম যখন সীতাকে আনতে যাবার সময় সমুদ্রে সেতু বাঁধছিলেন, বানরেরা মাথায় করে রাশি রাশি পাথর এনে দিচ্ছিল। তখন একটা কাঠবিড়ালও এক মুঠো বালী পিঠে করে এনে দিল। তা দেখে রাম সন্তুষ্ট হয়ে কাঠবিড়ালের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেন, সেই অবধি সমস্ত কাঠবিড়াল রামের আশীর্ব্বাদের চিহ্ন পিঠে ধারণ করে রয়েছে।

ফুজিয়ামা

কোবে থেকে টোকিও যাবার সময় ট্রেণ থেকে ফুজিয়ামা জীবনে সেই প্রথম দেখেছিলুম। তখন বিকেল বেলা সূর্য্য অস্ত যায় যায়। গাড়ীর গার্ড আগে থেকেই আমাদের জানিয়েছিলেন যে অমুক সময় ফুজিয়ামা দেখা যাবে। ফুজিয়ামা জাপানের মধ্যে সকলের চাইতে বড় পাহাড়। এ পাহাড় দেখ্‌তে নাকি বড় সুন্দর, এবং জাপানের একটা দেখ্‌বার জিনিষ এ কথা কত দিন শুনেছি, এমন কি ছেলেবেলায় ভূগোলেও

পড়েছি। তাই আমরা খুব উৎসাহে এই পাহাড় দেখ্‌বার জন্যে গাড়ীর জান্‌লা দিয়ে মুখ বার করে রইলুম। সোনার রংএর আকাশের গায় দূর থেকে ফুজি পাহাড়ের রং কালো নীল ছায়ার মত দেখা গেল। কিন্তু ফুজিয়ামার মাথা তখনও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই আমাদের গাড়ী খুব আস্তে আস্তে চালান হচ্ছিল। ছোট্ট একটি মেঘ ঠিক ফুজির মাথার কাছে লেগে ছিল বলে সবটা ভাল পরিষ্কার দেখা গেল না। আমরা ও গাড়ীর যাত্রীরা সকলেই জান্‌লা দিয়ে মুখ বার করে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম ; গাড়ীও এগিয়ে চল্ল। গাড়ী যখন ফুজিয়ামার খুব কাছে এসে

আবার চল্‌তে লাগ্‌ল, তখন মাথার কাছের সেই ছোট মেঘটি আস্তে আস্তে সামনে থেকে সরে গেল। অম্‌নি চারদিক থেকে গাড়ীর লোকদের মধ্যে একটা আনন্দের কলরব শোনা গেল। সকলেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল, যেন কি একটা মস্ত জিনিষ তারা পাচ্ছিল না—হঠাৎ ফুজিয়ামার মাথা থেকে মেঘটি সরে যেতেই তারা সকলে যেন হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। ফুজিয়ামা সেই প্রথমবারেই তার প্রসন্ন মুখখানি আমাদের দেখিয়েছিল। তারপরেও আরো কত কতবার নানা দিক থেকে নানা রকম ভাবে এই ফুজি পাহাড়কে আমরা দেখেছি।

য়োকোহামায় হারা সানের বাড়ীতে থাক্‌তেও প্রায় রোজই আমরা ফুজিয়ামা দেখ্‌তুম। সেখানে সমুদ্রের ধারের টি হাউস্‌ থেকে খুব ভোর ও সন্ধ্যে বেলায় ফুজি বড় সুন্দর দেখা যেত। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠ্‌তে আমার প্রায়ই দেরী হত। সকালে খাবার সময় যখন সকলে গিয়ে টেবিলে বস্‌তুম, তখন আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ বল্‌তেন, আজ সকালে ফুজিয়ামা বড় সুন্দর দেখা গিয়েছিল। কোন কোন দিন খুব ভোরে মিঃ পিয়ার্সন বা আর কেউ এসে আমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বল্‌তেন, "তাড়াতাড়ি বাইরে এস, আজ ফুজিয়ামা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে।" তাই যে দিন সকাল বেলাটা খুব খট্‌খটে ও পরিষ্কার থাকৃত, সে দিন আমার ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হত না। বেশী বেলার সঙ্গে সঙ্গে দূরের আকাশটা ঝাপ্‌সা হয়ে গেলে ফুজি আর ভাল দেখা যেত না।

জাপানের সকল লোকই—কি ছোট কি বড়—কি ছেলে কি বুড়ো, সকলেই এই ফুজিকে এত ভাল বাসে, যে সে না দেখলে বোঝা যায় না। সকালে বিকালে হারা সানের বাগানে দেখ্‌তুম সমুদ্রের ধারের ছোট ঘরগুলিতে ও বেঞ্চিতে লোকেরা চুপ করে বসে ঐ ফুজিয়ামা দেখ্‌ছে। জাপানে ছবিতে ত কথাই নাই—এমন কোন চিত্রকর জাপানে জন্মায় নি,—সে কি ছোট কি বড়—যে ফুজিয়ামার ছবি না এঁকেছে। জাপানের ছোট রুমাল তোয়ালে থেকে আরম্ভ করে ঘটি বাটি, পাখা, সকল জিনিষেই ফুজিয়ামার ছবি তারা এঁকেছে। এই ফুজিয়ামা নিয়ে জাপানের কত গান, কত গল্প, কত কাহিনী, কত ভালবাসার কথা যে লেখা হয়েছে তার আর শেষ নাই। জাপানের সবের-সব এই ফুজি পাহাড়টি। এই ফুজি যদি জাপানে না থাকৃত, তবে যে কি হতো তা বলা যায় না। ফুজিয়ামা এদের চোখে কখন পুরানো লাগে না।

শীতকালে ফুজি আগাগোড়া বরফে ঢাকা থাকে। তাই সমস্ত পাহাড়টি একেবারে

সাদা হয়ে যায়। তখন দেখতেও খুব সুন্দর হয়। গ্রীষ্মকালেও যখন নীচেকার সমস্ত বরফ গলে গিয়ে কেবল মাথার কাছে টুক্‌রো টুক্‌রো সাদা বরফ লেগে থাকে, তখনও ভারি সুন্দর দেখতে হয়। সব সময়েই একে দেখতে সুন্দর লাগে। প্রায় হাজার বারো ফিট এই পাহাড়টি উঁচু। আগে নাকি এ পাহাড়টি একটি বড় আগ্নেয়গিরি ছিল। তখন এর মুখ থেকে সব সময়েই ধোঁয়া আর পৃথিবীর ভেতরকার গরম কাদামাটি পাথর গলে বেরত। এখন আর তা নাই, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজকাল প্রতি বছরেই গ্রীষ্মকালে জাপানের অনেক দূরের অনেক তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে এই ফুজিয়ামার উপর তীর্থ করতে আসে।

আমেরিকা থেকে জাপানে আস্‌বার সময় জাহাজ হতে অনেক দূর থেকে সকলের আগে এই ফুজিয়ামা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমরা যে দিন আমেরিয়া থেকে জাপানে পৌঁছব সে দিন খুব ভোর থেকেই এই ফুজিয়ামা দেখ্‌তে পেয়েছিলুম। আমি ত জীবনে এমন সুন্দর পাহাড় আর কোথাও দেখিনি, তোমরা যদি কোন দিন জাপানে যাও তবে দেখে বলো আমার কথা ঠিক কি না।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে।

"সমুদ্রের ঘোড়া"

সমুদ্রের ঘোড়া বল্‌তে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে ক'রে ব'সো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে "ঘোটক" বলা হয় কেন তা জানি না। তার চাল চলন চেহারা বা শরীরের গড়ন, কিছুই ঘোড়ার মত নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেও কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি "সিন্ধুঘোটক"। হিপ্পোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় "জলহস্তী" লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুস নুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতীর সঙ্গে আর কোন রকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শূয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বল্‌ছি, তাকে বর্ম্মধারী মাছ বল্‌লেই তার ঠিকমত পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার ঐ অদ্ভুত ঘাড় বাঁকান চেহারা আর খাড়া হ'য়ে চলাফিরা—এই দেখেই ইংরাজিতে তার নাম দেওয়া হ'য়েছে (Sea Horse) সমুদ্রের ঘোড়া। চেহারার বর্ণনা হিসাবে, নামটি যে চমৎকার হ'য়েছে তাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্তুটির ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মত নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও

চিংড়ি মাছের খোলার মত শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা, জলের নীচে শ্যাওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম ক'রে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে এরা চলে ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্‌বগ্ করে ছুটবার ধরণটা মনে পড়ে। আসলে এরা যে "নল" মাছের জাতভাই, সেটা এদের চোঙের মত মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নলমাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মত। এবারকার রঙিন ছবির নীচের দিকে ঐ সরু লম্বা মাছটির ল্যাজের কাছে একটা নল মাছের চেহারা দেখান হ'য়েছে। নল মাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরী যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগায় একটু ফুঁটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড় সুড় ক'রে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

ছবিতে দেখ এই অদ্ভুত জন্তুগুলার এক একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মত চেহারা ক'রেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ ক'রে রংবে-রঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি ক'রে থাকে। ঝালরের সাজগুলা বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরাজিতে এদের বলে Sea dragon সমুদ্রের "ড্রেগন" বা রাক্ষস। নামটি ভয়ঙ্কর হ'লেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতই নিরীহ। তার ঐ রংচঙে পোষাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোকা দিবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যে সব অদ্ভুত রঙীন্ বাগান

থাকে তারই মধ্যে ফুলপাতার রঙের সঙ্গে রং মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানা রকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর একটি বড় মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ক্যাঙ্গারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোট ছোট ছানাগুলা দরকার হ'লেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোট ছোট থলির মত থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়!

নবাবের সাজা

গিয়াস্ উদ্দীন আমোদ ক'রে
ছুড়ুতেছিলেন তীর;
দৈব যোগে বিদ্ধ হ'ল
এক বালকের শির।

দুখিনী মা কেঁদে কেঁদে
বলে সবার ঠাঁই;
"দেশের রাজা প্রজা মারেন,
কোথায় বিচার পাই?"

সবাই বলে "চুপ ক'রে থা'ক্,
নবাব যদি শোনে ;
মায়ে পোয়ে থাক্‌তে হবে
হাজত-ঘরের কোণে !"
দুখিনী তা'র প্রাণের ব্যথা
ভুল্‌তে নাহি পারে ;
ছেলে নিয়ে পড়্‌ল গিয়ে
প্রধান কাজীর দ্বারে।
কাজি বলেন "অত্যাচারের
করবো বিচার আজই ;"
সুলতানকে হাজির হ'তে
হুকুম দিলেন কাজী।
হুকুম পেয়ে, হাজির নবাব,
বিচারকের কাছে ;
সসম্ভ্রমে বলেন, "কাজি
কি অভিযোগ আছে ?"
কাজি বলেন, "খেল্‌তে ছিলেন,
আস্‌মানে তীর ফেলে ;
সেই তীরেতে আঘাত পেলে
এই বিধবার ছেলে।
তুষ্ট যদি কর্‌তে পারেন
ধন দৌলত দিয়ে ;
ছাড়্‌বো তবে ; নইলে হবে
ফির্‌তে দণ্ড নিয়ে।"
দয়াল নবাব, বড়ই ব্যথা
বাজ্‌ল তাঁহার প্রাণে ;
মায়ে পোয়ে তুষ্ট হ'ল
রাজার প্রচুর দানে।
হাকিম এসে দাওয়াই দিল,
রাজার হুকুম মত ;
মায়ে পোয়ে ফির্‌ল ঘরে
সেলাম ক'রে কত।
নবাব বলেন "কাজি, তুমি
বিচার কর্ত্তা ব'লে ;
হুকুম পেয়ে তোমার কাছে
এসেছিলাম চ'লে।
কিন্তু তুমি বিচারকালে
কর্‌তে যদি ভয় ;
কিম্বা আমি নবাব ব'লে
দিতে আমার জয়।
তা' হ'লে এই খড়গ আমার
কর্‌ত তোমায় খুন ;
কিন্তু এখন সুখী হ'লাম—
দেখে তোমার গুণ !"
কাজি বলেন, চাবুক ল'য়ে,
"ন্যায়ের পথে চলি ;
যেতেন যদি ন্যায়ের হুকুম
চরণ তলে দলি'।
তা' হ'লে এই চাবুক মেরে
পিঠ করিতাম কালো ;
সুখী আমি, আমার নবাব
সবার চেয়ে ভাল !"

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

পুরী।

পুরী যাইবার পথে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনের কাছে একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ট্রেণ হইতে তথাকার মন্দিরগুলির দৃশ্য দেখিতে খুব সুন্দর। আর খুরদা ষ্টেশনে নামিয়া যে গাড়ী বদলাইতে হয়, সে কথাটাও না ভুলাই ভাল ; কারণ তাহাতে পুরী পৌঁছাইবার ব্যাঘাত হইতে পারে। তবে, আমার 'দাদা' যেরূপ সতর্ক হইয়াছিলেন, এতটা না হইলেও চলিবে। তিনি নাকি বড়ই হুঁসিয়ার লোক, তাই কটক হইতে পুরী আসিবার পথে তিনি ভুবনেশ্বরেই তাড়াতাড়ি নামিয়া গাড়ী বদলাইতে ছুটিলেন। গাড়ী যে পাইলেন না তাহা বোধ হয়, আর আমার না বলিলেও চলিবে ; ততক্ষণে তিনি যে ট্রেণে আসিয়াছিলেন, তাহাও ছাড়িয়া গেল ! কিন্তু '——' দাদা সহজে দমিবার লোক নহেন ! তিনি বলিলেন, "ভালই হইল, ভুবনেশ্বর দেখিয়া যাই !"

পুরী পৌঁছাইবার চারি পাঁচ মাইল থাকিতেই জগন্নাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যেন একটা প্রকাণ্ড ভুট্টা। ভুট্টার দানা যেরূপ সাজান থাকে, মন্দিরের পাথর-গুলিও কতকটা সেইরূপ করিয়া সাজান, আর মন্দিরের আকৃতিও কতকটা ভুট্টারই মতন। মন্দিরের এই দৃশ্যটি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাছে গিয়া আমার তাহা এত সুন্দর বোধ হয় নাই। বিশাল সবুজ মাঠের মাঝখানে বিস্তৃত জলাশয়, তাহার পাশে সেই প্রকাণ্ড মন্দির, গাছপালা তাহার কোমরের নীচে পড়িয়া আছে। দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে একটা যেমন তেমন জিনিষ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মনের এই আনন্দটুকু অল্পক্ষণই থাকে। যতই কাছে যাওয়া যায়, ততই ছোট ছোট জিনিষে মন্দিরকে আড়াল করিয়া ফেলে। সে সবুজ মাঠ আর বিশাল জলাশয়ের নির্ম্মল জল দেখা যায় না। সমুদ্রের বালি, আর হাড্ডিসার গাছপালা তাহার স্থান অধিকার করে। ইহার উপর আবার যাই ষ্টেশনে নামিলাম অমনি,

"——দক্ষিণে, বামে, পিছনে, সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল ওষ্ঠাগত।"

আমি তীর্থ করিতে পুরী যাই নাই, বেয়ারাম সারাইবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু বার বার সবিনয়ে বলাতেও পাণ্ডা মহাশয়েরা আমার কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে

চাহিলেন না। আমি যত বেশী করিয়া বলি, তাঁহারাও ততই আরো যত্নপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করেন। শেষটা গাড়ীতে উঠিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু বাসায় আসিয়া দেখি, সেখানে একজন আসিয়া বসিয়া আছেন!

যাহা হউক, শেষটা ইঁহাকেও বুঝিতে হইল, যে এ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। আমিও রক্ষা পাইয়া নিজের অবস্থা এবং বাসস্থান বিষয়ে মনোযোগী হইলাম।

এই খানে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি বেয়ারাম লইয়া সেখানে গিয়াছিলাম, নিয়ম পালন করিতেই আমার সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত; চারিদিক বেড়াইয়া দেখিবার অবসর আমার হয় নাই। বেড়াইবার অবসর যখন হইত, তখন সমুদ্রের ধারে চলিয়া যাইতাম। মন্দিরের ওদিকে দু একদিন মাত্র গিয়াছিলাম। আমার ভিতরে যাইবার উপায় ছিল না, বাহির হইতে যাহা দেখা যায়, তাহাই দেখিয়াছি। সুতরাং মন্দিরের সম্বন্ধে আমার বেশী কথা বলিবার নাই।

মন্দিরটি খুব বড়। আর প্রাচীর সিংহদ্বার প্রভৃতি লইয়া দেখিতেও বেশ জমকালো। কিন্তু কাছে গিয়া কারুকার্য্য তেমন ভাল বোধ হয় না। সামনের রাস্তাটি খুবই চওড়া; আমি আর কোথাও এমন প্রশস্ত পথ দেখি নাই। এই পথে জগন্নাথের রথ চলে। পথের এক প্রান্তে রথখানিও রহিয়াছে। সেখানকার বড় পর্ব্ব রথ যাত্রা। রথ যাত্রার সময় দুই তিন লক্ষ লোক পুরীতে জড় হয়। এই কয়দিন ইহারা জগন্নাথের প্রসাদ খাইয়াই দিন কাটায়। প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয়, কিনিয়া খাইলেই হইল। যাহা খাইতে পারে, খাইবে, অবশিষ্ট আর একবার খাইবার জন্য রাখিয়া দিবে। জগন্নাথের প্রসাদ ফেলিয়া দিবার যো নাই। বাসী হইয়া পচিয়া গেলেও তাহা খাইতে হইবে। জগন্নাথের প্রসাদ খাইতে জাতির বিচার নাই। চণ্ডাল যদি ব্রাহ্মণকে প্রসাদ আনিয়া দেয়, তাহাও তাঁহাকে খাইতে হয়।

পুরীতে গোদের প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশী। সেখানকার লোকের নাকি এই বিশ্বাস, যে জগন্নাথের প্রসাদ মাড়াইলে গোদ হয়!

পুরীতে গিয়া প্রথমেই একটা ব্যাপার একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়। সমুদ্রের ধারের স্থানগুলিতে গাছপালা বাড়িতে পায় না। বটগাছগুলি আমগাছের মতন। নিমগাছ কুলগাছের মতন। অনেকগুলি গাছই আবার একপেশে। এক দিকে কারও ডালপালা বেশ বাড়িয়াছে, কিন্তু আর এক দিকে বেশী ডাল নাই, আবার যাহা আছে, তাহাতেও পাতা খুব কম। সমুদ্রের ধারের বালি হাওয়ায় উড়াইয়া আনিয়া এই সকল গাছের

ঐরূপ দুর্দ্দশা করে। হাওয়ার দিনে সমুদ্রের ধারে এই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। খুব শুক্‌নো দিনে বেশী হাওয়া হইলে তাহার চোটে বালির কণা সকল ছুটিয়া আসিয়া গায়ে পড়ে। আর এত জোরে পড়ে, যে খালি চামড়ায় পড়িলে অনেক সময় পিঁপড়ের কামড়ের মতন বেদনা বোধ হয়। এই হাওয়ায় তাড়ান বালির দৌরাত্ম্যে গাছের কচি পাতাগুলি প্রায় মারা যায়।

সমুদ্রের হাওয়া সমুদ্র ছাড়িয়া বেশী দূরে যায় না। সুতরাং সমুদ্রের কাছের গাছ-পালারই এইরূপ দুরবস্থা। সমুদ্র হইতে দূরে বড় বড় গাছের অভাব নাই। তাহা ছাড়া এক এক রকমের গাছ সে দেশের মাটিতে স্বভাবতঃ খুব বাড়ে বলিয়া বোধ হইল। প্রথমে পুরীর বাসায় ঢুকিয়াই দুটি পেঁপে গাছ দেখিলাম; তেমন বড় পেঁপে গাছ আমি আর কখনও দেখি নাই। সে দেশে পেঁপের নাম "অমৃত ভণ্ডা"। এমন জমকাল নামের গরিমায়ই বা সেখানকার পেঁপে গাছ ফুলিয়া এত বড় হয়! আর তাহার ডাল পালাই বা কত! বাড়ীর পাশেই কয়েকটা বট গাছ ছিল। সে গাছগুলি যেমন উঁচু, পেঁপে গাছগুলি বরং তাহার চাইতে একটু বেশী উঁচু। তবে, পরিসরে অবশ্য ঢের কম।

এক প্রকার মনসা গাছও সেখানে খুব জন্মায়। সে গাছের পাতা দেখিতে সাপের চক্রের মতন। একটা পাতার টিকির ভিতর দিয়া আর একটা বাহির হয়। ফুল ফলও পাতার আগাতেই হয়। কুমড়ো ফুলের মতন বড় বড় হলুদে, সেই ফুলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর।

সে দেশের ঘর বাড়ীর আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। তিনটি চলনসই শয়ন ঘর, ভাঁড়ার, রান্না ঘর, একটি অতিশয় ক্ষুদ্র স্নানের খোপ, আর সেইরূপ আর একটি জায়গা তাহাতে কাঠ রাখা চলে। তিনটি বারান্দা, পাঁচিল ঘেরা আঙ্গিনা, ভিতরে একটি কূয়া। এইরূপ একটি বাড়ীর জন্য আমাকে মাসে সত্তর টাকা করিয়া দিতে হইয়াছিল। দূরে হইতে ঐ বাড়ীর চেহারা দেখিয়া ছেলেরা বলিয়াছিল, "য়্যাঃ! ঐ বিচ্ছিরী বাড়ীটে যদি আমাদের হয়!" শেষটা সেই "বিচ্ছিরী" বাড়ীতেই গাড়ী থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, একটি কুকুর সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একটী সেদেশী চাকরও ছিল; কিন্তু তাহার কথা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কুকুরটা তাহার চাইতে ঢের ভাল লোক। কুকুর হইলেও সে আমাদিগকে আদর যত্ন করিতে ত্রুটি করে নাই।

কুকুর আর সেই চাকর ভিন্ন সে বাড়ীতে আরো অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, ছোট ছোট ব্যাঙ্। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি। ভাবে বোধ হইল, যেন তাহারাই সচরাচর ঐখানে থাকে। এমন নিশ্চিন্ত ভাবে পরের ঘরে থাকিতে আর কোন জন্তু পারে না। কাজের মধ্যে ত দেখিলাম, খালি থপ্ থপ্ করিয়া দেওয়ালের ধারে বেড়ান, আর কোণে পৌঁছাইলে সেই কোণ বাহিয়া দেওয়ালে উঠিবার চেষ্টা! কাজটি অতিশয় কঠিন! দুই পা ছড়াইয়া দুদিককার দেয়ালে প্রাণপণে ঠেশ্ না দিলে একাজ হইবার যো নাই। আর ছড়ানও যেমন তেমন হইলে হইবে না। ব্যাঙ্ ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর সেরূপ ভাবে পা ছড়াইবার ক্ষমতা আছে কিনা, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আর তাহা দেখিলে কি হাসিই যে পায়, তাহা কি বলিব! কিন্তু ব্যাঙ্ খুব ধীর প্রকৃতির জানোয়ার, যারপরনাই গম্ভীর ভাবেই সে এ কাজ করিতে থাকে।

এই ব্যাঙ্ তাড়ানই কিছুদিন ছেলেদের কাজ হইল। সহজে কি তাহারা যায়! ধমকাইলে যে তাহারা কাণে শোনে, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। লাঠি দিয়া খোঁচাইতে গেলে খালি একটু ব্যস্ত হয়, কিন্তু ঘরের বাহিরে যে যাইতে হইবে, একথা তাহাদের মাথায়ই আসে না। শেষটা একটি ছেলে এক ফন্দি বাহির করিল। কাগজের ঠোঙ্গা সামনে ধরিয়া পিছনে তাড়া করিলে অতি সহজেই ব্যাঙ্ তাহাতে লাফাইয়া উঠে। তাহার পর তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেই হইল।

এইরূপ করিয়া ব্যাঙের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু উই দেখা দিল। ঐ উইয়ের লোভেই এত ব্যাঙ্ আসিয়াছিল। উইয়েরা আমাদের জিনিষ পত্র কাটিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। বই আর জুতার উপরেই তাহাদের বেশী আক্রমণ, বিশেষতঃ জুতা! এই সামান্য ছোট পোকার দাঁতে কি আছে, বলিতে পারি না। জুতা যতই মজবুত হয়, ততই যেন উহা তাহার মিষ্টি লাগে। লোহা পিতল ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের দাঁতের কাছে টেকে না, খালি কেরাসিন তেল এক জিনিস আছে, যাহার কাছে উই জব্দ থাকে।

হারকিউলিস্

(৩)

সমুদ্রের বুড়ার কাছে এটলাসের খবর আদায় করিয়া হারকিউলিস্ তাহার কথামত আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কত পাহাড় নদী কত সহর গ্রাম পার হইয়া তিনি এক অদ্ভুত দেশে আসিলেন। সেখানে মানুষগুলা অসম্ভব রকম বেঁটে। শত্রুর ভয় তাহাদের এতই বেশী যে তাহাদের দেশ রক্ষার জন্য তাহারা এক দৈত্যের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া তাহারই উপর পাহারা দিবার ভার রাখিয়াছে। এই দৈত্যের নাম এণ্টিয়াস্—পৃথিবী তার মা।

দূর হইতে হারকিউলিস্‌কে গদা ঘুরাইয়া আসিতে দেখিয়া বামনদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ বাধিয়া গেল। তাহারা চীৎকার করিয়া এণ্টিয়াস্‌কে সাবধান করিয়া দিল। এণ্টিয়াস্‌ও তাহাই চায়! তাহার ভয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত লোক জন কেউ সে দিকে ঘেঁষে না, তাই হারকিউলিস্‌কে দেখিয়াই সে একেবারে গদা উঠাইয়া "মার মার" করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হারকিউলিস্‌ও তৎক্ষণাৎ তাহার গদা এড়াইয়া এক বাড়িতে তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মাটিতে পড়িবামাত্র তাহার তেজ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে আবার উঠিয়া ভীষণ তেজে হারকিউলিস্‌কে মারিতে উঠিল। হারকিউলিস্ আবার তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু মাটি ছোঁয়ামাত্র আবার তাহার অসম্ভব তেজ বাড়িয়া গেল, সে আবার হুঙ্কার দিয়া

লাফাইয়া উঠিল। হারকিউলিস্ ত জানেন না যে পৃথিবীর বরে মাটি ছুঁইলেই তার তেজ বাড়ে। তিনি বার বার তাহাকে নানা রকম মার প্যাঁচ দিয়া মাটিতে ফেলেন, বারবারই কোথা হইতে তাহার নূতন তেজ দেখা দেয়। তখন তিনি দৈত্যটাকে ঘাড়ে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া দুই হাতে তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিলেন, যে সেই চাপের চোটে তাহার দম বাহির হইয়া প্রাণশুদ্ধ উড়িয়া গেল। তখন তাহার দেহটাকে তিনি পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিলেন তাহার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

তখন বামনেরা সবাই মিলিয়া ভয়ানক কোলাহল আর কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কেহ "হায় হায়" করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিল, কেহ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কেহ আস্ফালন করিয়া বলিল "এস, আমরা সকলে ইহার প্রতিশোধ লই"। হারকিউলিস তাহাদের বলিলেন, "ভাই সকল, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নাই। ওই হতভাগা খামখা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, তাই উহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাজা দিয়াছি। তোমাদের আমি কোন অনিষ্ট করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সেখান হইতে সেই সোণার আপেলের সন্ধানে এটলাস পাহাড়ের খবর লইতে চলিলেন।

এইভাবে পথ চলিতে চলিতে শেষে হারকিউলিস সত্যসত্যই এটলাসের দেখা পাইলেন। সেই সমুদ্রের বুড়া যেমন বর্ণনা করিয়াছিল, ঠিক সেই রকম ভাবে সেই বিরাট দৈত্য আকাশটাকে মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হারকিউলিসকে দেখিয়া সে মেঘের ডাকের মত গম্ভীর গলায় বলিল, "আমি এটলাস—আমি আকাশকে মাথায় ধরিয়া রাখি—আমার মত আর কেউ নাই"। হারকিউলিস তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার সন্ধানে আমি দেশ বিদেশ ঘুরিয়াছি—এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেইটি জিজ্ঞাসা করিতে চাই"। দৈত্য বলিল, "এই আকাশের নীচে মেঘের উপরে থাকিয়া আমার চোখ সব দেখে, সব জানে—যাহা জানিতে চাও আমাকে জিজ্ঞাসা কর"। হারকিউলিস বলিলেন, "তবে বলিয়া দিন, হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে যে সোণার ফল ফলে, সেই ফল আমি কেমন করিয়া পাইতে পারি।" দৈত্য হইলেও এটলাসের মেজাজটি বড় ভাল। সে বলিল, "তাহাতে আর মুস্কিল কি? এই আকাশটাকে তুমি একটুক্ষণ ধরিয়া রাখ, আমি এখনি তোমায় সে ফল আনিয়া দিতেছি।" হারকিউলিস ভাবিলেন, "এ বড় চমৎকার কথা। কত কীর্ত্তি ত সঞ্চয় করিয়াছি কিন্তু আকাশটাকে ঠেকাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিবার এমন সুযোগ আর কোন দিন পাইব না"। তাই তিনি দৈত্যের কথায় তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন।

কত হাজার হাজার বছর এটলাসের ঘাড়ে আকাশের ভার চাপান রহিয়াছে, শীত গ্রীষ্ম, রোদবৃষ্টি সব সহিয়া বেচারা সেই বোঝা মাথায় রাখিয়া আসিতেছে। এত দিন পরে হারকিউলিসের কৃপায় সে একটু জিরাইয়া লইবার সুযোগ পাইল। মনের আনন্দে সে খুব খানিকটা লাফাইয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া, তারপর লম্বা পা ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে হেস্‌পেরাইডিসের বাগানে গিয়া হাজির। সেখানে 'ড্রেগন' মারিয়া বাগান খুঁজিয়া সোণার আপেল তুলিয়া আনিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। তখন তাহার মনে হঠাৎ এক কুবুদ্ধি জাগিল। সে ভাবিল, কেন আর মিছামিছি আকাশের বোঝা লইয়া থাকি। ঐ মানুষটার উপরেই এখন আকাশের ভার দিলেই হইল। এই ভাবিয়া সে হারকিউলিসকে বলিল, "ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমার গায়ে ত বেশ শক্তি দেখিতেছি। এখন হইতে তুমিই আকাশটাকে ঠেকাইবার ভার লওনা কেন! আমি বরং তোমার রাজার কাছে আপেলগুলা দিয়া আসি"!

হারকিউলিস দেখিলেন বেগতিক! এ হতভাগা একটুক্ষণ ছুটি পাইয়া আর কাজে ফিরিতে চায় না। তিনি একটু চালাকি করিয়া বলিলেন, "তবে ভাই একটু আকাশটাকে ধরত, আমার এই সিংহচর্ম্মটিকে কাঁধের উপর ভাল করিয়া পাতিয়া লই।" বোকা দৈত্য তাড়াতাড়ি ফলগুলা রাখিয়া আবার নিজের কাঁধ দিয়া আকাশটাকে আলগাইয়া ধরিল। হারকিউলিসও তৎক্ষণাৎ ফলগুলা উঠাইয়া লইয়া দৈত্যকে এক লম্বা নমস্কার দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। দৈত্য বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

চিঠি *

মিনু কিনুর জ্বর হয়েছে লেপ কম্বল মুড়ি
তাদের সামনে খাচ্ছে বেলী লুচি ঝুড়ি ঝুড়ি
মিনু বলে, "আমায় দেনা?" কিনুও বলে "খাব"
বেলী বলে "তোদের দিলে আমি কোথায় পাব?
"তোদের এখন জ্বর হ'য়েছে, বাড়বে এসব খেলে"—
কিনু বলে "দিচ্ছি ব'লে বৌদিদি এলে"।

*চিঠিতে সত্যিকারের তিনটি মেয়ের নাম ছিল। এখানে নামগুলি বদলাইয়া দেওয়া হইল।

মারামারি লাগ্‌ল শেষে তক্কাতক্কি ছেড়ে
কিন্নু মিন্নু লুচির ঝুড়ি খাব্‌লে নিল কেড়ে।

কোথায় গেল লেপ কম্বল কোথায় গেল জ্বর
লুচি ছিঁড়ে খাচ্ছে তারা "চপড়্‌ চপড়্‌"।
বেলা যখন সাড়ে তিনটে বৌদিদি ভাবে
"ধামা ধামা লুচি ছিল কোথায় উড়ে যাবে!
নিলে বুঝি চোরে—কিম্বা খেলে বুঝি কেউ?
মানুষ গরু বাঘ হুণ্ডার কিম্বা কোন ফেউ?
যেমনই হোক, কিন্তু ঘরে তিনটে সেয়না মেয়ে—
চোখের সামনে চুরি হ'ল দেখল না কি চেয়ে"?

এই না ব'লে বৌদিদি ঐ খুঁজছে লুচির ধামা
বেলী বলে "জল গিলে ভাই লুচি গলায় নামা"।
কিনু বলে "থাম্‌না কেন—বিষম খাবো শেষে ?
মিনু বলে "চেঁচাস্‌নে ভাই! সব যে যাবে ফেঁসে
এমনকালে ওকিরে ভাই! দরজা খোলে কে গো ?
যষ্টি হাতে ঢোকেন ঘরে দাদামশাই যে গো !!
হুড়োমুড়ি লুকোচুরি করবি কত আর ?
শাস্তিছাড়া শোয়াস্তিতে নেইকো তোদের পার।
বিচার হ'ল, গোলকুঠিতে নির্জ্জনেতে ব'সে
কিনু খাবে তিনটি গেলাস কুইনাইন ক'সে।
বেলী যাবে কল্‌কাতাতে চ'ড়ে মালের গাড়ী
পর্‌তে হবে ঘাঘ্‌রা টুপি কিম্বা ছেঁড়া সাড়ি।
কিনুর মাথায় আরশুলা কি মাকড়সা দাও বেঁধে
কিম্বা খাবে আরশুলা সে নিজের হাতে রেঁধে॥

"দিদি"

গরিলার লড়াই

যত রকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক্, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। এই যে একটা গরিলার ফটোগ্রাফ দেওয়া হয়েছে, তাতেই দেখ, তার শরীরের তেজ কিরকম ভয়ানক ভাবে তার চেহারার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। হাত পায়ের মাংস-পেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরণ আর ভ্রূকুটি ভঙ্গী পর্য্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ ক'রে তেড়ে বল্‌ছে "খবরদার! কাছে এসনা"।

মানুষের মধ্যে এত বড় পালোয়ান কেউ নাই, যে এক মিনিটের জন্যও একটা গরিলার রোখ্ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তাহ'লে সেটা দেখ্‌তে কেমন হয় ? বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখ্‌তে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে ; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশী হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সে রকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে ? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কাণটা ছেঁড়া

গরিলা

অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে। লড়ায়ের সময় কোন মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্য্যন্ত এরকম শোনা যায়নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানারকম গর্জ্জন আর হুঙ্কার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষেপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কীল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হ'য়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফঁস্ ফঁস্ আর দাঁতের কড়মড় শব্দ চল্‌তে থাকে। তার উপর সে যখন হুঙ্কার ছাড়ে, তখন অতিবড় সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে সে হুঙ্কার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।
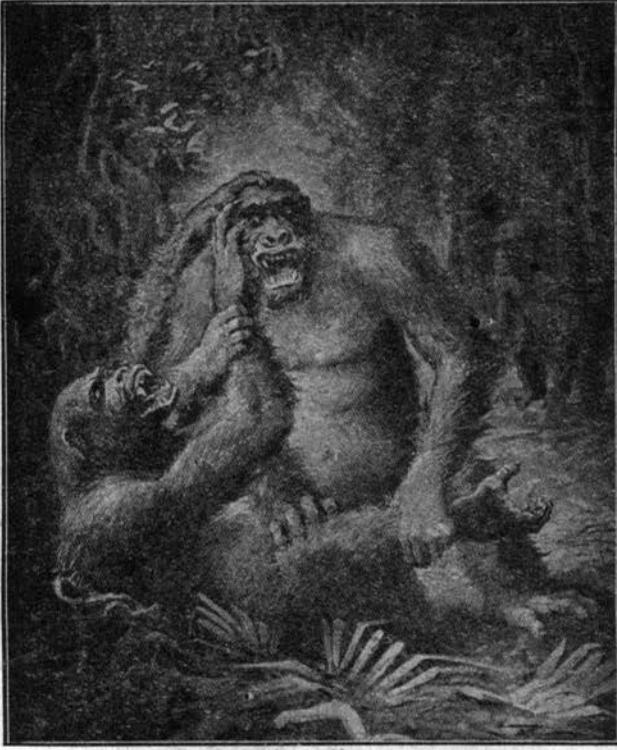
মনে কর, জঙ্গলের মধ্যে কোন গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবী ছাড়তে রাজী নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখীর মধ্যে সর্ব্বত্রই যা হ'য়ে থাকে, আর পুরাণের বড় বড় স্বয়ম্বর সভাতেও যেমন হ'য়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুইবীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই কর্‌তে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মত ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি,

যার একটি মার্‌লে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায়, মাথার খুলি ছুফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্‌পট্‌ ছুমছুম্‌ কীল চড়ের সঙ্গে খামচা খামচি আর কামড়া কামড়িও নিশ্চয়ই চলে। এই রকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এক পক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়ত গরিলা সুন্দরীর চোখের সামনেই এই ভীষণ কাণ্ড চল্‌তে থাকে। সে বেচারা হয়ত চুপ ক'রে তামাসা দেখে, কিম্বা ছুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশী পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষে হ'য়ে লড়াইয়ে একটু আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য্য নয়।

কি মুস্কিল !
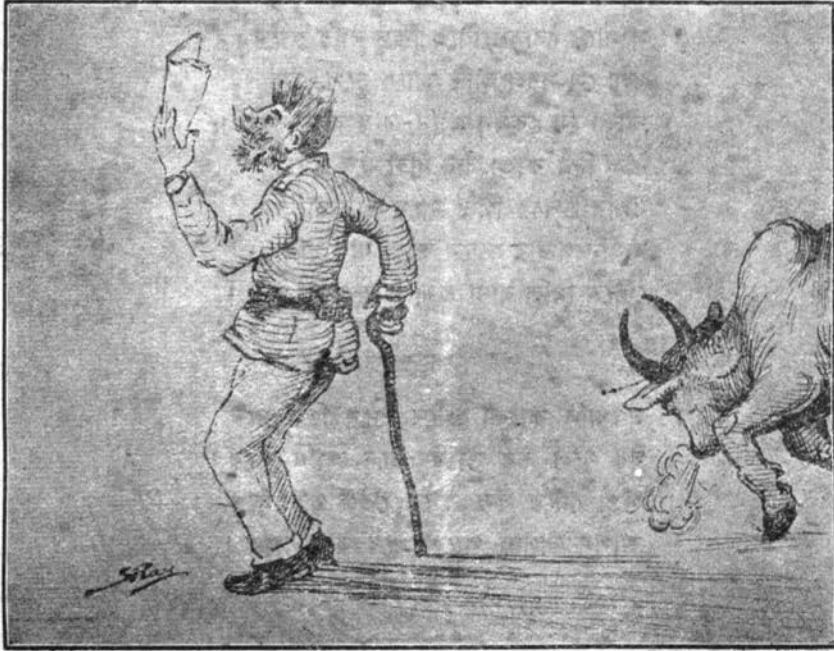
সব লিখেছে এই কেতাবে ছুনিয়ার সব খবর যত
সরকারী সব আফিসখানার কোন্‌ সাহেবের কদর কত।

কেমন ক'রে চাটুনি বানায় কেমন ক'রে পোলাও করে
নানা রকম মুষ্টিযোগের বিধান লিখ্‌ছে ফলাও ক'রে।
সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দা কেতা
পূজা পার্ব্বন তিথির হিসাব শ্রাদ্ধ বিধি লিখ্‌ছে হেথা।
সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেত লেখা কোথায়—
পাগ্‌লা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায় !!

নূতন ধাঁধা

১। কালা ধলা তুই বীর ছিল তুইখানে,
সংসারে বোবা দোঁহে কিছু নাহি জানে।
ধলা সে সরল অতি আছে চুপে চুপে,
কালা সে কেমন জানি,- বাস করে কূপে !
এক দিন কালা বীর বাহনেতে চ'ড়ে,
ধলার উপরে গিয়া নামে তার ঘাড়ে।
অমনি গভীর জ্ঞানে ভাষা যায় খুলি,
দোঁহে মিলি নানা কথা কহে নানা বুলি !

২। মুখখানি কালো ক'রে শুয়ে ছিল ঘরে
ঘুর খুলে তবু তারে টেনে আনি ধ'রে !
গুঁতা খেয়ে ফঁস্ ক'রে তেজ যত মুখে—
আপন বাসার পাশে মরে মাথা ঠুকে !

কথা সরিৎসাগর কথন

পঞ্চম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৪ | একাদশ সংখ্যা

সাহস !

পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে।
আঁধার ঘরে ঢুকতে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুর্ দুর্ জুজুর নামটি শুনে।
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও ত থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাইনেকো আহাম্মুকের মত।
মামার বাড়ীর কুকুর দুটোর বাঘের মত চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এম্‌নি আমার রোখ্!
এম্‌নি আরো নানান্ দিকে সাহস আমার খেলে
সবাই বলে "খুব বাহাদুর" কিম্বা "সাবাস্ ছেলে"।
কিন্তু তবু শীত কালেতে সকাল বেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ'লে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে—
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে!

কথা সরিৎসাগর

সেকালে একদিন কৈলাস পর্ব্বতে বসিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে বিদ্যাধরের গল্প বলিয়াছিলেন। গল্প আরম্ভের পূর্ব্বে নন্দীকে বলিয়া দিলেন—"দেবীকে আমি গল্প বলিব, এখন ভিতরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিও না।" এই বলিয়া মহাদেব গল্প আরম্ভ করিলেন, নন্দী ঘরের দরজায় প্রহরী রহিল। ক্ষণকাল পরে মহাদেবের গণগণের সর্দ্দার পুষ্পদন্ত আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলে নন্দী নিষেধ করিয়া বলিল—"ঠাকুর এখন দেবীকে গল্প শুনাইতেছেন, ভিতরে যাইতে দিব না।" একথায় পুষ্পদন্তের কুতূহল হইবার ত কথাই, সে যোগবলে অদৃশ্য হইয়া, নন্দীকে ফাঁকি দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। মহাদেব ক্রমান্বয়ে সাতটি বিদ্যাধরের গল্প দেবীকে শুনাইলেন। বলা বাহুল্য, লুকাইয়া থাকিয়া পুষ্পদন্তও সে সকল গল্প শুনিল। সে অতি আশ্চর্য্য কথা; বাড়ীতে গিয়া পুষ্পদন্ত তাহার স্ত্রী জয়াকে সে গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তাহা শুনিয়া জয়া ভাবিল—"এমন অদ্ভুত গল্প দেবী পার্ব্বতীকে না বলিলে কি চলে?" জয়ার মুখে গল্প শুনিয়া দেবী সবিস্ময়ে ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! মহাদেব বলিয়াছিলেন, এগুলি সম্পূর্ণ নূতন গল্প, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। কিন্তু জয়া কি করিয়া জানিল? তবে কি শিব আমাকে ফাঁকি দিলেন?" যাহা হউক, তিনি তখনই মহাদেবকে গিয়া বলিলেন—"তুমি সেদিন পুরাতন গল্প বলিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, আমি জয়ার নিকটেও সে গল্প শুনিয়াছি।" তখন মহাদেব সমস্তই বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"পুষ্পদন্ত লুকাইয়া সে সব গল্প শুনিয়াছিল আর বাড়ীতে গিয়া জয়াকে বলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া দেবীর ভারী রাগ হইল, তিনি পুষ্পদন্তকে ডাকাইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন—"তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! শিবের আদেশ অমান্য করিয়া গল্প শুনিয়াছ? অতএব তুমি পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই দারুণ শাপ শুনিয়া মহাদেবের অন্য এক গণ 'মাল্যবান্' পুষ্পদন্তের হইয়া দেবীকে অনেক স্তুতি মিনতি করিল। তাহাতে দেবীর রাগ দূর ত হইলই না, অধিকন্তু তিনি মাল্যবান্‌কেও শাপ দিলেন—"তুমিও মানুষ হইয়া জন্ম লও।" তখন পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান্ দুইজনে দেবীর পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, দেবীর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, তোমাদিগের মানুষজন্ম হইবেই; তবে কিনা মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি, শুন—সুপ্রতীক নামে এক যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যবনে কাণভূতি নামে পিশাচ হইয়া বাস

করিতেছে। তাহাকে দেখিলে পুষ্পদন্তের পূর্ব্বকথা মনে পড়িবে এবং তখন কাণভূতিকে এই গল্প শুনাইলে তাহার মুক্তি হইবে। তারপর কাণভূতির নিকট এই গল্প শুনিয়া মাল্যবান্ যখন তাহা জগতে প্রচার করিবে তখনই তাহার মুক্তি। আর গল্প শেষ হওয়া মাত্রই কাণভূতিরও পিশাচত্ব দূর হইয়া যাইবে।"

এই ঘটনার পর পুষ্পদন্ত কৌশাম্বীনগরে বররুচি (বা কাত্যায়ন) নামে এবং মাল্যবান্ সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে গুণাঢ্য নামে জন্মগ্রহণ করিল। কালক্রমে বররুচি মগধের রাজা নন্দের মন্ত্রী হন। একদিন তিনি দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে পূজা করিবার জন্য বিন্ধ্যবনে যান। দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর।" স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া বররুচি অনেক অনুসন্ধানের পর পিশাচকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন ? পিশাচ হইবার কারণ কি ?" পিশাচ বলিল—"আমি কুবেরের অনুচর ছিলাম। স্থূলশিরা নামক এক রাক্ষসের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া কুবেরের অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি শাপ দিলেন—'আমার অনুচর যক্ষ হইয়া ছোট লোকের সহিত মিত্রতা করিয়াছ ? অতএব, বিন্ধ্যবনে গিয়া পিশাচ হইয়া থাক।' এই নিদারুণ শাপে আমার বড় দুঃখ হইল এবং কুবেরের পায়ে পড়িয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর তিনি বলিলেন, 'শিবের গণ পুষ্পদন্ত শাপগ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট গেলে, তাহার নিকট মহাকথা শুনিয়া পরে সেকথা মাল্যবান্‌কে বলিলে তোমার মুক্তি হইবে'। তখন হইতে পিশাচ হইয়া আমি এখানে বাস করিতেছি।"

পিশাচের বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র বররুচির পূর্ব্বকথা মনে পড়িল, তিনি বলিলেন—"আমিই শাপগ্রস্ত সেই পুষ্পদন্ত ! শুন তবে গল্প বলিতেছি।" এই বলিয়া বররুচি পিশাচকে সাত লক্ষ শ্লোকের সেই মহাকথা শুনাইলেন। গল্প শেষ হইলে বলিলেন—"আমার গল্প শেষ হইয়াছে, এখন মানুষদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইব। তুমি এখানে অপেক্ষা কর ; মাল্যবান্ আসিলে তাহাকে এই মহাকথা শুনাইও—সেও মুক্তি পাইবে আর তোমারও পিশাচত্ব দূর হইবে।" এই বলিয়া বররুচি গঙ্গার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় পুষ্পদন্ত হইলেন।

এদিকে মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সাতবাহনের মন্ত্রী হন। তারপর কালক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া একদিন এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলে দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইলেন—"এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ আছে, তাহাকে

পুষ্পদন্ত এক গল্প বলিয়াছে। সেই গল্প শুনিলে তোমার মুক্তি হইবে।" মাল্যবান্ দেবীর আদেশে কাণভূতির নিকট গিয়া পিশাচ ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন—"পুষ্পদন্ত তোমাকে যে গল্প বলিয়াছে সেই গল্প শীঘ্র আমাকে বল, তাহা হইলে আমার ও তোমার উভয়ের মুক্তি হইবে।" গুণাঢ্যকে পিশাচ ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া কাণভূতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! আপনি কে এবং পিশাচ ভাষা কিরূপে শিখিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" তখন তিনি বলিলেন—"আমি প্রতিষ্ঠান নগরের সাতবাহন রাজার মন্ত্রী গুণাঢ্য। সাতবাহন ক্ষমতাশালী রাজা হইলেও তিনি মূর্খ ছিলেন—সংস্কৃত জানিতেন না। একদিন তিনি রাণীর সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহার শরীরে জল ছিটাইয়া দিলে রাণী বলিলেন—"মোদকৈঃ পরিতাড়য়।" (অর্থাৎ, জল ছিটাইও না) একথায় রাজা কতগুলি মোদক (লাড়ু) আনাইলেন দেখিয়া রাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ? সন্ধি জান না? মা উদকৈঃ—মোদকৈঃ, এই সহজ সন্ধিটা বুঝিতে না পারিয়া মোদক আনাইয়াছ? তুমি ত ভারী মূর্খ!" রাণীর কথায় রাজা নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তখনই বাড়ীতে আসিয়া অন্তঃপুরে শুইবার ঘরে আশ্রয় লইলেন—কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, কথাবার্ত্তা বলেন না।

"এই সংবাদ পাইয়া আমি ও অপর মন্ত্রী সর্ব্ববর্ম্মা রাজার নিকট গেলাম। তাঁহাকে কত প্রশ্ন করিলাম, কত স্তুতি মিনতি করিলাম কিন্তু তিনি একেবারে নীরব রহিলেন। তখন চতুর সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন—'মহারাজ! কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি আপনার মুখে সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছেন।' এই কথা শুনিবামাত্র রাজা কথা কহিলেন, বলিলেন—'আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে, কতদিনে সংস্কৃত শিখিতে পারিব?' আমি বলিলাম—'সকল শাস্ত্রের মূল ব্যাকরণ, তাহা শিখিতে বার বৎসর লাগে কিন্তু আমি আপনাকে ছয় বৎসরে শিখাইতে পারিব।' একথায় সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন—'রাজা সুখী লোক, এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিতে পারিবেন কেন? আমি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইব।' সর্ব্ববর্ম্মার এই স্পর্দ্ধা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল, বলিলাম—'তুমি যদি ছয় মাসে শিখাইতে পার তবে আমি মানুষের চলিত সংস্কৃত প্রাকৃত আর দেশভাষা, তিনটাই ছাড়িয়া দিব।' সর্ব্ববর্ম্মাও প্রতিজ্ঞা করিলেন—'যদি না পারি তবে তোমার পায়ের জুতা জোড়া বার বৎসর মাথায় করিয়া রাখিব।'

"এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্ববর্ম্মা বনে গিয়া কার্ত্তিকের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিক তাঁহাকে দেখা দিয়া 'সিদ্ধো বর্ণ সমাম্নায়ঃ'

এই সূত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে নূতন এক ব্যাকরণের সূত্র বলিলাম, ইহার নাম হইবে 'কলাপ, (অথবা কাতন্ত্র) ইহার সাহায্যে তুমি সাতবাহন রাজাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পারিবে।' এইরূপে কার্ত্তিকের বরে সর্ব্ববর্ম্মা সত্যসত্যই ছয় মাসে সাতবাহনকে সংস্কৃত শিখাইলেন। তখন আমাকে চলিত তিন ভাষা ছাড়িয়া বাধ্য হইয়া মৌনব্রত লইতে হইল এবং দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

"ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে বিন্ধ্যবাসিনীর দেবীর আদেশে এখানে আসিয়া দেখিলাম বহুতর পিশাচ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছে। শুনিয়া শুনিয়া তাহাদিগের ভাষা শিখিলাম এবং সেজন্যই তোমার সঙ্গে কথা বলিতে পারিয়াছি, নতুবা মৌনেই থাকিতে হইত।"

গুণাঢ্যের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কাণভূতি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে পিশাচ ভাষায় সেই সাতটি গল্প বলিল। গুণাঢ্য সাত বৎসরে সাত লক্ষ শ্লোকেপূর্ণ গল্পটি লিখিলেন। কথিত আছে, বনের মধ্যে কালি না পাইয়া তাঁহাকে নিজের শরীরের রক্তে সেই পুস্তক লিখিতে হইয়াছিল। লিখা শেষ হইবামাত্র কাণভূতির মুক্তি হইল। গুণাঢ্যলিখিত সেই গল্পের নাম—বৃহৎকথা। এখন এই বৃহৎকথা জগতে প্রচার না করিলে ত গুণাঢ্যের মুক্তি হইবে না! তখন অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পুস্তকখানি রাজা সাতবাহনের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তারপর পুস্তকখানি শিষ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠান নগরে পাঠাইয়া রাজাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি গল্পগুলি জগতে প্রচার করেন; আর নিজেও নগরের বাহিরে এক কালীমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাতবাহন পুস্তক গ্রহণ না করিয়া বলিলেন—"সাত লক্ষ নিরস শ্লোকের পুস্তক, পিশাচ ভাষা, তাহাও আবার রক্ত দিয়া লিখা—এ পুস্তক আমি লইব না।"

শিষ্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে গুণাঢ্য নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তখন করিলেন কি, বনের মধ্যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া পুস্তকের এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া বনের পশুপক্ষীদিগকে শুনান, আর পাতাটি আগুনে পোড়াইয়া ফেলেন। এইরূপে ছয় লক্ষ শ্লোক পোড়াইলে পর শিষ্যেরা সপ্তম লক্ষ শ্লোকটি পোড়াইতে দিল না।

ইতিমধ্যে একদিন রাজা সাতবাহনের গুরুতর পীড়া জন্মিল। রাজবৈদ্য আসিয়া বলিল—"শুষ্ক মাংস খাইয়া রাজার অসুখ হইয়াছে"। রাজা তখনই পাচকদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলে তাহারা বলিল—"মহারাজ! ব্যাধেরা আপনার আহারের জন্য আজকাল যে মাংস যোগাইতেছে তাহা সমস্তই এরূপ শুষ্ক, ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই।"

ব্যাধগণকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল—"দোহাই মহারাজ! আমাদের কোন দোষ নাই। বিন্ধ্যবনে কোথা হইতে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তিনি প্রতিদিন বনের পশুপক্ষীদিগকে ডাকিয়া অতি অদ্ভুত গল্প বলেন, আর তাহারা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া তাহা শুনে এবং সেজন্যই তাহাদিগের শরীর অনাহারে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে।"

এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা তখনই ব্যাধদিগের সহিত বনে গেলেন এবং ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহারই নিরুদ্দেশ মন্ত্রী গুণাঢ্য। এতদিন পরে প্রিয় মন্ত্রীকে পাইয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুণাঢ্য, তাঁহার অভিশাপ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শুনিয়া রাজার মনে বড় দুঃখ হইল, তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন—"গুণাঢ্য! আমার অপরাধ হইয়াছে, পুস্তকখানি আমাকে দাও!" গুণাঢ্য বলিলেন—"মহারাজ! ছয়লক্ষ শ্লোক পোড়াইয়া শেষ করিয়াছি। এক লক্ষ শ্লোক অবশিষ্ট আছে—তাহাই নিন্। আমার শিষ্যেরা পিশাচ ভাষা বুঝাইয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি যোগবলে তখনই শাপমুক্ত হইলেন।

গুণাঢ্যের মুক্তির পর রাজা সাতবাহন, তাঁহার দুই শিষ্য গুণদেব ও নন্দীদেবের সাহায্যে বৃহৎ কথার বাকি লক্ষ শ্লোক জগতে প্রচার করিলেন। বৃহৎ কথার আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার সারাংশ লইয়া সোমদেব ভট্ট যে পুস্তক লিখিয়াছেন লোকে বলে তাহারই নাম "কথা সরিৎসাগর"। *

এণা

এ কিন্তু কোন সুন্দরী তরুণী মেয়ের কাহিনী নয়, এ আমার আদরের পোষা হরিণীটির কথা। সংস্কৃতে হরিণকে 'এণ' বলে, তাই এর নাম দিয়াছি 'এণা'। মিষ্টি নামটি, তার বড় বড় করুণ চোখের চাহনির সঙ্গে বেশ মানায়।

এণা আজ বছর সাতেক আমার কাছে রয়েছে। তার এ বাড়ীতে আসবার একটুখানি ইতিহাসও আছে। এ ছিল টালীগঞ্জে নবাব বাড়ীতে, সেখানে তার সাথী সঙ্গিনীর

---

* শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত "কথা সরিৎসাগর" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহারই মূল লেখা হইতে এই গল্পটি লওয়া হইল।

অভাব ছিল না, খাবার কষ্ট পায়নি নিশ্চয়ই, বনের অনিবার স্বাধীনতার পরে, খোলা মাঠে ময়দানে, রাজ-সোহাগে দিনগুলি ভালই কাটত বোধ হয়, কিন্তু হঠাৎ নবাব সাহেবের কি মর্জ্জি হল, এক দিন হুকুম দিলেন, এ হরিণের পাল আর রাখব না, এদের বিদায় কর! এ সব সৌখীন জানোয়ারের প্রার্থীর সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? নবাব সাহেব বল্লেন যাকে তাকে ত দেব না, যাঁর অনেক হরিণ আছে, তাঁর কাছেই এদের পাঠাব।

একদিন গোধূলির শুভ লগ্নে, আকাশে যখন সোণার আলো ঝলমল করছে এখন এই তাড়িত হরিণের দল তাদের নতুন আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হল, গৃহকর্ত্তা তাদের আদর করে নিলেন। তাঁর পোষা হরিণগুলি বিঘে চারেক ঘেরা জমিতে থাকে—এদেরও সেখানে পাঠান হল। ঘাসে ভরা মাঠ, আশে পাশে নারিকেল গাছের সারি, তারি মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ছড়ান গুটিকত লতা দিয়ে ঘেরা কুটীর। বৃষ্টি বাদলে হরিণেরা সেখানে আশ্রয় নেয়, কড়া রোদের বাড়াবাড়ি তাদের যখন বড় ভাল লাগে না, তখন দাওয়ায় উঠে ছায়ায় বসে বসে জাবর কাটে, শুদ্ধ ভাষায় যাকে 'রোমন্থন' বল। এইখানে নিয়ে গিয়ে, এদের ছেড়ে দেওয়া হল। পুরাণ হরিণের দল এদের কাছে এসে, আপন দলে ডেকে নিলে, দুদণ্ডে ভাব সাব হয়ে গেল, কিন্তু বিপদ হল এণার। তাকে কেউ আমলই দিলে না। হরিণের দল কাছে গেলে সরে যায়, হরিণীরা এগিয়ে এসে গুঁতিয়ে দেয়। ক্রমে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। এদের তো বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু করা যায় না—এখন উপায়? আমি অনেক দিন হল গৃহকর্ত্তার কাছে একটি হরিণীর জন্যে দরখাস্ত পেষ করে রেখে ছিলাম, এতদিন সে আরজি না-মঞ্জুর হয়েই ছিল, আজ অগত্যা তিনি একখানি চিঠি সঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমিও পত্র পাঠ তাকে আদর করে ঘরে তুলে নিলাম। আহা আপনার জনে যাকে একটিবার ফিরেও পুছল না, লাঞ্ছিত করে বিদায় করলে, নিরাশ্রয় তাকে কি আর দূর করে দেওয়া যায়? সেই হতে সে আমার কাছেই আছে। প্রথমে দয়া করে নিয়েছিলাম, এখন ভালবাসি বলে আর কাছ ছাড়া করতে পারিনে।

প্রথম প্রথম ফাটক বন্ধ করে মাঠে তাকে ছেড়ে রাখতাম, চরে বেড়াবে, গাছের ছায়ায় বসে থাকবে—আমি দেখব। আর সকলে তার কাছে যেতে ডরাত, পাছে গুঁতিয়ে দেয়; মেয়ে হরিণ শিং নেই, এ ভয় নিরর্থক। কিন্তু আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই মনের মিল হয়ে গেল, আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দি, ব্রুস দিয়ে ধূলো ঝাড়ি,

ফল খাওয়াই; সে বড় বড় চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, চলে যেতে যাইলে কাপড় ধরে টানে। নিতান্তই যদি তার ভাবের আবেদন উপেক্ষা করে দূরে যেতে চাই

তখন সে কণ্ঠস্বর দিয়ে ডাকে— অবোলা জীব কথা তো কইতে পারে না, খালি গলার আওয়াজে তার ব্যথা জানায়। এই ডাকের মধ্যে ভারি একটি কাতরতা আছে —সুর দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ, অনেকক্ষণ ধরে টানা সুরে চীৎকার করে। ভয় পেলে কিন্তু এমন করে ডাকে না, তখন তার গলার স্বর কুকুরের ডাকের মত হয়ে যায়। প্রহরী কুকুর গৃহীকে সতর্ক করবার জন্যে যেমন বার বার তাড়াতাড়ি এক একটা আল্‌গা শব্দ করে, তেম্নি। কিন্তু দুঃখু যখন জানায়, মুখ আকাশের দিকে তুলে, গলার সুর এলিয়ে দিয়ে কাঁদে।

এণাকে বেশী দিন ছেড়ে রাখা চল্‌ল না, সে এমন ভীতু, তা কি আর বলি! দূরে রাস্তা দিয়ে যদি 'মোটর' গাড়ী যায়, তবে আর রক্ষা থাকে না। তার শব্দ মাত্রেই এণার শরীরের প্রত্যেকটি শিরা ও স্নায়ু থর থর করে কাঁপতে থাকে, একটি কাণ খাড়া করে অন্যটি নামিয়ে, পা চারখানি ছড়িয়ে আলগা ভাবে দাঁড়ায়, দেখে মনে হয় এখনি গড়িয়ে পড়ে মূর্চ্ছা যাবে বুঝি! নয়ত কাণ্ডজ্ঞানরহিত উন্মাদের মত এম্নি লম্ফ ঝম্প করতে থাকে, দেখে মনে হয়, 'ফাটকের আটক না মেনে, প্রাচীর ডিঙিয়ে, মোটরের চাকার তলে গিয়ে পড়ে মরে', তবে শান্ত হবে।

তাই তার গলায় কলার উঠ্‌ল, তার সঙ্গে শিকল বাঁধা হল, মাঠে একধারে শক্ত করে খুঁটি পোতা হল, এণা বাঁধা পড়লেন। এখন সে খুব-জোর, হাত পাঁচ ছয় জমিতে ঘোরা ফেরা ক'রতে পারে। প্রথম কিছু আপত্তি জানিয়েছিল, তার পর যখন দেখলে ঘাস আর কষ্ট করে ছিঁড়ে খেতে হয় না, মুখের কাছে জুগিয়ে দিয়ে যায়, তার উপর দানা, তরকারীর খোসা, ফেন-ভাত, মাঝে মাঝে ফল মূল মিষ্টি বিনা

আয়াসে লভ্য হয়—তখন থেকে সে খেয়ে দেয়ে দিব্যি আরামে জাবর কাটতে লাগল। সারা দিন গাছের ছায়ায় বাঁধা থাকে, নিয়মিত খেতে পায়, এক একদিন মালি নাইয়ে গা মুছিয়ে দেয়, এনা অৰ্দ্ধেক চোখে বুঁজে পড়ে পড়ে দিবাস্বপ্ন দেখে। ভয়ের ভাবটাও তার অনেক কেটে গিয়েছে, মোটর গাড়ী বাড়ীর মধ্যে এলেও আর প্রলয় বাধায় না। দুটি জিনিষের ভয় তার এখনও কাটেনি, এক ছাতা মাথায় দেওয়া মানুষ, দ্বিতীয় রিক্‌স গাড়ী। এরা যে কোন জাতীয় জীব, নখী না শৃঙ্গী, সে কিছুতেই ধারণা করতে পারে না, তাই ভয়েরও অন্ত নাই। রিক্‌স আসবার সম্ভাবনা জানা থাকলে, আগে হতে তাকে তার ঘরের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়—আর না জানা থাক্‌লে, সে সময়ে কেউ তার সম্মুখে গিয়ে গাড়ী আড়াল করে দাঁড়ায়, হরিণ বলেই এণা যে নিতান্ত নিরীহ তা নয়। যে তাকে উৎপাত করে তাকে সে ছেড়ে কথা কয় না। কাছে গেলেই গুঁতিয়ে দেয়, সুবিধা করতে পারলে কামড় দিতেও ছাড়ে না। যে সব দুষ্টু ছেলে, তাকে বিরক্ত করতো, তাদের সে অপরের বিনা সাহায্যেই বেশ শায়েস্তা করে দিয়েছে—এখন তারা তার ভিটে মাড়ায় না, দূর দিয়ে যাবার সময়ও ভয়ে ভয়ে আড় চোখে ফিরে দেখে, ঐ এণা তেড়ে আস্‌ছে কিনা।

একবার একজন আমেরিকাবাসী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এঁদের উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাস সব বিষয়েই একটু বেশী। এণাকে দেখতে এসে ইনিত একেবারে মুগ্ধ! "আহা কি চমৎকার, কি সুন্দর গঠন, গায়ের উপর দুধের মত সাদা গোল গোল দাগ গুলি কি অপরূপ, যেন পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো"—এমনি করতে করতে তিনি ক্রমেই এগিয়ে চল্‌তে লাগলেন, আমি বল্লাম "সাবধান! অপরিচিত লোক দেখলে, ওর ব্যবহার সব সময়ে ভদ্রোচিত নয়, একটু দূরে থাকাই ভাল।"—তিনি বল্লেন "অপরিচিত?—আমি যে প্রথম দেখাতেই ওকে ভালবেসে ফেলেছি—ও আমার চির পরিচিত।" খুব বেশী যাবার আগেই এণা ঝাঁপিয়ে তাঁর গায়ের উপর এসে পড়ল, আমার বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল,—"ঐরে কামড় দিলে বুঝি"। এণা চক্ষের নিমেষে মেমের কোমরবন্ধে যে প্রকাণ্ড লাল গোলাপ ফুলটি ছিল, খাবল দিয়ে সেইটাকে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে খেতে লাগ্‌ল আর ফিরেও চাইলে না। সকলে উচ্চ হাস্য করে বল্লেন—"জানোয়ার হলে কি হয়, রুচিটা খুব ভাল বল্‌তে হবে।" মেমসাহেব হাসিতে যোগ দিলেন বটে—কিন্তু তখন তাঁর গালের গোলাপী সাদা হয়ে গিয়েছে আর বেশী বাক্য ব্যয় না করে এণার কাছ হতে বিদায় নিলেন। এণার জীবন যাত্রা

অতি সহজ, এই আমাদেরই মত ওঠা, বসা, খাওয়া, শোওয়া, অল্প স্বল্প নড়ে চড়ে বেড়ান আর প্রচুর পরিমাণে নিদ্রা দেওয়া—কোনরূপ চাঞ্চল্য আগ্রহ কিম্বা আকাঙ্খা নিয়ে কিছু মাত্র ব্যতিব্যস্ত হওয়া নেই। বারো মাস রীতিমত রুটিণ্ বাঁধা জীবন, তার কোন ওলট পালট নেই, কোন আপত্তিও করে না—কিন্তু বসন্ত যখন সরে আস্‌ছে, ফাগুনে চারিদিকে পাতা ঝরিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়, তখন সে যেন পাগল হয়ে ওঠে। নিরীহ প্রাণীটি তার প্রতি অঙ্গ ভঙ্গী দিয়ে ব্যক্ত করে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"? সে চেঁচায়, দড়াদড়ি ছেঁড়ে, বাগানময় ছুটোছুটি করে, আমার সবে-ফুল-ফুটে-ওঠা যুঁই বেলার চারা গাছ মাড়িয়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়। এ সময়টা প্রতিদিনই প্রস্তুত থাকতে হয় একটা কিছু অনর্থ ঘটবে। এর পরে আমাদের দেশের ক্ষণিক বসন্তের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে বসে। সেই খাওয়া ঘুমান গড়িয়ে বেড়ান আর জাবর কাটা। ক্রমে গরম যেমন পড়ে, এণাও তেমনি নরম হয়ে পড়ে; খাওয়ায় রুচি নেই কিন্তু শোবার অরুচি তেমনি খুব কম। এ সময় তার যেন কুম্ভকর্ণের ছোঁয়াচ লাগে, ঘুমতে পারলে জাগতে আর চায় না। দিন গুলি এই ভাবে গড়াতে গড়াতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে আষাঢ়ের প্রথমে এসে পোঁছায়; তখন আবার এক নূতন উপসর্গ দেখা দেয়; মেঘ ডাকে, বাতাস হা হুতাশ করে, বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টির ধারা চারিদিকে তাল নারিকেল পাতার উপর পড়ে শিলাবৃষ্টির মত শোনায়। তখন এণা শুধু নিজে চঞ্চল হয় তা নয়, অপরকেও বিশেষ চঞ্চল করে তোলে—চীৎকার সুরু হয়, তিষ্ঠোন দায়, মাঝে মাঝে গিয়ে ধমক ধামক দিতে হয় কিন্তু তাতে গোলযোগ বেশী করে হওয়া ছাড়া অন্য ফল দেখা যায় না! আকাশে মুখ তুলে ডাকে আর সাড়া পাবার জন্যে কাণ খাড়া করে থাকে! বর্ষা আর বসন্তে এণার ভাবান্তরের কথা বল্লাম বলে কেউ যেন মনে না করেন এ শুধু কবি-কল্পনা। এ কিন্তু নির্ভাজ সত্যি।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ঠুকেমারি আর মুখেমারি

মুখে-মারি পালোয়ানের বেজায় নাম,—তার মত পালোয়ান নাকি আর নাই। ঠুকে-মারি সত্যিকারের মস্ত পালোয়ান, মুখে-মারির নাম শুনে সে হিংসায় আর বাঁচে না। শেষে একদিন ঠুকে-মারি আর থাকৃতে না পেরে, কম্বলে নব্বুই মণ আটা বেঁধে নিয়ে, সেই কম্বল কাঁধে ফেলে, মুখে-মারির বাড়ী রওয়ানা হ'লো।

পথে এক জায়গায় বড্ড পিপাসা আর ক্ষিদে পাওয়ায় ঠুকেমারি কম্বলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা ডোবার ধারে বিশ্রাম করতে বস্‌ল। তারপর চোঁ-চোঁ করে এক বিষম লম্বা চুমুক দিয়ে ডোবার অর্দ্ধেক জল খেয়ে বাকি অর্দ্ধেকটায় সেই আটা মেখে নিয়ে সেটাও সে খেয়ে ফেল্‌ল। শেষে মাটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

সেই ডোবাতে একটা হাতী রোজ জল খেতে আস্‌ত। সেদিনও সে জল খেতে এল; কিন্তু ডোবা খালি দেখে তার ভারি রাগ হ'লো। পাশেই একটা মানুষ শুয়ে আছে দেখে সে তার মাথায় দিল গোদা পায়ের এক লাথি! ঠুকে-মারি বল্‌ল, "ওরে,

মাথা টিপেই দিবি যদি, একটু ভাল ক'রেই দে' না বাপু!" হাতীর তখন আরো বেশী রাগ হ'লো। সে শুঁড়ে ক'রে ঠুকে-মারিকে তুলে আছাড় মার্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই ঠুকে-মারি তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে উঠে হাতী মশাইকে থ'লের মধ্যে পুরে রওয়ানা হ'লো।

খানিক দূর গিয়ে সে মুখে-মারির বাড়ীতে এসে হাজির হ'লো আর বাইরে থেকে চেঁচাতে লাগ্‌ল, "কই হে মুখে-মারি! ভারি নাকি পালোয়ান তুমি! সাহস থাকে তো লড় না এসে!" শুনে মুখে-মারি তাড়াতাড়ি বাড়ীর পিছনে এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে

পড়ল! মুখে-মারির বৌ বল্‌ল, "কর্ত্তা আজ বাড়ী নেই। কোথায় যেন পাহাড় ঠেল্‌তে গিয়েছেন।" মুখে-মারি বল্‌ল, "এটা তা'কে দিয়ে ব'লো যে এর মালিক তার সঙ্গে লড়্‌তে চায়।" এই ব'লে সে হাতীটাকে ছুঁড়ে তাদের উঠানে ফেলে দিল।

ব্যাপার দেখে বাড়ীর লোকের চক্ষুস্থির! কিন্তু মুখে-মারির সেয়ানা খোকা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "ও মা গো! দুষ্টু লোকটা আমার দিকে একটা ইঁদুর ফেলেছে! কি করি বল তো?" তার মা বল্‌ল, "কিছু ভয় নেই! তোমার বাবা এসে ওকে উচিত শিক্ষা দেবেন! এখন ইঁদুরটাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাও।"

এই কথা বলা মাত্র ঝাঁটার ঝটপট শব্দ হ'লো আর ছেলেটা বল্‌ল, "ঐ যা! ইঁদুরটা নর্দ্দামায় পড়ে গেল"। ঠুকেমারি ভাব্‌ল "যার খোকা এ রকম, সে নিশ্চয়ই আমার উপযুক্ত জুড়ি হবে।"

বাড়ীর সাম্‌নে একটা তাল গাছ ছিল, সেইটা উপড়ে নিয়ে ঠুকে-মারি হেঁকে বল্‌ল "ওরে খোকা, তোর বাবাকে বলিস্‌ যে আমার একটা ছড়ির দরকার ছিল, তাই এটা নিয়ে চল্‌লাম"। খোকা তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌ল, "ওমা দেখেছ? ঐ দুষ্টু লোকটা বাবার খড়্‌কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল"। 'খড়কে কাঠি' শুনে ঠুকেমারির চোখ দুটো আলুর মত বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ভাব্‌ল "দরকার নেই বাপু ও সব লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে!" সে তখনই হন্‌ হন্‌ ক'রে সে গ্রাম ছেড়ে নিজের গ্রামে পালিয়ে গেল।

মুখেমারি বাড়ীতে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে! লোকটা গেল কই"? খোকা বল্‌ল, "সে ঐ তালগাছটা নিয়ে পালিয়ে গেল"। "তুই তাকে কিছু বল্‌লি না"? "নিয়ে গেল, তা আমি আর তাকে বল্‌ব কি"? এই কথা শুনে মুখেমারি ভয়ানক রেগে বল্‌ল, "হতভাগা! তুই আমার ছেলে হ'য়ে আমার নাম ডোবালি? দরকার হ'লে দুটো কথা বল্‌তে পারিস্‌ নে? যা! আজই তোকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আস্‌ব"। এই বলে সে অপদার্থ ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দিতে চল্‌ল।

কিন্তু গঙ্গা ত গ্রামের কাছে নয়—সে অনেক দূর। মুখেমারি হাঁটছে হাঁটছে আর ভাব্‌ছে, ছেলেটা যখন কান্নাকাটি কর্‌বে, তখন তাকে বল্‌বে, "আচ্ছা, এবার তোকে ছেড়ে দিলাম"। কিন্তু ছেলেটা কাঁদেও না, কিছু বলেও না, সে বেশ আরামে কাঁধে চড়ে "গঙ্গায়" চলেছে। তখন মুখেমারি তাকে ভয় দেখিয়ে বল্‌ল, "আর দেরী নেই, এই গঙ্গা এসে পড়্‌ল বলে"। ছেলেটা চট্‌ ক'রে বলে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ বাবা! বড্ড জলের ছিটা লাগ্‌ছে"। শুনে মুখেমারির চক্ষুস্থির! সে তখনই ছেলেকে কাঁধ থেকে নামিয়ে

বল্‌ল, "শীগ্গির বল্, সত্যি ক'রে। লোকটাকে তুই কিছু বলেছিস্ কিনা"? ছেলে বল্‌ল, "ওকেত আমি কিছু বলিনি। আমি মাকে চেঁচিয়ে বল্লাম, দুষ্টু লোকটা বাবার খড়কে কাঠি নিয়ে পালিয়ে গেল"। মুখেমারি এক গাল হেসে তার পিঠ থাবড়ে বল্‌ল, "সাবাস ছেলে! বাপ্‌কা বেটা!"

রাবণ রাজার দেশে

[আমাদের সন্দেশের একটি ছোট্ট পাঠিকাকে তাঁর ছোট্ট দিদিমা লঙ্কাদ্বীপ থেকে এক চিঠি লিখেছেন। তারই খানিটা এইখানে তুলে দেওয়া হ'ল।]

"ভেদ্দা" বা লঙ্কা দ্বীপের আদিম লোক।

মি এখন রাবণ রাজার দেশে; কিন্তু তাঁর বাড়ী এখনো দেখিনি। তোমাদের দেশ ছেড়ে আসার পর কত সুন্দর, কত মজার, আবার কত বিশ্রী দেশও দেখ্‌লাম। রাবণ রাজার দেশ কিন্তু বড় সুন্দর। জান, একটা দেশে দেখেছিলাম পুরুষদেরও নাকে নথ। একটা দেশে কলা বিক্রী করছিল 'আই দোবেলে' না এরকম কি একটা কথা ব'লে। একটা যায়গায় এক গাছের তলায় ঘোড়ায় চড়া ঠাকুর এনে ফেলে দিয়েছে দেখ্‌লাম। কত যায়গায় কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ বিক্রী করতে এনেছিল। এখানে আস্‌তে সমুদ্রের উপর দিয়ে পুল বেঁধেছে তার উপর দিয়ে একটা দ্বীপে এসে, সেখান থেকে ট্রেণে একটুখানি সমুদ্রের উপর দিয়ে গিয়ে জাহাজে চড়্‌তে হয়। যে দ্বীপটার কথা বল্লাম সেটা প্রবাল দ্বীপ। কত প্রবাল

যে সেখানে পড়ে রয়েছে কি বল্‌ব। একটা ছিল চমৎকার এঁঞ্চতোড়া ফুলের মত দেখ্‌তে, যেন গাছে একরাশ চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। আমার ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে সেটা তুল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল—কিন্তু সে দেশের লোকেরা যেন কি রকম কিছু গ্রাহ্যই কর্‌ছিল না অমন সুন্দর জিনিষটাকে। সমুদ্রের ধারে ফেণা এসে কুন্দ ফুলের পাপড়ির মত হয়ে জমে থাক্‌ছিল—কি সুন্দর দেখ্‌তে লাগ্‌ছিল কি বল্‌ব। এই ফেণা শুকিয়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় নুণের মত, মার্ব্বেলের কুচির মত দেখ্‌ছিল। আর যাকে "সমুদ্রের ফেণা" বলে লোকে ভুল করে সেই কাট্‌ল মাছের হাড়ও দুয়েকটা পড়েছিল। আমরা যখন ট্রেণ থেকে নেমে কাঠের পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ কাঠের ফাঁকের মধ্য দিয়ে এসে আমার জুতো মোজা ভিজিয়ে দিল।

জাহাজে চড়ে আমার বেশ ফূর্ত্তি লাগছিল, জাহাজটার নাম ছিল Curzon। আমি ত খুব আনন্দ কর্‌ছি, এমন সময় এক সাহেব খালাসী এসে আমাকে বল্‌ল "আজ সমুদ্র বড্ড গরম হয়ে আছে, আপনি চেয়ারে মাথা খুব হেলান দিয়ে বসে থাক্‌বেন।" আমি ত তাই বস্‌লাম। আমার সাম্‌নে একটা বাল্‌তী রেখে গেল একটি লোক। তাই দেখে মিঃ গুণরত্নম্ বলে একজন এ দেশী লোক—রাক্ষস কিন্তু নন্—বল্লেন, "দেখেছেন ব্যাপার কি হবে মনে কর্‌ছে এরা"। আমি ত খুব হাস্‌লাম। তারপর কিছু পরে একজন আমায় বল্লেন, "আপনি বড় ধারে বসেছেন, এখানে আমাদের কাছে এই বেঞ্চে এসে বসুন। বড্ড ঝড় হচ্ছে, চেয়ারখানা উল্‌টিয়ে যেতে পারে।" কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্‌বার পর আমি বুঝ্‌লাম আমি কি দুর্ব্বুদ্ধির কাজ করেছি। একটু পরেই আমার বাল্‌তীর দরকার হ'ল। তারপর মারও দরকার হ'ল। জাহাজ ভয়ানক দুল্‌তে লাগ্‌ল আর যে দু ঘণ্টা জাহাজে ছিলাম আমার মনে হতে লাগ্‌ল তা যেন আর শেষ হবে না। আমি কত ভাল ভাল জিনিস খেয়েছিলাম তার কিছু আমার পেটে রইল না, উল্‌টিয়ে নাড়ী ভুঁড়ী শুদ্ধ বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি তখন মার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম।

রাবণ রাজার দেশের রেলগাড়ীগুলো খুব পরিষ্কার। এদের গদী গরম কাপড়ে মোড়া আর বেশ চওড়া। গাড়ীতে উঠবার কিছু পরে মাথায় গোল চিরুণী দেওয়া খোঁপা বাঁধা মজার ধরণের কাপড় পরা একটি লোক জিজ্ঞাসা করে গেল কি খাব। এদেশে পুরুষেরাও খোঁপা বাঁধে আর তারা চিরুণী অম্‌নি করে মাথায় দেয়। আমি ত ছবি আঁক্‌তে পারি না, পারলে দেখাতাম সে কেমন অদ্ভুত দেখায়।

গদাই নস্কর

নস্করদের গদাধর, লোকে বল্‌ত গদাই ;
এম্‌নি তিনি পা বাড়াতেন ওজন ক'রে সদাই,—
নড়ত নাক শরীরখানা, বাঁকৃত নাক হাঁটু,
ছালা বোঝাই ছেলে-পীঠে যেন বেদের টাটু।

গয়ানাথ ও গঙ্গারাম জুটল তাহার সাথে,—
গয়া ছিল কোল-কুঁজা ও গঙ্গা ভঙ্গ বাতে।
একটি দিন তিন্‌টি বন্ধু দাঁড়িয়ে দীঘির পাড়ে,—
আজ্‌গুবি এক আওয়াজ হ'ল পাশের বাঁশের ঝাড়ে।

"দৌড়ে পালাও গদাইনস্কর" চেঁচায় ছেলের পাল ;
পা বাড়াতে তিন্‌টি বন্ধুর বদ্‌লে গেল চা'ল।
গড়িয়ে তিন্‌টি দেহ-পিণ্ড দীঘির জলে পড়ে ;
"গয়া-গঙ্গা-গদাধর" মন্ত্র সবাই পড়ে।

জারি হ'ল ভারি খ্যাতি দেশেতে ফস্‌ করি',—
এই চলনের হ'ল নাম "গদাই নস্করি"।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

সমুদ্র

"সমুদ্রটা কেমন ?"—এর উত্তরে আমি এমন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইতেছি না, যাহা বলিলে যে সমুদ্র দেখে নাই, সেও মনে মনে তাহার একটা চেহারা কল্পনা করিয়া লইতে পারে। একটি শিশু পুকুর দেখিয়া বলিয়াছিল, "কত বড় চৌবাচ্ছা !" সে যাহা আগে দেখিয়াছে, নূতন জিনিষকে তাহারই পরিচয়ে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য

সমুদ্রের যখন কূল কিনারা দেখা যায় না, তখন তাহাকে চৌবাচ্ছা মনে করা শিশুর পক্ষেও সম্ভব না হইতে পারে। আর চৌবাচ্ছাটাকে মনে মনে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার কূল কিনারা দূর করিয়া দিতে পারিলেও তাহা ঠিক সমুদ্রের মতন হইবে না।

সমুদ্র খুবই বড় তাহার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহাকে যেটুকু বড় দেখা যায়, তাহা তেমন কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীর এক এক স্থান সোজাসুজি দেখিতে প্রায় এই রূপই বোধ হয়। হিমালয়ে উঠিবার সময় মাঠের দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ঐরূপ সমুদ্রের চাইতে বড় জিনিসই দেখিয়াছে। যত উঁচুতে উঠা যায়, ততই বেশী দূর অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর কাছে সমুদ্র আসলে সাত হাজার মাইল লম্বা হইলে কি হইবে ? তাহার কূলে দাঁড়াইয়া পনর কুড়ি মাইলের অধিক দেখা যায় না। কিন্তু দারজিলিংএর পথে এক এক জায়গায় নীচের দিকে তাকাইলে মাঠের উপর দিয়া ষাট সত্তর মাইল পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে।

সমুদ্রের সম্মান কেবল তাহার মস্ত শরীরটার জন্য নহে, তাহার আরো গুণ আছে। দেশের সাধারণ লোকেরা ত সমুদ্রকে একটা দেবতা বিশেষ বলিয়াই মনে করে। এ কথার প্রমাণ সমুদ্রের ধারে গেলেই পাওয়া যায়।

পুরী তীর্থস্থান, সেখানে অনেক দূর হইতে যাত্রীরা আসে। এসকল যাত্রী যে সমুদ্র দেখিবার জন্য আসে, তাহা নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দেখা। ভক্তিমান্ যাত্রীরা অনেকে রেল হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখিবামাত্রই হাতযোড় করে, আর মন্দিরে আসিয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া তবে সে হাত নাবায়। কিন্তু জগন্নাথের ওখান হইতে বিদায় হইয়াই যে সে যথেষ্ট মনে করিবে তাহা নহে, সমুদ্রকে একবার না দেখিয়া, তাহাকে পূজা না করিয়া, তাহাকে কিছু ফল না খাওয়াইয়া আর তাহার ঢেউ না খাইয়া দেশে ফিরিলে তাহার সকলই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

নিতান্ত গরীব, আর নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে লোক, পূজা করিবার পয়সা নাই, ঢেউ খাইবার ভরসা নাই, এমন লোকও সমুদ্রকে একবার সেলাম না করিয়া দেশে ফিরিবে না। আমি প্রায়ই দুপুরবেলা সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন এই সকল লোককে দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। উহাদের অনেকেই দূর দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা উহাদের ভাষাতেই বুঝা যায়। গৃহে কোন স্নেহের পাত্রকে রাখিয়া আসিয়াছে হয়ত খোকা খুকী, অথবা ছোট ভাই বোন, না হয় আর কেহ। উহাদের

জন্য দুএকটি সুন্দর উপহার প্রায় সকলেই কিনিয়াছে। রঙ্গিন বাঁশের ছাতা, সরু সরু বেত, বিচিত্র বর্ণের থ'লে, এইরূপ দুএকটি জিনিস প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে। পুঁটুলীর ভিতরে হয়ত আরো কত জিনিষ আছে। কেহ কেহ আবার দুটি করিয়া ছাতা কিনিয়াছে। বাঁশের ছাতা গুটাইবার যো নাই; কাজেই দুটিকেই মাথায় দিয়া চলিতে হইতেছে। তাহাতে চেহারাখানি খুলিয়াছে ভাল। মাঝে মাঝে আবার এক এক জনের মাথায় এক একটা কড়া। তাহাতে ছাতার কাজও চলিতেছে, টুপীর কাজও হইতেছে, আবার দরকার হইলে রান্নার কাজও চলিতেছে।

ইহারা যে কতখানি কৌতূহল আর আগ্রহের সহিত সমুদ্র দেখিতে আসিয়াছে, তাহা ইহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। আর সমুদ্রকে দেখিয়া যে তাহারা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাও উহাদের সম্ভাষণেতেই প্রকাশ! "হা রে! সমুন্দর মহারাজ!" ইহারা সাধারণতঃ দূর হইতে সমুদ্রের প্রতি ভক্তি দেখাইয়াই চলিয়া যায়। কদাচিৎ দুই একজন কাছে যাইতে সাহস করে। যাহারা কাছে যায়, তাহাদের উদ্দেশ্য একটু সমুদ্রের জল তুলিয়া মাথায় দেওয়া। এ কাজটি অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। যেদিন সমুদ্রে ঢেউ বেশী থাকে, সেদিন এরূপ করিতে বেশ একটু সাহসের আবশ্যক। একস্থানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের জল হাতে পাওয়া অতি অল্প সময়ই সম্ভব হয়। ঢেউয়ের সঙ্গে জল এক একবার ছুটিয়া কাছে আসে, আবার অনেকদূর হটিয়া যায়। তাহাও যে শান্তভাবে করে, তাহা নহে। তুমুল বিক্রম আর তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত ঢেউ আসিয়া ডাঙ্গায় ভাঙ্গিয়া পড়ে; তাহা দেখিলে মনে ভয় হওয়ারই কথা। ইহার সামনে সাহস করিয়া জল লইতে যে অল্প লোকেই যায়, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর, ইহারাও যে একটু জল ছুঁইয়া মাথায় দিতে পারিলে আর মুহূর্ত্ত কালও সেখানে বিলম্ব করে না, একথা বলাই বাহুল্য।

মানুষের দেহে যেমন মুখখানিই সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমুদ্রের এই ঢেউগুলি সেইরূপ। সমুদ্রকে দেখিতে পাওয়ার অনেক আগেই ঢেউয়ের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। এ কোলাহলের আর নিবৃত্তি নাই। যেন দেশের সব রেলগাড়ী আর ঝড়েদের মধ্যে বচসা চলিয়াছে। এদিকে হয়ত হাওয়ার লেশমাত্র দেখা যায় না, কিন্তু সমুদ্রে গিয়া দেখ, ঢেউয়ের নৃত্যের বিরাম নাই। লম্বা লম্বা ঢেউ (পনের কুড়ি হাত চওড়া, চারি পাঁচ হাত উঁচু, আর একশত গজ হইতে সিকি মাইল পর্য্যন্ত লম্বা) কোথা হইতে ক্রমাগত তীরের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। গড়াইয়া, লাফাইয়া, চ্যাচাইয়া, ফেণা

তুলিয়া, ডিগবাজী খাইয়া শিশুর দলের ন্যায় তাহারা আসিতেছে। তীরের সঙ্গে এই খেলা ভিন্ন উহাদের আর কোন কাজ নাই। ঢেউটা তীরের উপর আসিয়া পড়িল, আবার

তীরের ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া চলিল। ততক্ষণে পিছন হইতে আর এক ঢেউ আসিয়া উপস্থিত, কাজেই দুটিতে ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। তখনকার দৃশ্য দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত। বাজ পড়ার মতন একটা ভয়ানক শব্দ হয়; আর সেখানকার জলগুলি চুরমার হইয়া তুবুড়ি বাজির পাহাড়ের মতন লাফাইয়া উঠে।

দূরে সমুদ্রের ভিতরের দিকে তাকাইলে এসকলের কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেখানকার ঢেউ অন্যরূপ। গভীর জল ছাড়িয়া যতই কম জলের দিকে আসা যায়, ততই এই সকল তীরমুখী লম্বা লম্বা ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায়। ঢেউগুলি অবশ্য সমুদ্রের ভিতরের দিক হইতেই আসে; কিন্তু গভীর জলে তাহারা তেমন উঁচু থাকে না, কাজেই তাহারা চোখে পড়ে না। তার পর যত কম জলের দিকে আসিতে থাকে, ততই ক্রমে উঁচু হইয়া শেষটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। খুব লক্ষ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন ঢেউয়ের সামনের জলের বেগ কম, এমন কি অনেক স্থলে ঠিক বিপরীত দিকেই তাহার গতি। এই উল্টামুখো জলের সহিত ঠেলাঠেলির দরুণই তীরের কাছে এমন তুমুল কাণ্ড হয়। তীরে ঠেকিয়া সকল ঢেউকেই আবার ফিরিতে হয়। ইহা হইতেই ঐ উল্টামুখো জলের উৎপত্তি। ঢেউগুলি তীরে ঠেকিয়া যখন ফিরিয়া চলে, তখন তাহাদিগকে অনেক দূর অবধি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পথে আর একটা ঢেউয়ের

সত্তঙ্গ বিবাদ হইলেও তাহার লোপ হয় না; বিবাদ থামিয়া গেলে আবার তাহাকে অনেক খানি অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মোটের উপর দেখা যায়, যে তীরমুখী ঢেউয়েরই জোর বেশী। এই কারণেই সমুদ্রে একটা কিছু জিনিস ফেলিয়া দিলে খানিক বাদে সেটা আবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে বলে "সমুদ্র কাহারও কিছু গ্রহণ করে না; যাহা দেওয়া যায়, তাহা সে আবার ফিরাইয়া দেয়।"

খানিক আগে যে যাত্রীদের সমুদ্রকে খাইতে দিবার কথা বলিয়াছি, তাহার জিনিষ পত্রও এইরূপে সমুদ্র ফেরত দেয়। খাইতে দেওয়া আর কিছুই নহে, কোনরূপ ফল সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া; তাহা হইলেই সমুদ্রের আহার করা হইল। যিনি ফল দিলেন, তিনি এজীবনে আর সে ফল খাইতে পারিবেন না। আবার যেমন তেমন ফল দিলে হইবে না—অন্ততঃ তাহাতে পুণ্য কম—নিজের অতিশয় প্রিয় ফল হওয়া চাই। নিতান্ত ছোট একটি ফল দাও, তাহাতে ক্ষতি নাই, তোমার প্রিয় ফল হইলেই হইল। সমুদ্রের ধারে যে সকল ফলের নমুনা দেখিয়াছি, আর বাজারে সমুদ্রের আহারের জন্য যেরূপ ফল বিক্রী হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, যে ছোট ছোট ভিন্ন অন্যরূপ ফল সমুদ্র মহারাজের ভাগ্যে অল্পই জুটিয়া থাকে। নচেৎ মানিতে হয়, যে ভাল বড় ফল পাইলে মহারাজ তাহা ফিরাইয়া দিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হন। আমি যে সকল নারিকেল তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে দেখিয়াছি, তাহার আকার সাধারণতঃ কামরাঙ্গার চাইতে বড় হইবে না, পটলের মতনও ছিল।

বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়

বিষ্ণুবাহন খাসা ছেলে। তাহার নামটি যেমন জমকালো, তার কথাবার্ত্তা চালচলনও তেমনি। বড় বড় গম্ভীর কথা তাহার মুখে যেমন শোনাইত, এমন আর কাহারও মুখে শুনি নাই। সে যখন টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া "দুঃশাসনের রক্তপান" অভিনয় করিত, তখন আমরা সবাই উৎসাহে হাত তালি দিয়া উঠিতাম, কেবল দু একজন হিংসুটে ছেলে নাক সিটকাইয়া বলিত, "ও রকম ঢের ঢের দেখা আছে"। ভূতো এই হিংসুক দলের সর্দ্দার, সে বিষ্ণুবাহনকে ডাকিত "খগা"। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বিষ্ণুবাহন মানে গরুড়, আর গরুড় হ'চ্ছেন খগরাজ—খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল—তাই বিষ্ণুবাহন হ'লেন খগা"। বিষ্ণুবাহন বলিল, "ওরা আমার নামটাকে পর্য্যন্ত হিংসে করে"।

বিষ্ণুবাহনের কে এক মামা "চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়" ব'লে একখানা নতুন নাটক লিখিয়াছেন। বিষ্ণুবাহন একদিন সেটা আমাদের পড়িয়া শোনাইল। শুনিয়া আমরা সকলেই বলিলাম, "চমৎকার"! বিশেষত, যে জায়গায় চন্দ্রদ্বীপ "আয় আয় কাপুরুষ আয় শত্রু আয় রে" বলিয়া নিষাদ রাজার সিংহদরজায় তলোয়ার মারিতেছেন, সেই জায়গাটা পড়িতে পড়িতে, বিষ্ণুবাহন যখন হঠাৎ "আয় শত্রু আয়" বলিয়া ভূতোর ঘাড়ে ছাতার বাড়ি মারিল, তখন আমাদের এমন উৎসাহ হইয়াছিল যে আর একটু হইলেই একটা মারামারি বাধিয়া যাইত। আমরা তখনই ঠিক করিলাম যে ওটা "অ্যাক্‌টিং" করিতে হইবে।

ছুটির দিন আমাদের অভিনয় হইবে, তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। রোজ টিফিনের সময় আর ছুটির পরে আমাদের তর্জ্জন গর্জ্জনে পাড়া-শুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিত যে, একটা কিছু কাণ্ড হইতেছে। বিষ্ণুবাহন চন্দ্রদ্বীপ সাজিবে, সে'ই আমাদের কথাবার্ত্তা শিখাইত আর অঙ্গভঙ্গী লম্ফ ঝম্ফ সব নিজে করিয়া দেখাইত। ভূতোর দল প্রথমটা খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন বিষ্ণুবাহন কোথা হইতে এক রাশ নকল গোঁফ দাড়ি, কতগুলা তীর ধনুক, আর রূপালি কাগজ-মোড়া কাঠের তলোয়ার আনিয়া হাজির করিল, সেই দিন তাহারা হঠাৎ কেমন মুশ্‌ড়াইয়া গেল। ভূতোর কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার বদলাইয়া আশ্চর্য্যরকম নরম হইয়া আসিল এবং বিষ্ণুবাহনের সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য সে হঠাৎ এমন ব্যাকুল হইয়া হইয়া উঠিল যে ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়া রহিলাম। তারপর দিনই টিফিনের সময় সে একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, 'দূত হ'ক্, পেয়াদা হ'ক্, তাহাকে যাহা কিছু সাজিতে দেওয়া যাইবে, সে তাহাই সাজিতে রাজি আছে।" শেষ দৃশ্যে রণস্থলে মৃত দেহ দেখিয়া নিষাদরাজের কাঁদিবার কথা—আমরা কেহ কেহ বলিলাম, "আচ্ছা ওকে মৃতদেহ সাজ্‌তে দাও"। বিষ্ণুবাহন কিন্তু রাজি হইল না, সে ছেলেটাকে বলিল, "জিজ্ঞাসা করে আয়, সে তামাক সাজ্‌তে পারে কিনা"। শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া খুব হাসিলাম, আর বলিলাম, "এইবার ভূতোর মুখে জুতো"।

তারপর একদিন আমরা হরিদাসকে দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন লেখাইলাম। হরিদাস ছবি আঁকিতে জানে, তার হাতের লেখাও খুব ভাল ; সে বড় বড় অক্ষরে একটা সাইনবোর্ড লিখিয়া দিল—

"চন্দ্রদ্বীপের দিগ্বিজয়"

১৪ই আশ্বিন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা

আমরা মহা উৎসাহ করিয়া সেইটা স্কুলের বড় বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিলাম। কিন্তু পরের দিন আসিয়া দেখি কে যেন 'চন্দ্রদ্বীপ' কথাটাকে কাটিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—"বিষ্ণুবাহন"—বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়! ইহার উপর ভূতো আবার গায়ে পড়িয়া বিষ্ণুবাহনকে শুনাইয়া গেল "কিরে খগা, খুব দিগ্বিজয় করছিস্ যে!"

এমনি করিয়া শেষে ছুটির দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন আমাদের উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, আমরা পর্দ্দা ঘেরিয়া তক্তা ফেলিয়া মস্ত ষ্টেজ বাঁধিয়া ফেলিলাম। অভিনয় দেখিবার জন্য দুনিয়াশুদ্ধ লোককে খবর দেওয়া হইয়াছে, ছয়টা না বাজিতেই লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলে তাড়াহুড়া করিয়া পোষাক পরিতেছি, বিষ্ণুবাহন ছুটাছুটি করিয়া ধমক ধামক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উপদেশ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত যখন ঠিকঠাক হইল, তারপর ঘণ্টা দিতেই "ষ্টেজের" পর্দ্দা সর্‌সর্ করিয়া উঠিয়া গেল, আর চারিদিকে খুব হাততালি পড়িতে লাগিল।

প্রথম দৃশ্যেই আছে, চন্দ্রদ্বীপ তাহার ভাই বজ্রদ্বীপের খোঁজে আসিয়া নিষাদরাজার দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং খুব আড়ম্বর করিয়া নিষাদরাজকে "আয় শত্রু আয়" বলিয়া যুদ্ধে ডাকিতেছেন। যখন তলোয়ার দিয়া দরজায় মারা হইবে তখন নিষাদের দল হুঙ্কার দিয়া বাহির হইবে আর একটা ভয়ানক যুদ্ধ বাধিবে। দুঃখের বিষয়, বিষ্ণুবাহনের বক্তৃতাটা আরম্ভ না হইতেই সে অতিরিক্ত উৎসাহে ভুলিয়া খটাং করিয়া দরজায় হঠাৎ এক ঘা মারিয়া বসিল। আর কোথা যায়! অমনি নিষাদের দল "মার মার" করিয়া আমাদের এমন ভীষণ আক্রমণ করিল যে, নাটকে যদিও আমাদের জিতিবার কথা, তবু আমরা বক্তৃতা টক্তৃতা ভুলিয়া যে যার মত পিট্টান দিলাম। বাহিরে আসিয়া বিষ্ণুবাহন রাগে গজ্‌রাইতে লাগিল। আমরা বলিলাম, "আসল নাটকে কি আছে কেউত তা জানে না—না হয়, চন্দ্রদ্বীপ হেরেই গেল"। কিন্তু বিষ্ণুবাহন কি সে কথা শোনে? সে লাফাইয়া ধমকাইয়া হাত পা নাড়িয়া শেষটায় নাটকের বইএর উপর এক কালির বোতল উল্টাইয়া ফেলিল, এবং তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া কালি মুছিতে লাগিল। ততক্ষণে এদিকে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘণ্টা পড়িয়াছে।

বিষ্ণুবাহন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আবার আসরে নামিতে গিয়াই পা হড়কাইয়া প্রকাণ্ড এক আছাড় খাইল। দেখিয়া লোকেরা কেহ হাসিল, কেহ "আহা আহা" করিল, আর সব গোল্‌মালের উপর সকলের চাইতে পরিষ্কার শোনা গেল ভূতোর চড়া গলার

চীৎকার—"বাহবা বিষ্ণুবাহন"। বিষ্ণুবাহন বেচারা এমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে সেখানে যাহা বলিবার তাহা বেমালুম ভুলিয়া "সেনাপতি! এই কি সে রত্নগিরিপুর" বলিয়া একেবারে চতুর্থ দৃশ্যের কথা আরম্ভ করিল। আমি কাণে কাণে বলিলাম "ওটা নয়," তাহাতে সে আরও ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার মুখে দরদর করিয়া ঘাম দেখা দিল, সে কয়েকবার ঢোক গিলিয়া, তারপর রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিল। রুমালটি আগে হইতেই কালিমাখা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার মুখখানার চেহারা এমন অপরূপ হইল, যে আমাদেরই হাসি চাপিয়া রাখা মুস্কিল হইল। ইহার উপর সে যখন ঐ চেহারা লইয়া, ভাঙা ভাঙা গলায় "কোথায় পালাবে তারা শৃগালের প্রায়" বলিয়া বিকট আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন ঘরশুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিবার জোগাড় করিল। বিষ্ণুবাহন বেচারা কিছুই জানে না, সে ভাবিল, শ্রোতাদের কোথাও একটাকিছু ঘটিয়াছে, তাই সকলে হাসিতেছে। সুতরাং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আরও উৎসাহে হাত পা ছুঁড়িয়া ভীষণরকম তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ষ্টেজের উপর ঘুরিতে লাগিল। ইহাতেও হাসি ক্রমাগতই

বাড়িতেছে দেখিয়া তাহার মনে কি যেন সন্দেহ হইল, সে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া দেখে আমরাও প্রাণপণে হাসিতেছি—এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসিতেছি! তখন রাগে একেবারে দিগ্বিদিক্ ভুলিয়া সে তাহার 'তলোয়ার' দিয়া বিশুর পিঠে সপাং করিয়া এক বাড়ি মারিল। বিশু চন্দ্রদ্বীপের মন্ত্রী, তাহার মার খাইবার কথাই নয়, সুতরাং সে ছাড়িবে কেন? সে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া বিষ্ণুবাহনের গালে দুই চড় বসাইয়া দিল। তখন সেই ষ্টেজের উপরেই সকলের সামনে দুজনের মধ্যে একটা ভয়ানক হুড়াহুড়ি কীলাকীলি বাধিয়া গেল। প্রথমে, প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল ওটা অভিনয়ের লড়াই; সুতরাং অনেকে খুব হাততালি দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল। কিন্তু বিষ্ণুবাহন যখন দস্তুরমত মার খাইয়া "দেখুন দেখি সার্, মিছিমিছি মার্ছে কেন" বলিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ জানাইতে লাগিল, তখন ব্যাপারখানা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

ইহার পর, সে দিন যে আর অভিনয় হইতেই পারে নাই, এ কথা আর বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই। ছুটি হইবার তিন দিন পরেই বিষ্ণুবাহন তাহার মামার বাড়ী চলিয়া গেল। ঐ তিন দিন সে বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই, কারণ তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা চেঁচায় "বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়"! ইস্কুলের গায়ে রাস্তার ধারে প্ল্যাকার্ড মারা "বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়"—এমন কি বিষ্ণুবাহনের বাড়ীর দরজায় খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা—

"বিষ্ণুবাহনের দিগ্বিজয়"।

বর্ম্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমীর আর সজারু, এই তিন বর্ম্মধারী জন্তুকে বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিন জনের বর্ম্ম তিন রকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা—তার মধ্যে মুখ হাত পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে, তখন দুর্গের মত বর্ম্মটাকেই দেখ্তে পাই,—বর্ম্মধারী যিনি, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমীরের বর্ম্মটা যথার্থই বর্ম্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম্ম কেবল বর্ম্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।
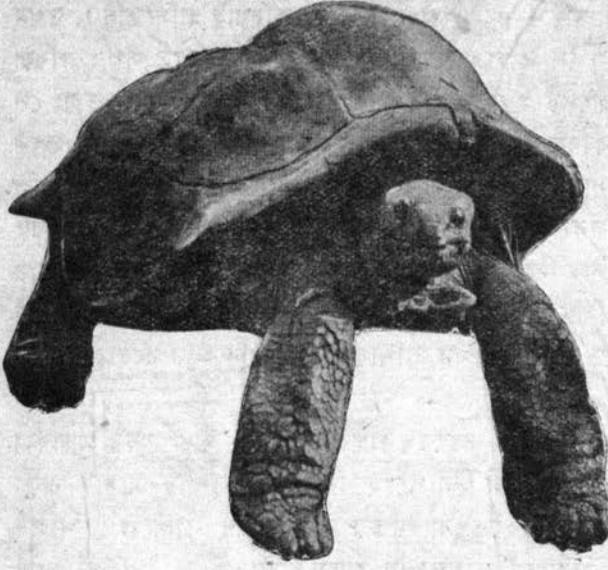
কচ্ছপ আর কুমীরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য্য বয়সের কথা অনেকেই জানে না। হাতীর বয়সের কথা শুন্‌তে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দুশ' আড়াইশ' বৎসর যে বাঁচে তাতে ত কোন সন্দেহই নাই, চার পাঁচশ' বৎসর পর্য্যন্ত তাদের বয়স হয়—একথা প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস ক'রে থাকেন। এই যে কচ্ছপটির ছবি দেওয়া হ'ল, এর বয়স প্রায় দুশ' বৎসর হবে। প্রায় সওয়াশ' বৎসর আগে যখন

একে ধ'রে লঙ্কাদ্বীপে আনা হয়, তখনই তার যথেষ্ট বয়স হ'য়েছিল, অথচ এখনও সে নিশ্চিন্তে চলে ফিরে বেড়ায়, মরবার নামও করে না! সাধারণত, বাজারে আমরা যে সব ছোট খাট কচ্ছপ দেখি, এটা সেরকম নয়—এদের বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক একটি তিন হাত সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত লম্বা হ'য়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের বংশ এমন ভাবে লোপ পেয়ে এসেছে, যে এখন দু একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এই রকম আরেকটি রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হ'য়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হ'লেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল তাতে আর সন্দেহ নাই—সুতরাং এখন তার দুশ' বৎসর পার হয়ে গেছে। লণ্ডনের চিড়িয়া-খানায় একটা থুড়্‌থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হ'ল মারা গিয়েছে—তার বয়স আরও অনেক বেশী হ'য়ে ছিল —কেউ কেউ বলেন ৪০০ বৎসরেরও বেশী। কুমীরও অনেক দিন বাঁচে,—বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হ'লে কে হারে কে জেতে সে কথা বলা শক্ত।

কুমীরের বর্ম্মটি কতকগুলা চামড়ার চাক্তি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা মোটা কড়া জমিয়ে বর্ম্মটি তৈরী হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়—মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে, তাকে শিঙের মত মজবুৎ ক'রে বর্ম্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হ'য়েছে। আর সজারুর বর্ম্মটি তৈরী হ'য়েছে তার লোম দিয়ে! লোমের গুচ্ছ মোটা আর মজবুত আর ধারালো হ'য়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।
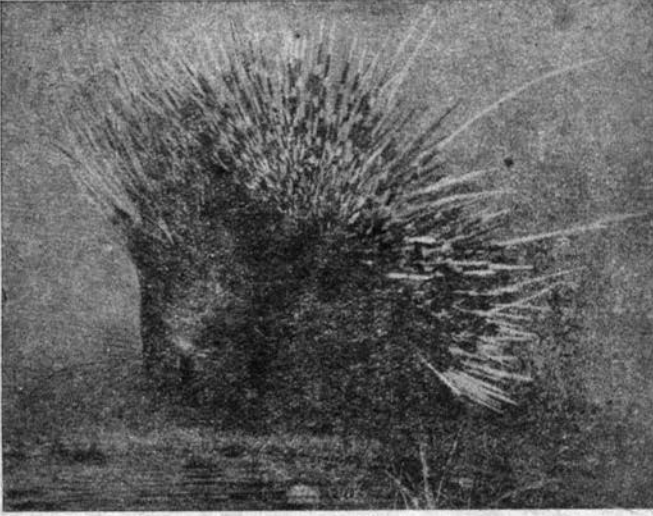
সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্তিরে বেরিয়ে ফলমূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্ত্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচিপাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সাজারুর যখন ছানা হয়, তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মত নরম, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হ'য়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়ুখড়ু ক'রে শব্দ হ'তে থাকে। কোন কোন সজারু খুব চট্‌পট্ গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোন কোনটার কাঁটা বড় বড় লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরও অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মত এমন কাঁটার বাহার আর কারও নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার একিড্‌না (echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু একটি কথা না বল্‌লে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্‌নাগুলি বেড়ালের চাইতে বড় হয় না, কিন্তু যেটির ছবি দেওয়া হ'ল সেটি হ'চ্ছে 'ধাড়ি একিড্‌না' বা Proechidna। এ গুলি আরও

অনেকখানি বড় হয়—বেশ একটি ছোট খাট ভাল্লুকের মত। অষ্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস (platypus) বা হংসচঞ্চুর মত এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিমপাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোট ছোট কাঁটায় ভরা—ছোট ছোট কিন্তু খুব শক্ত আর ধারাল। মুখখানা ওরকম অদ্ভুত ছুঁচাল হবার কারণ এই যে, এরা পিঁপ্‌ড়ে খোর। চোঙার মত মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নেই—আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু লম্বা জিভ—তাই দিয়ে সে লক্‌লক্‌ করে পিঁপ্‌ড়ে চেটে খায়! সজারুর মত এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপ্‌ড়েখোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মত কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম্ম নাই। যাদের গায়ে বর্ম্ম আছে, তাদের মধ্যে একটার ছবি দেওয়া গেল, তার নাম Pangolin (প্যাঙ্গোলিন)। এই জন্তুর বর্ম্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত—শিঙের মত মজবুত চাক্‌তি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতন সাজান। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত—তাই দিয়ে
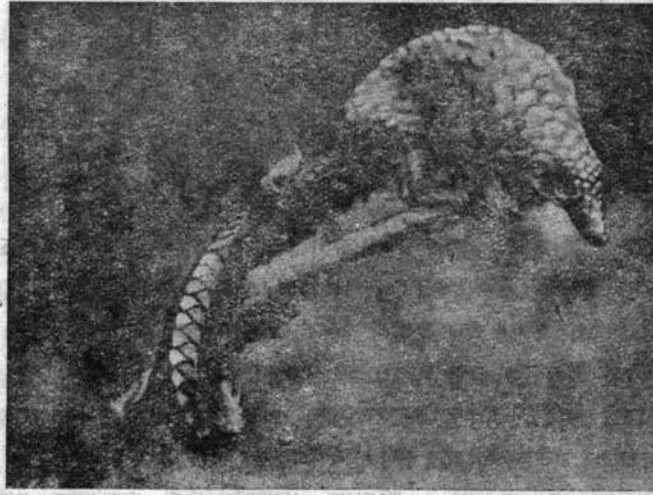
আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপ্ড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক ক'রে ফেলে। তারপর জিভ দিয়ে টপাটপ্ উই পিঁপ্ড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগ্‌বাজি খেয়ে ফুটবলের মত গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারাল আঁশগুলিতখন চারিদিকে খাড়া হ'য়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্‌মাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ। সে যখন হাত পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে, তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত পা, কিছুই বুঝবার যো থাকে না। তার বর্ম্মের গড়নটি মাছের আঁশের মত নয়—চিংড়িমাছের খোলার মত।

বর্ম্মধারী জীবের কথা বল্‌তে গেলে আরও অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হ'তে আরম্ভ ক'রে কাঁকড়া চিংড়ি বিছু এমন কি মাছ গিরগিটি পর্য্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কত রকম বর্ম্ম এঁটে ফেরে, তার আর সীমা সংখ্যা নাই। হাজার রকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায়, তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের কর্‌তে হয়। বাঁচবার উপায় তিন রকম। এক হ'চ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রে শস্ত্রে প্রবল হ'য়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা; আর এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলে কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা; আর তৃতীয়টি হ'চ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে মার ধর্ অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাক্‌তে পারে। বর্ম্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি?

হারকিউলিস

এত পরিশ্রম করিয়া সোণার ফল আনিয়াও হারকিউলিসের দাসত্ব ঘুচিল না। রাজা ইউরিস্‌থিয়ুস্ বলিলেন "আর একটি কাজ তোমায় করিতে হইবে—তুমি পাতালে গিয়া যমের কুকুর সারবেরাস্‌কে বাঁধিয়া আন"। হারকিউলিস্ পাতালে গিয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি কুকুরকে ধরিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করিলেন। তাহার তিন মাথায় তিনটি মুখ, সেই মুখ দিয়া বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে, নাকে চোখে আগুনের মত ধোঁয়া—তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে রাজার প্রাণ উড়িবার উপক্রম হইল—তিনি একটা জালার মধ্যে ঢুকিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ওটাকে শীঘ্র সরাইয়া লও"। হারকিউলিস তখন আবার যেখানকার কুকুর সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

এতদিনে হারকিউলিস তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলেন। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত ত্রিভুবন ঘুরিয়া আরও অদ্ভুত কাজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কত বড় বড় যুদ্ধে সাহায্য করিয়া, কত বীরত্বের কীর্ত্তিতে যোগ দিয়া তিনি আপনার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। পাহাড় উপড়াইয়া জিব্রাল্টার প্রণালীর পথ খুলিয়া তিনি সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া দিলেন। সুন্দরী আল্‌সেষ্টিস্ নিজের প্রাণ দিয়া স্বামীকে অমর করিতে চাহিয়াছিল, হারকিউলিস যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই আল্‌সেষ্টিস্‌কে মৃত্যুর গ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিলেন।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ইনিয়ুসের সুন্দরী কন্যা ডেয়ানীরাকে দেখিয়া হারকিউলিস তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কোথা হইতে এক জলদেবতা আসিয়া তাহাতে গোল বাধাইয়া বসিল। সে বলিল, "ঈনিয়ুস্ আমাকে কন্যাদান করিবেন বলিয়াছেন, তুমি কোথাকার কে, যে মাঝে হইতে দাবী বসাইতে আসিয়াছ"? তখন ডেয়ানীরার অনুমতি লইয়া হারকিউলিস জলদেবতার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সে এক অদ্ভুত দেবতা, আপন ইচ্ছামত চেহারা বদ্‌লায়। প্রথমেই হারকিউলিসের কাছে খুব খানিক চড় চাপড় খাইয়া, সে ষাঁড়ের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে গুঁতাইতে আসিল। হারকিউলিস তখন তাহার শিং ভাঙ্গিয়া দিতেই, সে পলাইয়া আবার আর এক মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর হারকিউলিস তাহাকে এমন কাবু করিয়া ফেলিলেন যে প্রাণের দায়ে সে দেশ ছাড়িয়া চম্পট দিল।

তারপর হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহারা সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। কত রাজ্য কত দেশ ঘুরিয়া একদিন তাঁহারা এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতে ভয়ানক স্রোত দেখিয়া হারকিউলিস ডেয়ানীরাকে পার করিবার উপায় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নেসাস্ নামে এক বুড়া সেণ্টর্ (মানুষ-ঘোড়া) আসিয়া বলিল, "আমি এই মেয়েটিকে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিব"। ডেয়ানীরা সেণ্টরের পিঠে চড়িয়া নদী পার হইলেন, হারকিউলিসও এক হাতে তাঁহার তীর ধনুক জল হইতে উঠাইয়া আর এক হাতে ঢেউ ঠেলিয়া পার হইতে লাগিলেন। নদীর ওপারে গিয়া হতভাগা নেসাস্ ভাবিল, "আহা! এমন সুন্দরী মেয়ে কেন এই মানুষটার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার চাইতে ইহাকে লইয়া আমাদের দেশে পলাইয়া যাই না"? এই ভাবিয়া সে ডেয়ানীরাকে লইয়া এক ছুট্ দিল। ডেয়ানীরার চীৎকারে হারকিউলিস মাথা তুলিয়া চাহিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর হইতেই তীর ছুঁড়িয়া

নেসাসের মর্ম্মভেদ করিয়া ফেলিলেন। মরিবার সময় দুষ্ট সেণ্টর অত্যন্ত ভাল মানুষের মত অনেক অনুতাপ করিয়া ডেয়ানীরাকে বলিয়া গেল, "আমার ঘাড়ের উপর হইতে এই জামাটি খুলিয়া তুমি রাখিয়া দাও। যদি তোমার স্বামীর ভালবাসা কোন দিন কমিতে দেখ, তবে এই জামা তাহাকে পরাইলেই তাহার সমস্ত ভালবাসা আবার ফিরিয়া আসিবে"। ডেয়ানীরা তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া জামাটি পরম যত্নে লুকাইয়া রাখিলেন। ততক্ষণে হারকিউলিসও নদী পার হইয়া আসিয়াছেন, দুজনে আবার চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন কি একটা কাজের জন্য দূর দেশের এক রাজসভায় হারকিউলিসের যাওয়া দরকার হইল। তিনি ডেয়ানীরাকে রাখিয়া সেই যে বাহির হইলেন, তারপর কত দিন গেল, কত মাস গেল, হারকিউলিস আর ফেরেন না। ডেয়ানীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ভাবিতে লাগিলেন "তবে কি হারকিউলিস আমায় ভুলিয়া গেলেন? আর কি তিনি আমায় ভালবাসেন না"? তিনি দূত পাঠাইলেন, তাহারা আসিয়া বলিল, "হারকিউলিস বেশ ভালই আছেন—রাজসভায় নানা আমোদ প্রমোদে তাঁহার দিন কাটিতেছে"। শুনিয়া ডেয়ানীরা সেই সেণ্টরের দেওয়া জামাটি বাহির করিলেন। সোণার মত ঝক্‌ঝকে জামা, সেণ্টরের মৃত্যু সময়ে রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। সেই জামা তিনি লাইকাস্ নামে এক দূতকে দিয়া হারকিউলিসের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—ভাবিলেন, তাহা হইলে হারকিউলিসকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। জামার কাহিনী ত হারকিউলিস জানেন না, সেণ্টরের রক্তে যে তাহা বিষাক্ত হইয়া আছে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে জাগিল না, তিনি নিশ্চিন্তমনে সেই জামা পরিলেন। জামা পরিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, তাঁহার শিরায় শিরায় যেন আগুনের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি জামা ছাড়াইতে গিয়া দেখেন সে সর্ব্বনেশে জামা তাঁহার শরীরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে; গায়ের চামড়া উঠিয়া আসে, তবু জামা ছাড়িতে চায় না। রাগে ও যন্ত্রণায় পাগল হইয়া তিনি দূতকে ধরিয়া সমুদ্রে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, তারপর সেণ্টরের বিষ এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া তিনি তাঁহার অনুচরদের ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা শীঘ্র কাঠ আন, আগুন জ্বাল, আমি এখন মরিতে ইচ্ছা করি"। শুনিয়া সকলে কাঁদিতে লাগিল, কেহ চিতা জ্বালাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন তিনি আপন হাতে গাছ উপড়াইয়া প্রকাণ্ড চিতা বানাইয়া তাহাতে শুইলেন এবং তাঁহার এক বন্ধুকে

বলিলেন "যদি তুমি আমার বন্ধু হও, তবে আমার কথা শুনিয়া, এই চিতায় আগুন দাও। বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ আমার বিষমাখান অব্যর্থ তীরগুলি তোমায় দিলাম"।

তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হইল, দেবতারা জয়গান করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অমর করিয়া আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

কয়লার কথা

আমি এক টুকরো কয়লা। রাস্তার ধারে পড়ে আছি, কেউ আমায় খবর নেয় না। একটি ছোট্ট ছেলে তার মা'র সঙ্গে যেতে যেতে খপ্ ক'রে আমায় কুড়িয়ে নিল। দেখে মা বল্লেন "আরে, ছি ছি—নোংরা! ওটা ফেলে দাও।" ছেলেটা অমনি আমায় তাচ্ছিল্য করে ফেলে গেল। দেখে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। হায় রে! আমার যদি কথা কইবার শক্তি থাক্‌ত, একবার আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতাম।

কি শোনাতাম? কেন, আমার বয়সের কথা, আমার বংশের কথা, আমার গুণের কথা। সে কথা এখন কি আর তোমরা বিশ্বাস করবে?

হাজার হাজার বছর আগে; যখন তোমরা কেউ ছিলে না, তোমাদের মত দু'পেয়ে জন্তুরা যখন পৃথিবীর উপর সর্দ্দারী কর্‌তে শেখেনি, আমি তখন ছিলাম ভীষণ বড় জঙ্গলের প্রকাণ্ড গাছের মধ্যে। তোমরা যাকে বল 'বনস্পতি' আমি ছিলাম সেই রকম ঝাঁকালো গাছের জ্যান্ত ডাল। কত যুগের পর যুগ আমরা সেখানে ছায়া দিয়েছি, কত অদ্ভুত পাখী আমার উপর ব'সে বিশ্রাম করেছে, কত বিদ্‌ঘুটে জন্তু সেই গাছের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু অমন যে বিরাট জঙ্গল সেও কি চিরকাল টিঁক্‌তে পারে? এমন দিন এল, যখন সে জঙ্গলের আর চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে ছাই ভস্ম ধূলা বালির চাপের নীচে ভিজামাটি আর বৃষ্টির জলে মরা কাঠ পচ্‌তে লাগ্‌ল। কত পথহারান নদীর স্রোত কত কাদামাটি জঞ্জাল এনে তার উপরে ফেলে গেল; কত ভূমিকম্পে কত আগুনের উৎপাতে সেই জমী কতবার ধসে পড়ুল, কতবার ফেঁপে উঠল; কত পাহাড়গলা পাথর এসে কত নূতন জমী তৈরী হ'ল, তার উপরে নতুন মাঠ নতুন বন, নতুন প্রাণীর খেলা চল্‌ল। আমরা যুগ যুগ ধ'রে তারই তলায় পচ্‌তে পচ্‌তে

চাপে আর গরমে পাথর হ'য়ে জ'মে উঠ্‌লাম। এমনি যে কত হাজার বছর ছিলাম তার কি আর হিসাব রেখেছি? সেখানে মাটির নীচে কবরের মধ্যে বাইরের কোন খবর পৌঁছায় না—বাইরের কেউ তার খবর জানে না।

তারপর একদিন শুনলাম কিসের শব্দ—কে যেন কি ঠুক্‌ছে। দিনের পর দিন রোজই ঠুক্‌ছে—খটাখট্‌ ঠকাঠক্‌ খটাং খটাং। ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে সেই একই শব্দ। শব্দ কাছে আস্‌তে আস্‌তে একদিন একেবারে আমারই সামনে এসে পড়ল—দেখলাম তোমাদেরই মত কতগুলো অদ্ভুত দুপেয়ে জন্তু আমাদের সব ঠুকে ঠুকে কেটে নিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে—এখন থেকে চিরটাকাল বুঝি এম্নি ভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। আমাদের নেবার জন্যই এরা খেটে খুটে রাস্তা কেটে নেমে এসেছে।

তারপর বাইরে এসে দেখ্‌লাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই। সে সব গাছপালা নাই, সে সব জীব জন্তু নাই—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দুপেয়ে জন্তুর আশ্চর্য্য সব কাণ্ডকারখানা। তুমি ছোক্‌রা, বড় যে আমায় তাচ্ছিল্য ক'রে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতির কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিয়ে তোমার ঘরের আগুন জ্বলে, আমার গুণেই রেল চলে ষ্টীমার চলে কলকারখানা সবই চলে। এই যে কল্‌কাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি, বলি, এ গ্যাস আসে কোথা হ'তে? কয়লা চুঁয়ে জ্বালানি গ্যাস্‌ হয়—আর হয় এমোনিয়া আর তেল-কয়লা—যাকে তোমরা বল Coaltar.

শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয় প্রতি বছর কত হাজার মণ গাছের সার তৈরী হয়, তোমরা কি তার খবর রাখ? তারপর ঐ যে আল্‌কাৎরার মত চট্‌চটে কালো নোংরা জিনিষ, যাকে তেলকয়লা বল্‌লাম—তা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য্য জিনিষ বানিয়েছেন, তাদের নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হ'য়ে যায়! কত আশ্চর্য্য সুন্দর রং,—ছবির রং, কাপড়ের রং, কালীর রং; কত নতুন নতুন সুগন্ধ—এসেন্সে ফুলের গন্ধ, সিরাপে ফলের গন্ধ; কত ডাক্তারি ওষুধপত্র—পোকা মারবার রোগের বীজ মারবার কত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; কত নূতন নূতন যুদ্ধসামগ্রী, কত বোমার মশলা, কত বারুদের মশলা; আর ছোট বড় কত যে নকল জিনিষ তার আর অন্তই নাই। এ সবই সম্ভব হ'চ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমরা ত আমায় খাতির করবে না—কারণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো রাস্তার কয়লা।

অসম্ভব নয়!

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেম্নি ঢ্যাটা।
ডাইনে বল্‌লে যায় সে বামে
তিনপা যেতে দুবার থামে।
চল্‌তে চল্‌তে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে এম্নি তরো
সাহেব বল্লে "সবুর করো—
মামদো বাজি আমার কাছে?
এ রোগেরও ওষুধ আছে।"

এই না ব'লে ভীষণ ক্ষেপে,
গাধার পিঠে বস্‌ল চেপে
মূলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।
—আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে?
মূলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' ব'লে
ততই মূলো এগিয়ে চলে
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মূলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মূলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। কালী ও কাগজ। ২। দিয়াশালাই।

পঞ্চম বর্ষ চৈত্র, ১৩২৪ দ্বাদশ সংখ্যা

স্বদেশ

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশে সকাল হলে, পূবের দুয়ার খুলে
হাসি মুখে রাঙা রবি করে ডাকাডাকি ;
তা'র সে স্নেহের ডাকে, সবে জাগে একে একে,
নরনারী পশু পাখী,—কেহ নহে বাকি।
সেই দেশে থাকি।

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশে সবার আগে, নিত্য নব অনুরাগে
কলকণ্ঠে কত গান গায় কত পাখী।
কোকিলের কুহু স্বরে, স্বর্গের সঙ্গীত ঝরে
দয়েল ঝঙ্কার করে মুদি যুগ আঁখি।
সেই দেশে থাকি।

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশে—সোণার দেশে, চাঁদ হাসে, রবি হাসে
গোধুলি বালিকা হাসে শ্যাম ছটা মাখি ;
সোণালী ঘোমটা খুলে, উষা হাসে মুখ তুলে
ফুল হাসে দুলে দুলে, হাসে পশুপাখী।
সেই দেশে থাকি।

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশে ধানের ক্ষেতে, কৃষকের আঙিনাতে
লক্ষ্মীর আঁচল খানি করে ঝিকি মিকি ;
ধেনু-চরা গোঠে মাঠে, বেনু-বাজা ঘাটে বাটে
যাহার শ্যামল কোলে সুখে মাথা রাখি,
সেই দেশে থাকি।

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশেতে ভাই ভাই, এক ঠাঁই এক ঠাঁই
ভেদাভেদ নাই নাই, নাই রোখারোখি ;
নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ, নাহি কলুষতা লেশ
আছে শুধু ভাই বোনে স্নেহে মাখামাখি।
সেই দেশে থাকি।

কোন্ দেশে থাকি ?
যে দেশ মায়ের মত, দিবা নিশি অবিরত
রাখে সবে সযতনে, স্নেহ-বক্ষে ঢাকি ;
যাঁহার আঁচল বায়, দুখ, তাপ দূরে যায়
প্রবাসী পরাণ পা'য় পদধূলি মাখি'।
সেই দেশে থাকি।

———

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জড়ভরত

পূর্ব্বকালে শালগ্রাম নগরে ভরত নামে এক পরম হরিভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি মহানদীর তীরে আশ্রম বানাইয়া একমনে হরির পূজা করিতেন। একদিন এক হরিণী তাঁহার আশ্রমের কাছে জলপান করিতে করিতে হঠাৎ বনের মধ্যে সিংহগর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে লাফাইতে গিয়া নদীর উঁচু পাড় হইতে পড়িয়া গেল। ভরত দেখিলেন, হরিণটি মাটিতে পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল, এবং তাহার ছানাটি নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল।

দয়ালু ভরত তখন অসহায় হরিণশিশুকে জল হইতে উঠাইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিলেন। রাজার যত্নে হরিণ শিশু দিন দিন বড় হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার উপর রাজার এমন মায়া জন্মিয়া গেল, যে সাধন ভজন পূজা আচারের উপর আর তাঁহার মনই রহিল না, তিনি হরিণের চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন। বনে চরিতে চরিতে যদি কোন দিন তাহার বাড়ী ফিরিতে কিছুমাত্র দেরী হইত, তবেই ভরতের ভাবনার আর সীমা থাকিত না। তিনি ভাবিতেন, "হায় হায়! বাছাকে বুঝি বাঘে কিংবা সিংহে খাইয়া ফেলিয়াছে।" আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য ছাড়িয়া তিনি যে সাধনার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহার সবই নষ্ট হইয়া গেল। তারপর কালক্রমে পুত্রতুল্য এই হরিণটিকে দেখিতে দেখিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর সময়েও তিনি যে কেবল হরিণের চিন্তাই করিয়াছিলেন সেজন্য কালঞ্জর পর্ব্বতে পুনরায় তিনি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। এবং সেজন্য মাতা পিতাকে ছাড়িয়া তিনি সেই শালগ্রামেই ফিরিয়া আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মের আশ্রমের কাছেই বাস করেন।

ইহার পর তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম লইলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণেরা যাহা করে, সে সকল কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হইল না; বেদ শাস্ত্র পুরাণ কিছুই তিনি পড়িতেন না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট উত্তর দিতেন এবং তাহা কেহই বুঝিত না। অতি সামান্য যে দুই একটি কথা বলিতেন তাহাতেও আবার ভাষা ও ব্যাকরণের ভুল থাকিত! মোট কথা, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও তিনি অব্রাহ্মণের মত

হইলেন। তাহার উপর আবার কাপড় চোপড় ময়লা, সমস্ত শরীর অযত্নে নোংরা ও কাদামাখা হইয়া থাকিত। এরূপ অবস্থায় গ্রামের লোকেরা যে তাঁহাকে দেখিলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ আর অপমান করিত সেটা আর বিচিত্র কি? তাঁহাকে দেখিলে সকলে পাগল বলিয়া মনে করিত।

ক্রমে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে অতি সামান্য রকম খাদ্য দিয়া তাঁহা দ্বারা চাষবাসের কাজ করাইতে লাগিল। তিনিও, যেন মানুষ নন—পশু, এরূপ ভাবেই বিনা আপত্তিতে সব কাজ করিতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে সেই গ্রামের সকলের যখন যে কাজ পড়িত, শুধু তাঁহাকে দুইমুঠা খাইতে দিয়া সেই কাজ করাইয়া লইত।

একদিন সৌবীররাজ পাল্কী চড়িয়া কপিল মুনির আশ্রমে যাইতে চাহিলেন। "দুঃখপূর্ণ সংসারে মানুষ কি ভাবে জীবন কাটাইবে" ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই রাজা মহর্ষি কপিলের নিকট যাইতেছিলেন। রাজার লোকেরা অন্য পাল্কী বেহারাদের সহিত

এই ব্রাহ্মণরূপী ভরতকেও ধরিয়া আনিয়াছিল। পূর্ববজন্মের কথা সবই তাঁহার মনে

ছিল তাই পাপের ক্ষয়ের জন্য তিনি পাল্কী বহিতে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। পাল্কী কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণ একটু ধীরে ধীরে চলিলেন। কিন্তু অন্য বাহকগণ দ্রুত চলিতেছে, সেজন্য পাল্কীতে কেমন একটা ঝাঁকানির মত উঠিয়া গেল। রাজা সৌবীর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ, তোরা সকলে সমানভাবে চল্ না, বড় ঝাঁকানি লাগিতেছে যে।"

রাজার কথা শুনিয়া অন্য বাহকগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল—"মহারাজ! এই ব্যক্তি অলসভাবে চলিতেছে বলিয়াই পাল্কীতে এরূপ ঝাঁকানি লাগিতেছে।" তখন রাজা সৌবীর ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ত অল্প পথই শিবিকা বহন করিয়াছ, তবে এত শীঘ্র ক্লান্ত হইলে কেন? তোমাকে ত বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি, তবে পরিশ্রম করিতে পার না কেন?" ব্রাহ্মণ বলিল—"মহারাজ! আমি তোমার পাল্কীও বহন করিতেছি না, আমি ক্লান্তও হই নাই আর আমি হৃষ্ট পুষ্টও নই।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"সে কি! আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি তুমি দিব্য স্থূলকায় আর পাল্কী এখনও তোমার কাঁধেই রহিয়াছে, তবু তুমি এরূপ অসম্ভব কথা বলিতেছ কেন?"

তখন ব্রাহ্মণ বলিল—"মহারাজ! আমি শিবিকা বহন করিতেছি, একথা মিথ্যা। এই যাহা দেখিতেছেন, তাহা আমার শরীর মাত্র; আমার পা দুটি মাটির উপর দাঁড়াইয়াছে—পায়ের উপরে যথাক্রমে পেট, বুক, হাত ও কাঁধ রহিয়াছে আর সেই কাঁধের উপর পাল্কী; তবে আমি পাল্কী বহন করিতেছি—একথা কি মিথ্যা হইল না? পঞ্চভূতের শরীর; তুমি, আমি ও অন্য সমস্ত জীবকেই পঞ্চভূতে বহন করিতেছে। গাছ, পালা, বাড়ী, ঘর, পাহাড় পর্ব্বত সমস্তই পঞ্চভূতের ব্যাপার! সুতরাং যদি বল, আমার উপর পাল্কীর ভার রহিয়াছে—তবে একথাও বলিতে পার যে অন্য সমস্ত প্রাণিগণের উপরও, শুধু শিবিকা কেন, সমস্ত পৃথিবীর ভারটাই চাপান রহিয়াছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নীরব হইল। তখন রাজা সৌবীর পাল্কী হইতে নামিয়া সেই ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া বলিলেন—"হে ব্রহ্মণ্! আপনি যে ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ভুল নাই। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। 'দুঃখ পূর্ণ সংসারে মানুষের কর্ত্তব্য কি' ইহা জানিবার জন্যই আমি শিবিকায় কপিল মুনির আশ্রমে যাইতেছিলাম। এখন আর সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনিই দয়া করিয়া আমাকে উপদেশ দিন্।"

তখন সেই ব্রাহ্মণ রাজার নিকট তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া আসিল, তাঁহার দিব্য-জ্ঞান জাগিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল জড়তা দূর করিয়া তিনি সকলে সম্মুখেই দিব্যমুক্তি লাভ করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

লোহজঙ্ঘের উপাখ্যান

(কথা সরিৎসাগর)

মথুরানগরে মকরদংষ্ট্রা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী ছিল, তাহার মত রাগী, ক্ষুদ্রমনা ও মুখরা স্ত্রীলোক সে সময়ে আর কেহ ছিল না। নগরের সমস্ত লোক তাহার ভয়ে জড়সড় হইত; এমন কি রাজা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলেই দূরে সরিয়া পড়িতেন। বৃদ্ধার পরমসুন্দরী এক কন্যা ছিল, তার নাম রূপিণিকা। সেই নগরের লোহজঙ্ঘ নামে নিতান্ত দরিদ্র কিন্তু বুদ্ধিমান ও রূপবান এক ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিয়া রূপিণিকার পছন্দ হওয়াতে সে তাহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই বৃদ্ধা প্রতিদিন লোহজঙ্ঘকে, সে গরীব বলিয়া, এমনই জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল যে ব্রাহ্মণ যুবক একদিন স্থির করিল, বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

যেমন কথা তেমনই কাজ! একদিন লোহজঙ্ঘ গোপনে পলায়ন করিল। স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়া পথে চলিতে চলিতে ভাবিল—"রূপিণিকাকেই যখন ছাড়িলাম তখন আর কি, কোন তীর্থে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রের তেজ যেন আগুনকেও ছাড়াইয়াছে! এই দারুণ গরমে লোহজঙ্ঘ আর কিছুতেই চলিতে পারিতেছে না। শাশুড়ীর প্রতি রাগ আর সূর্য্যের তেজ—এই দুই তাপে তাহার শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল। পথে একটি গাছও নাই যে ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া ঠাণ্ডা হইবে। এইরূপ অবস্থায় চলিতে চলিতে ক্রমে সে গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল—একটা মরা হাতী পড়িয়া রহিয়াছে। হাতীর পেট ফুটা করিয়া জন্তুতে ভিতরের সমস্ত মাংস খাইয়াছে, বাকি রহিয়াছে কঙ্কালের চারিদিকে জড়ান শুধু চামড়াখানি।

ইহা দেখিয়া হঠাৎ লোহজঙ্ঘের খেয়াল হইল—"আশ্রয়টি মিলিয়াছে মন্দ না! এই ফুটা দিয়া ভিতরে গিয়া বসি না কেন? ছায়াতে বেশ আরামে বিশ্রাম করিব।" এই

ভাবিয়া সে তখনই সেই ফুটা দিয়া হাতীর পেটের মধ্যে ঢুকিল। ভিতরে কি ঠাণ্ডা, কি আরাম! পরিশ্রান্ত লোহজঙ্ঘ ক্রমে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ আকাশে মেঘ করিয়া দেখিতে দেখিতে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির জলে হাতীর চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া গিয়া সেই ফুটা দিল বন্ধ করিয়া! তখন হঠাৎ গঙ্গায় বাণ ডাকিয়া এমনই জল বাড়িয়া গেল যে, চক্ষের নিমেষে মরা হাতীটাকে ভাসাইয়া একেবারে মাঝ গঙ্গায় লইয়া গেল। সেখানে স্রোতের ভীষণ বেগ, সেই বেগে ভাসিতে ভাসিতে মৃত হাতী ক্রমে সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত! এই সময়ে গরুড় জাতীয় মহা ভয়ঙ্কর এক পক্ষী আহারের জন্য সেটাকে ছোঁ মারিয়া সমুদ্রের পর পারে লইয়া গেল। তারপর ঠোঁট ও নখ দিয়া খানিকটা চামড়া ফুটা করিয়া দেখিল—কি সর্ব্বনাশ! ভিতরে একটা মানুষ! তখন সে ভয়ে পলায়ন না করিয়া আর কি করে?

এদিকে নিদ্রিত লোহজঙ্ঘ পাখীর আঁচড়ের শব্দে জাগিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া যখন দেখিল সে সমুদ্রের পর পারে চলিয়া আসিয়াছে তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না—ভাবিল, একি স্বপ্ন দেখিতেছি? এমন সময় হঠাৎ সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, একটু দূরে দুইটা ভীষণ রাক্ষস তাহার দিকে তাকাইয়া যেন পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে—তাহাদের মুখে ভয়ের চিহ্ন! রাক্ষসদিগের ভয় হইবার ত কথাই! কারণ লোহজঙ্ঘকে দেখিয়াই তাহাদিগের রামচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। রামও মানুষ, সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসদিগকে জয় করিয়াছিলেন। লোহজঙ্ঘকেও দেখিল মানুষ, সেও সমুদ্র পার হইয়াছে! তাহারা তখনই তাহাদিগের রাজা বিভীষণের নিকট গিয়া এই সংবাদ দিল। ইহা শুনিয়া বিভীষণ একটু ভয় পাইয়া বলিলেন—"যাও, শীঘ্র গিয়া তাহাকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রাসাদে লইয়া আইস।"

রাক্ষস দুটির সঙ্গে লঙ্কায় গিয়া লোহজঙ্ঘ দেখিল—কি সুন্দর নগর, বুঝিবা অমরাবতীও ইহার নিকট লজ্জা পায়! তারপর পুরীর ভিতরে গিয়া একেবারে তাহার চক্ষুস্থির—কি শোভা, কি সৌন্দর্য্য, কি চাক্‌চিক্য, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়! রাজা বিভীষণ মহা ব্যস্ততার সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! তুমি কে, এখানে কি করিয়া আসিলে?" চতুর লোহজঙ্ঘ বলিল—"আমার নাম লোহজঙ্ঘ, মথুরায় বাড়ী। আমি বড় গরীব, হরির পূজা করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটে। একদিন পেটের জ্বালায় নারায়ণের মন্দিরে হত্যা দিলাম। শেষে হরি আমাকে স্বপ্নে বলিলেন—'বৎস! তুমি লঙ্কায় যাও; সেখানে আমার পরমভক্ত বিভীষণ আছেন, তিনি

তোমাকে ধন দৌলত দিয়া সুখী করিবেন।' এই আদেশ শুনিয়া বহুকষ্টে আমি এখানে আসিয়াছি।"

ইহা শুনিয়া বিভীষণ ভাবিলেন—"নিশ্চয় এ ব্যক্তি কোন মহাপুরুষ হইবেন"। তখন তিনি বলিলেন—"ঠাকুর ! এখানে সুখে বাস কর—ধনের অভাব কি ?" লোহজঙ্ঘ পরম যত্নে কিছুকাল লঙ্কায় বাস করিল। লঙ্কার নিকটেই স্বর্ণমূল পর্ব্বত ছিল, সেখানে গরুড় পক্ষীর বংশধরেরা থাকে। বিভীষণ সেখানে লোক পাঠাইলেন, লোহজঙ্ঘের জন্য একটি বলবান্ পক্ষী আনিবে, বাড়ী ফিরিবার সময় সেই পক্ষী হইবে তাহার 'বাহন'। পক্ষী আনা হইলে বিভীষণ বলিলেন—"ঠাকুর ! প্রতিদিন ইহাতে চড়িয়া অভ্যাস করিয়া লও, দেশে ফিরিবার সময় এটিই তোমার বাহন হইবে।" তখন হইতে লোহজঙ্ঘ প্রত্যহ পক্ষীর পিঠে চড়িয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—এইরূপে সে পরম সুখে লঙ্কায় বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে মথুরায় ফিরিবার জন্য লোহজঙ্ঘ বিভীষণের নিকটে বিদায় লইল। যাত্রাকালে বিভীষণ তাহাকে কত যে মূল্যবান্ মণি মুক্তা দিলেন তাহার সীমা নাই। আর সোণার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিয়া বলিয়া দিলেন—"মথুরায় যে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে তাঁহার জন্য এই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দিলাম—এগুলি ঠাকুরকে দিও।" তখন লোহজঙ্ঘ সেই পক্ষীর পিঠে চড়িয়া চক্ষের নিমেষে মথুরায় আসিয়া সহরের বাহিরে একটি জনশূন্য আশ্রমে বাসা লইল। তারপর বাজারে একটি মূল্যবান্ পাথর বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা আহার সামগ্রী পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিছুই কিনিতে বাকি রাখিল না। ইহার পর রাত্রে কৃষ্ণের মত বেশ করিয়া সেই পাখীতে চড়িল আর রূপিণিকার বাড়ীর উপরে শূন্যে থাকিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য মৃদুগম্ভীর শব্দ করিতে লাগিল।

ঘরে রূপিণিকা ছিল একাকী ; সে শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—যেন মূর্ত্তিমান নারায়ণ শূন্যে ঘুরিতেছেন। তখন তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণরূপী লোহজঙ্ঘ বলিল—"আমি তোমাকে দেখা দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" একথায় রূপিণিকা নতমস্তকে প্রণাম করিয়া বলিল—"ঠাকুর ! অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করুন।" তখন লোহজঙ্ঘ রূপিণিকার গৃহে নামিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

প্রাতঃকালে রূপিণিকা ভাবিল—"আমি সাক্ষাৎ নারায়ণকে পাইয়াছি, সুতরাং মানুষের সঙ্গে আর কথা বলিব না।" এই ভাবিয়া সে মৌন হইয়া রহিল। তাহার মা আসিয়া

কত কিছু জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তবু কন্যা কথা বলিতেছে না দেখিয়া সে একেবারে অবাক্! যাহা হউক অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে রূপিণিকা মায়ের নিকট রাত্রের ঘটনা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। সে কন্যাকে বলিল—"মা! দেবতার অনুগ্রহে তুমি মানুষ হইয়াও দেবতা হইয়াছ। আমি তোমার মা, সুতরাং আমার একটি অনুরোধ রাখ। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন যাহাতে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, তোমার দেবতাকে বলিয়া কহিয়া তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও।" রূপিণিকা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

তারপর রাত্রে পুনরায় বিষ্ণুরূপী লোহজঙ্ঘ আসিলে রূপিণিকা তাহাকে মায়ের অনুরোধ জানাইল। সে বলিল—"তোমার মা ভয়ানক দুষ্ট স্ত্রীলোক, তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে স্বর্গে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তবে এক উপায় আছে—প্রতি একাদশী দিন প্রাতে স্বর্গের দরজা খোলা হয়, তখন শিবের গণেরা সর্ব্বপ্রথম ভিতরে প্রবেশ করে। তোমার মা যদি ঠিক শিবের গণের মত সাজিতে পারে তবে তাহাদিগের সঙ্গে তাহাকেও প্রবেশ করাইতে পারি। সুতরাং তোমার মাকে গণ সাজিতে হইবে—তাহার মাথা নেড়া করিয়া পাঁচটি শিখা রাখ, তারপর শরীরের অর্দ্ধেকটায় কাল এবং অর্দ্ধেকটায় যদি লাল রং মাখাও তবেই গণরূপে তাহাকে লইয়া যাইতে কোন মুস্কিল হইবে না।" এইরূপ উপদেশ দিয়া লোহজঙ্ঘ প্রস্থান করিল।

এদিকে প্রাতঃকালে কন্যার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কোন আপত্তি করিল না। তখন রূপিণিকা তাহাকে ঠাকুরের উপদেশ মত সাজাইলে পর ব্রাহ্মণী স্বর্গে যাইবার আশায় উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রে যথাসময়ে লোহজঙ্ঘ আসিয়া তাহাকে পাখীর উপর তুলিয়া প্রস্থান করিল। শূন্য পথে চলিতে চলিতে সে দেখিল, এক মন্দিরের সম্মুখে উঁচু একটা স্তম্ভ রহিয়াছে তাহার মাথায় একটা চক্র। তখন বৃদ্ধাকে সেই স্তম্ভের উপর নামাইয়া দিয়া সে বলিল—"এখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি কয়েক জন ভক্তকে দেখা দিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া লোহজঙ্ঘ সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। মন্দিরের সম্মুখে একদল যাত্রী রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে লোহজঙ্ঘ বলিল—"যাত্রীদল! সাবধান! আজই এখানে মড়কদেবীর আগমন হইবে—এই বেলা তোমরা হরির শরণ লও।" এই কথা শুনিবামাত্র যাত্রীর দলে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমে সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিল! মড়কের নাম
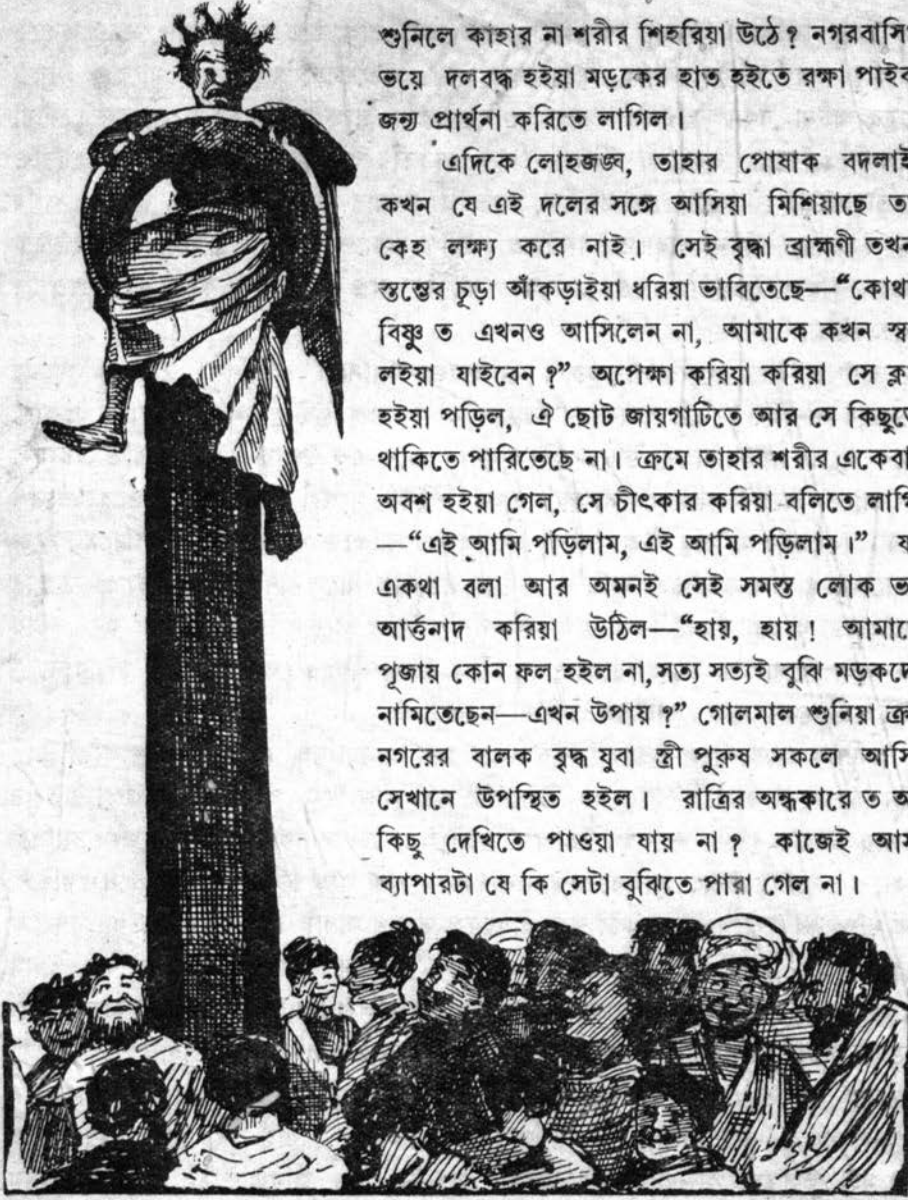
শুনিলে কাহার না শরীর শিহরিয়া উঠে? নগরবাসিগণ ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া মড়কের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এদিকে লোহজঙ্ঘ, তাহার পোষাক বদলাইয়া কখন যে এই দলের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তখনও স্তম্ভের চূড়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভাবিতেছে—"কোথায়, বিষ্ণু ত এখনও আসিলেন না, আমাকে কখন স্বর্গে লইয়া যাইবেন?" অপেক্ষা করিয়া করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, ঐ ছোট জায়গাটিতে আর সে কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার শরীর একেবারে অবশ হইয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল —"এই আমি পড়িলাম, এই আমি পড়িলাম।" যাই একথা বলা আর অমনই সেই সমস্ত লোক ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"হায়, হায়! আমাদের পূজায় কোন ফল হইল না, সত্য সত্যই বুঝি মড়কদেবী নামিতেছেন—এখন উপায়?" গোলমাল শুনিয়া ক্রমে নগরের বালক বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। রাত্রির অন্ধকারে ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না? কাজেই আসল ব্যাপারটা যে কি সেটা বুঝিতে পারা গেল না।

ক্রমে প্রভাতের আলো দেখা দিল, তখন সকলে দেখিল স্তম্ভের মাথায় অতি অদ্ভুত চেহারার এক বুড়ী বসিয়া রহিয়াছে। তারপর বুড়ীকে যখন সকলে চিনিতে পারিল। তখন সেখানে যা হাসির ধূম্! কেথায় বা গেল ভয় কোথায় বা গেল ভাবনা—মথুরাবাসী সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি! দেখিতে দেখিতে স্বয়ং রাজাও সেখানে আসিলেন আর তিনিও যে হাসি রাখিতে পারিলেন না, সেটা বুঝিতেই পার। ক্রমে রূপিণিকাও আসিয়া মায়ের এই দুরবস্থা দেখিল, আর তাহার লজ্জার সীমা রহিল না। যাহা হউক রূপিণিকার অনুরোধে বৃদ্ধাকে স্তম্ভের উপর হইতে নামান হইল। ব্রাহ্মণীর উপর মথুরাবাসী সকলেই বিরক্ত, সুতরাং তাহার দুরবস্থায় সকলে সন্তুষ্ট ভিন্ন দুঃখিত হইল না। এমন কি রাজা মহাশয়ও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"যে এরূপ চালাকি করিয়া বুড়ীকে সাজা দিয়াছে সে সত্যই বাহাদুর—তাহাকে আমি পুরস্কার দিব।"

তখন জনতার ভিতর হইতে লোহজঙ্ঘ আসিয়া রাজাকে নিজের পরিচয় দিয়া আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া লোহজঙ্ঘের প্রশংসা আর সকলের মুখে ধরে না! রাজা তাহাকে কত মূল্যবান জিনিষ যে পুরস্কার দিলেন তাহার সীমাই নাই।

রূপিণিকা মায়ের দুরবস্থা দেখিয়া এত যে দুঃখিত হইয়াছিল, সেও তখন নিরুদ্দেশ স্বামীকে পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইল। এখন আর লোহজঙ্ঘের ধনের অভাব কি, সুতরাং শাশুড়ীও তাহাকে আর জ্বালাতন করে না বরং তাহার স্বভাবটি আশ্চর্য্যরকম মোলায়েম হইয়া আসিল। অতুল ধন পাইয়া লোহজঙ্ঘ ও রূপিণিকা পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

পুরাতন লেখা

(৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত)

আকাশ

অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে তারাগুলি বড় সুন্দর দেখায়। তখন ছাতে বসিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে বেশ লাগে। তারাগুলি কেমন মিট্ মিট্ করে, দেখিয়াছ? দুএকজন হাসি খুসি লোক আছে,

তাদের যত হাসি সব চোখ দুটীর ভিতরে। তারাগুলিকে দেখিলে আমার ঐরূপ লোকের চোখের কথা মনে হয়। বোধ হয়, যেন আমাকে দেখিয়া তাহাদের বড়ই হাসি পাইয়াছে।

বাস্তবিক, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যেমন আশ্চর্য্য হই, তাহা জানিতে পারিলে উহারা নিশ্চয়ই হাসিয়া ফেলিত। সেই কবে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ জন্মিয়াছিল, আর আজ এই উনিশ শত সালের জুলাই মাস। এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত তাহাদিগকে দেখিতেছে, তথাপি মানুষের দেখিবার সাধ মিটে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দূরবীণ তয়ের করে; সারা রাত জাগিয়া সেই দূরবীণ দিয়া আকাশ দেখে। যাহারা এরূপ করে, তাহারা নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাহাদের মত বড় পণ্ডিত খুব কমই আছে।

আজ কাল ভাল ভাল দূরবীণ এবং অন্যান্য অনেক রকম যন্ত্র হইয়াছে। আগে এসব ছিল না। তখন শুধু চোখে যাহা দেখা যাইত, তাহাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। দেখিতে জানিলে শুধু চোখেই কি কম দেখা যায়? আমরা শুধু চোখে আকাশের যাহা দেখিতে পাই, তাহা কম আশ্চর্য্য নহে। রোজ দেখিয়া সেগুলি আমাদের কাছে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমরা তাহাদিগকে তেমন আশ্চর্য্য মনে করি না। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, এসকল যদি কিছুই আগে না থাকিত, আর তারপর একদিন হঠাৎ আসিয়া দেখা দিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খাবার ফেলিয়া ছুটিয়া দেখিতে আসিতাম।

তোমাদের সকলে ধূমকেতু দেখ নাই, কিন্তু ধূমকেতুর কথা অনেক শুনিয়াছ। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, একটা ধূমকেতু দেখিবার জন্য তোমাদের মনটা ব্যস্ত হইয়া আছে কি না? কিন্তু ধূমকেতু যদি রোজ উঠিত তবে তাহার এত খবর কেহ লইত কি না সন্দেহ।

যাহা রোজ ঘটিতেছে, তাহাও অতিশয় আশ্চর্য্য। এই যে আমরা পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া ঘূরপাক খাইতে খাইতে শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছি, বলিতে গেলে এইটা কি একটা কম আশ্চর্য্যের ব্যাপার? আমাদের পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে বৎসরে একবার সূর্য্যের চারিদিকে বেড়াইয়া আইসে। সূর্য্যটা যদি এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, আর পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিত, তবে পৃথিবীর পরিশ্রম একটু কম হইত। কিন্তু এজগতে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার হুকুম নাই। সুতরাং সূর্য্যও

পৃথিবীকে লইয়া নিজে ঘূরিতে ঘূরিতে আকাশের এক দিক পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর চারিধারে চন্দ্র ঘোরে; চন্দ্রকে লইয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিধারে ঘোরে; আবার চন্দ্রশুদ্ধ পৃথিবীকে লইয়া সূর্য্য কোথায় চলিয়াছে! শেষে গিয়া সে কোথায় ঠেকিবে! আর এই আকাশটাই কত বড় যে, এতদিন ছুটিয়াও সূর্য্য তাহার শেষ পাইল না! একটা তারার দিকে সূর্য্য ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই তারাটা দু'শ বৎসর আগে যত দূরে দেখাইত, এখনও তত দূরেই দেখায়। সেই তারাটাই বা কত দূরে যে, এত কাল ছুটিয়াও সূর্য্য তাহার কিছু মাত্র কাছে পৌছিতে পারিল না। সূর্য্য এত দূরে থাকিলে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। সেই তারাটা বোধ হয় সূর্য্যের চাইতেও অনেকখানি বড় আর উজ্জ্বল। সেটা খুব বড় সূর্য্য; আমাদের এটি একটি ছোট সূর্য্য।

বাস্তবিক আকাশের কথা অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু শুধু আশ্চর্য্য বলিয়াই যে লোকে আকাশের খবর এত করিয়া লয়, তাহা নহে। এসকল কথা জানাতে আমাদের বিস্তর উপকারও আছে। এমন কি আকাশের সম্বন্ধে লোকে এত দিন ধরিয়া যত কথা শিখিয়াছে, এখন যদি হঠাৎ তাহার সমস্তই ভুলিয়া যাওয়া যায়, তবে ভারি মুস্কিল হইবে। প্রথম কথা দেখ, আমাদের সময়ের ঠিক থাকিবে না। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আমরা সময় ঠিক করি। মোটামুটি সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত, সকল কথাই সূর্য্যের মুখ চাহিয়া। তাহার চাইতে বেশী হিসাবের কথা—অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি ঘড়ির হিসাবের কথা—যদি বল. সেখানেও দেখিবে আকাশকে ছাড়িয়া কাজ চলে না।

একটার সময় কলিকাতায় তোপ পড়ে। তখন সকলে নিজের নিজের ঘড়ি ঠিক করিয়া লয়। তোপ কি করিয়া পড়ে জান? আকাশের সম্বন্ধে যত কথা জানা গিয়াছে তাহা লইয়া জোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Astronomy. সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ইহাদের কোন্‌টা আকাশের কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে থাকে, জোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা অঙ্ক কষিয়া তাহা স্থির করা যায়। ঐরূপে অঙ্ক কষিয়া এসকল কথা স্থির করিয়া পুস্তকে লিখিলে তাহাকে বলে পঞ্জিকা। কোন্ দিন ঠিক কোন্ সময়ে সূর্য্য আমাদের মাথার উপরে আসিবে, পঞ্জিকা দেখিয়া তাহা জানা যায়। সূর্য্য আমাদের মাথার উপরে আসিবার সময় যদি ঘড়িতে ঠিক সেই সময়টি দেখায়, তবেই

বলিতে পারি, ঘড়ি ঠিক। তাহা যদি না হয়, তবে ঐ সময় পঞ্জিকার সঙ্গে মিলাইয়া ঘড়ি ঠিক করিয়া দিতে হয়। সময় দেখিবার জন্য একটা আপিস আছে। এই আপিসে একটা ভাল ঘড়ি আছে। সূর্য্য মোটামুটি ১২টার সময় আমাদের মাথার উপরে আইসে। ঐ সময়ে ঐ আপিসের লোকেরা দূরবীণ দিয়া সূর্য্য দেখিয়া ঘড়ি ঠিক করে। তারপর ১টার সময় ঐ ঘড়ি দেখিয়া তোপ ফেলা হয়। সূর্য্য, তারা, এসকলের সাহায্য না পাইলে ঘড়ি ঠিক রাখা সম্ভব হইত না। তার ফল এই হইত যে, তোমরা কেহ ১০টার সময়ই ইস্কুলে গিয়া বসিয়া থাকিতে, আর কেহ ১২টার সময় যাইতে। মাষ্টার মহাশয়ের নিতান্তই অসুবিধা হইত, তোমাদের পড়াশুনা ভাল করিয়া হইত না। যখন ইস্কুলে জল খাবারের ছুটি হইত, বাড়ীর লোক হয়ত তখন খাবার পাঠাইত না। রেলে যাইতে হইলে আরো মুস্কিল হইত!

সমুদ্রে জাহাজগুলি যদি আকাশ দেখিতে না পায়, তবে তাহাদের পথ চিনিয়া চলাই অসম্ভব হয়। আজ যদি সকলে আকাশের কথা ভুলিয়া যায়, তবে সমুদ্রে চলাও বন্ধ হইয়া যাইবে; যে সকল জাহাজ এখন সমুদ্রে আছে, তাহারা সকলেই পথ ভুলিয়া যাইবে। আমরা যে নুন টুকু খাই, তাহাও জাহাজে আসে। সুতরাং জাহাজ চলা বন্ধ হইলে বড়ই মুস্কিল হইবে।

আকাশের কথা জানিলে যেমন আনন্দ, তেমনি উপকার। এই জন্যই লোকে এত কষ্ট করিয়া আকাশের খবর লইতে ব্যস্ত হয়। ভাল করিয়া আকাশের খবর লইতে হইলে অনেক রকম যন্ত্র আর অনেক লেখা পড়া জানিবার দরকার। আমাদের যদিও তাহার কিছুই নাই, তথাপি আমরা এই বিষয়ের অতি সামান্য একটু চর্চ্চা করিতে পারি; তাহাতেও যথেষ্ট আনন্দ আছে।

আকাশকে আমরা সচরাচর যেমন করিয়া দেখি, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে বেশী কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে রোজ দেখিতে হয়, আর খুব সতর্ক হইয়া দেখিতে হয়। এইরূপ করিয়া কিছু দিন দেখিলেই অনেক আশ্চর্য্য কথা জানিতে পারিবে।

রাবণ রাজার দেশে

রাবণ রাজার দেশে আমি এর মধ্যেই অনেক যায়গায় বেড়িয়ে এসেছি। এক দিন কলম্বো থেকে ৫৬ মাইল দূরে একটা রবারের কারখানায় গিয়েছিলাম। সে বড় চমৎকার! সকাল বেলা কুলীরা রবার গাছ-গুলোর গোড়ার দিকের খানিকটা ছাল কেটে একটা নারকেল মালায় ক'রে গাছের রস ধরে। এক এক জন লোক ২০০টা গাছ কাটে, তারপর সব কটা গাছের রস একটা বাল্‌তী করে ধরে নিয়ে কারখানাঘরে নিয়ে যায়। সেখানে প্রথমে এই রস জমিয়ে বড় বড় ছানার চাপের মত করে, তারপর সেগুলো ছুরী দিয়ে যেমন করে রুটী কাটি অমনি করে কাটে। তারপর সেই টুক্‌রোগুলো কলে ফেলে লম্বা লম্বা কাপড়ের টুক্‌রার মত তৈরী করে; দেখ্‌তে ঠিক মনে হয় যেন গিলে দিয়ে কোঁচান। পরে সেগুলি আগুনের তাতে দিয়ে শুকায় এবং ধোঁয়া লাগিয়ে লাল করে। তারপর প্যাক্ করে পাঠায়। এখন রবার গাছের পাতা সব লাল হয়ে পড়ে যাচ্ছে; আস্‌ছে মাসে নূতন পাতা গজাবে আর ফুল ফুট্‌বে। এক একটা ফুলে তিনটি করে বিচী হয়।

আরেকদিন কেলিয়াণী (কল্যাণী) বলে একটা যায়গায় একটা বৌদ্ধ মন্দির দেখ্‌তে গিয়েছিলাম! সেখানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবির নীচে বুদ্ধ দেবের দাঁত লুকান আছে। এই দাঁত হেম মালি বলে একজন ওড়িয়া রাজকন্যা তাঁর চুলের মধ্যে করে লুকিয়ে এই দেশে নিয়ে আসেন। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটা প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি আছে—বুদ্ধমূর্ত্তি হাতের উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। মূর্ত্তির সাজ পোষাক সব সোণার। সেখানে কে একজন সোণার আনারস মানত করেছে দেখ্‌লাম। দেয়ালের গায়ে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি আঁকা। এক একটা ছবি মন্দ নয়—কিন্তু মোটের উপর কোনট্যাই খুব সুন্দর লাগল না। মন্দিরটার গঠন কিছু সুন্দর নয়। মন্দিরে সাধারণতঃ

তিনটি ভাগ থাকে—একটি স্তূপ যার নীচে বুদ্ধদেবের কোনও চিহ্ন লুকান আছে, একটি তাঁর মূর্ত্তি রাখা ঘর, আর একটি বোধিদ্রুম—অর্থাৎ একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই মন্দিরে একজন বাঙ্গালী বাবু, তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হল।

কাল এখানকার স্কুলের মেয়েরা বলদটানা গাড়ী চড়ে সেই মন্দির দেখ্‌তে গিয়েছিল। তারা আমায় যেতে ডেকেছিল কিন্তু আমি যাইনি। এখানকার গরুর গাড়ী আমাদের দেশের গাড়ীর মতই দেখ্‌তে। এরা গাড়ী চালাবার সময় 'জ্যাক' আর 'ম্যাক' শব্দ করে গাড়ী চালায়। ডান দিকে চল্‌বার সময় বলে 'জ্যাক' আর বাঁ দিকে 'ম্যাক'—একজন সাহেব এই শুনে ভাব্‌লেন যে এদেশের লোকেরা গরুদের বুঝি ওই রকম নাম দেয়—তাই তিনি এক কাগজে লিখেছেন যে সিংহলীরা প্রত্যেকেই গরুর গাড়ীর গরুদের এক ই নাম দেয়, ডান দিকেরটা 'জ্যাক' আর বাঁ দিকেরটা 'ম্যাক'।

এরা আমকে বলে 'আম্ব'। এখানে এখনই পাকা আম খাচ্ছি।
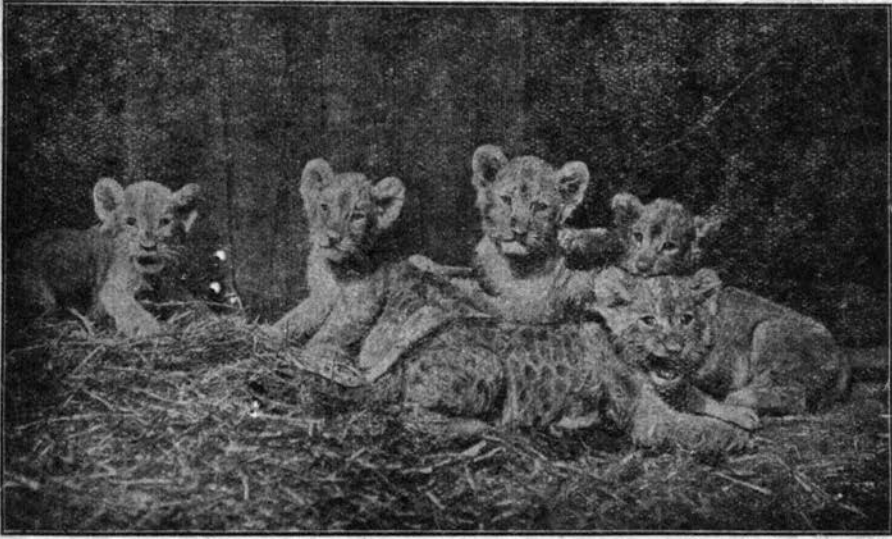
পশুরাজের পাঁচটি ছেলে

ফটোগ্রাফ তুল্‌বার যন্ত্রটিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে—কতক ভয়ে কতক কৌতুহলে।

ধনঞ্জয়

এ পাখীর ইংরাজি নাম হর্ণবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু, কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখী বলে, কিন্তু অভিধান খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি, ও নামে কোন পাখীই নাই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—"হাড়গিলার আকার বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী"। "করেটু" মানে "কর্ক্করেটু পক্ষী"—"কর্ক্করেটু" মানে "করাটিয়া পক্ষী"। আবার "করাটিয়া"র মানে দেখ্‌তে গেলে আরও কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হ'লো না। যা'হোক্, নাম দিয়ে কেউ যদি চিন্‌তে না পারে, তবে চেহারাটা দেখ্‌লে তার পরিচয় পেতে বোধ হয় দেরী হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখ্‌লে আর সহজে ভুলবার যো নেই।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখী আছে, তার মধ্যে "ফার্স্ট প্রাইজ" কাউকে দিতে হ'লে বোধ হয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখীকে প্রথম দেখি, তখন তার নাম দিয়েছিলাম "দুই-ঠোঁটওয়ালা পাখী। বাস্তবিক কিন্তু এর একটা মাত্রই ঠোঁট। উপরেরটা শিং বল্‌তে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোন সম্পর্কই নাই। অত বড় একটা জম্‌কালো শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয় তা ত দেখ্‌তে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখী, কারও সঙ্গে গুঁতাগুঁতি কর্‌বার সাহস তার আছে কিনা সন্দেহ। চেহারা দেখ্‌লে মনে হয়, "বাপ্‌রে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই ত গেছি"! কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়্‌লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নাই বল্লেই হয়।

এত বড় ঠোঁট, তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা ব'য়ে ব'য়ে পাখীটার মাথাও কি ধরে না? চল্‌তে ফির্‌তে উড়তে গিয়ে সে কি উল্টেও পড়ে না?—আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মত হাল্কা! তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড় বড় গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায় —খাবার দেখ্‌লে ঝুপ্ ক'রে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেখ দেখি, সে কেমন চট্‌পট্ ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে! এ বিষয়ে তার মত ওস্তাদ আর বোধ হয় দ্বিতীয় নাই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধ হয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর।

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্ণিও দ্বীপে। সে দেশে এই পাখী অনেকেই পুযে থাকে। সাহেব বলেন এমন সর্ব্বনেশে পেটুক

জীব আর কোথাও মেলে না! সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারত না। এই মাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখ্‌বে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে ব'সে ব'সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তারপর একটু বয়স হ'লে তখন তার অত্যাচারে বাড়ীতে টেঁকা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আট্‌কে রাখতে হ'ত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায়, যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে করে তুল্‌ত। মাছ মাংস ডাল ভাত রুটি বিস্কুট ময়দার ডেলা, যা দাও তাতেই সে খুসী, কিন্তু পেট ভ'রে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নতুন ক'রে সাজ্জাতিক খিদে ডেকে আন্‌বে।

ধনঞ্জয় পাখীর চালচলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা বলেন, এই পাখীর বাসা বাঁধবার ধরণটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয়, তখন মা-পাখীটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা-পাখী সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শেওলা দিয়ে বেশ ক'রে এঁটে বন্ধ ক'রে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হ'লে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি ক'রে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখী দিনের পর দিন তার উপর ব'সে ব'সে তা' দেয়। আর বাবাপাখী বাইরে থেকে পাহারা দেয়,
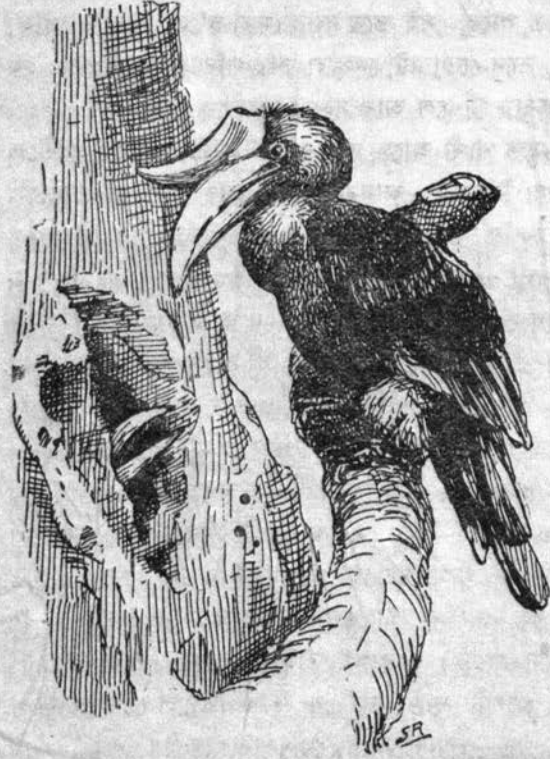
আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি ক'রে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড় হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখী বেরিয়ে আসে! এতদিন বন্ধ জায়গায় ব'সে ব'সে তার পা এমন আড়ষ্ট হ'য়ে যায় যে, কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভাল ক'রে চল্‌তে ফিরতেও পারে না! এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটাই বোধ হয় বেশ কাজে লাগে।

ধনঞ্জয় পাখী আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এসিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানা রকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখীর নাম "কুচিলাখাই"। "কুচিলাখাই"-য়ের গায়ের রং কাল, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চক্‌চকে লাল্‌চে হলুদ দেখ্‌তে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নাই বল্লেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীর গোছের কেশর আছে, আর ঠোঁট দুটো করাতের মত দাঁতাল। সুমাত্রাদ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নাই কিন্তু তার জমকালো কেশরটি অতি চমৎকার ধব্‌ধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়—কারও শিং খড়্‌গের মত বাঁকা, কারও কিরীচের মত সোজা, আবার একজন আছেন তাঁর শিংটি শশার মত গোল, তার উপরে ঝুঁটি!

ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেম্‌নি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুন্‌লে অন্য পাখীরাত ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্য্যন্ত ভয়ে পালায় এমনও দেখা যায়। তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বল্‌তে গেলে আর এক পাখীর কথা বল্‌তে হয়—তার নাম টুকান্ (Toucan)। এই পাখীর বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকালো রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিষ এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি! দেখ্‌লে মনে হয় যত বড় পাখী প্রায় তত বড় ঠোঁট—যেন "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি"। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশী বর্ণনা করবার দরকার নাই, এবারকার রঙিন ছবিখানা দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে। দেখ্‌তে অনেকটা ধনঞ্জয়ের মত হ'লেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মত অত বড়ও হয় না! যাদের রঙিন্ ছবি দেওয়া হ'ল, এরাই সব চাইতে বড় হয়—অথচ এদের শরীরটা ঠোঁট বাদে লম্বায় এক হাতের চাইতেও কম—এক একটা ধনঞ্জয় তার প্রায় দ্বিগুণ বড় হয়।

দাশুর কীর্ত্তি

নবীনচাঁদ স্কুলে এসেই বল্‌ল, কাল তাকে ডাকাতে ধ'রেছিল। শুনে স্কুলশুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে আস্‌ল। "ডাকাতে ধরেছিল? বলিস্ কিরে"! ডাকাত না ত কি? বিকেল বেলায় সে জ্যোতিলালের বাড়ীতে পড়ুতে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরবার সময় ডাকাতেরা তাকে ধ'রে তার মাথায় চাঁটি মেরে, তার নতুনকেনা সখের পিরাণটিতে কাদা-জলের পিচ্‌কিরি দিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌—নইলে দ্‌ড়াম্ ক'রে তোর মাথা উড়িয়ে দেব"। তাই সে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে রাস্তার ধারে প্রায় বিশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল, এমন সময় তার বড় মামা এসে তার কাণ ধ'রে বাড়ীতে নিয়ে বল্লেন, "রাস্তায় সং সেজে এয়ার্কি করা হ'চ্ছিল"? নবীনচাঁদ কাঁদ' কাঁদ' গলায় বলে উঠ্‌ল, "আমি কি করব? আমায় ডাকাতে ধরেছিল—" শুনে তার মামা প্রকাণ্ড এক চড় তুলে বল্‌লেন, "ফের জ্যাঠামি!" নবীনচাঁদ দেখ্‌ল মামার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা—কারণ সত্যি সত্যিই তাকে যে ডাকাতে ধরেছিল, একথা তার বাড়ীর কাউকে বিশ্বাস করান শক্ত। সুতরাং তার মনের দুঃখ এতক্ষণ মনের মধ্যেই চাপা ছিল, স্কুলে এসে আমাদের কাছে বস্‌তে না বস্‌তেই সে দুঃখ একেবারে উথলিয়ে উঠ্‌ল।

যাহোক্, স্কুলে এসে তার দুঃখ বোধ হয় অনেকটা দূর হ'তে পেরেছিল—কারণ, স্কুলের অন্তত অর্দ্ধেক ছেলে তার কথা শুনবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হ'য়ে ঝুঁকে পড়েছিল—এবং তার প্রত্যেকটি ঘামাচি, ফুস্‌কুড়ি আর চুলকানির দাগটি পর্য্যন্ত তারা আগ্রহ ক'রে ডাকাতির সুস্পষ্ট প্রমাণ ব'লে স্বীকার ক'রেছিল। দুএকজন যারা তার কুনুইয়ের আঁচড়টাকে পুরান ব'লে সন্দেহ করেছিল তারাও বল্‌ল যে হাঁটুর কাছে যে ছ'ড়ে গেছে সেটা একেবারে টাট্‌কা নতুন। কিন্তু তার পায়ের গোড়ালিতে যে ঘায়ের মত ছিল সেটাকে দেখে কেষ্টা যখন বল্‌ল "ওটাত জুতোর ফোস্কা" তখন নবীনচাঁদ ভয়ানক চ'টে বল্‌ল, "যাও! তোমাদের কাছে আর কিচ্ছু বল্‌ব না"। কেষ্টাটার জন্য আমাদের আর কিছু শোনাই হ'ল না।

ততক্ষণে দশটা বেজে গেছে, ঢং ঢং ক'রে স্কুলের ঘণ্টা প'ড়ে গেল। সবাই যে যার ক্লাশে চলে গেলাম, এমন সময় দেখি পাগ্‌লা দাশু এক গাল হাসি নিয়ে ক্লাশে ঢুকছে। আমরা বল্লাম, "শুনেছিস্? কাল ন'বুকে ডাকাতে ধ'রেছিল।" যেমন বলা অম্‌নি দাশরথী হঠাৎ হাত পা ছেড়ে বই টই ফেলে খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ-খ্যাঃ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে

হাস্‌তে হাস্‌তে একেবারে মেঝের উপর ব'সে পড়ল। পেটে হাত দিয়ে গড়াগড়ি ক'রে একবার চিৎ হয়ে একবার উপুড় হ'য়ে, তার হাসি আর কিছুতেই থামে না। দেখে আমরাত অবাক! পণ্ডিত মশাই ক্লাশে এসেছেন, তখনও পূরোদমে তার হাসি চল্‌ছে। সবাই ভাবলে "ছোঁড়াটা ক্ষেপে গেল নাকি"? যাহোক্, খুব খানিকটা ছুটোপাটির পর সে ঠাণ্ডা হ'য়ে বই টই গুটিয়ে বেঞ্চের উপর উঠে বস্‌ল। পণ্ডিতমশাই বল্‌লেন, "ওরকম হাসছিলে কেন"? দাশু নবীনচাঁদকে দেখিয়ে বল্‌ল, "ঐ, ওকে দেখে"। পণ্ডিতমশাই খুব কড়ারকমের ধমক লাগিয়ে তাকে ক্লাশের কোণায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। কিন্তু পাগলার তাতেও লজ্জা নেই—সে সারাটি ঘণ্টা থেকে থেকে বই দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

টিফিনের ছুটির সময় ন'বু দাশুকে চেপে ধরল—"কিরে দেশো! বড় যে হাসতে শিখেছিস্"! দাশু বল্‌ল, "হাসব না? তুমি কাল ধুচুনি মাথায় দিয়ে কি রকম নাচটা নেচেছিলে, সেত আর তুমি নিজে দেখনি! দেখ্‌লে বুঝতে কেমন মজা"! আমরা সবাই বল্লাম, "সে কি রকম? ধুচুনি মাথায় নাচছিল মানে"? দাশু বল্‌ল, "তাও জান না? ওই কেষ্টা আর জগাই—ঐযা! বল্‌তে না বারণ করেছিল!" আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্লাম, "কি বল্‌ছিস্ ভাল ক'রেই বল্ না"। দাশু বল্‌ল, "কালকে শেঠেদের

বাগানের পিছন দিয়ে ন'বু একলা একলা বাড়ী যাচ্ছিল, এমন সময় দুটো ছেলে—তাদের নাম বল্‌তে বারণ—তারা দৌড়ে এসে ন'বুর মাথায় ধুচ্‌নির মত কি একটা

চাপিয়ে তার গায়ের উপর আচ্ছা ক'রে পিচকিরি দিয়ে পালিয়ে গেল"। ন'বু ভয়ানক রেগে বল্‌ল "তুই তখন কি করছিলি?" দাশু বল্‌ল "তুমি তখন মাথার থলি খুলবার জন্য ব্যাঙের মত হাত পা ছুঁড়ে লাফাচ্ছিলে দেখে আমি বল্লাম—ফের নড়বি ত দড়াম ক'রে মাথা উড়িয়ে দেব। তাই শুনে তুমি রাস্তার মধ্যে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে—তাই আমি তোমার বড় মামাকে ডেকে আনলাম।" নবীনচাঁদের যেমন বাবুয়ানা তেম্‌নি তার দেমাক—সেই জন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না, তার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে সবাই বেশ খুসী হলাম। ব্রজলাল ছেলেমানুষ, সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বল্‌ল "তবে যে নবীনদা বলছিল, তাকে ডাকাতে ধরেছে"? দাশু বল্‌ল, "দূর বোকা! কেষ্ট কি ডাকাত?" বল্‌তে না বল্‌তেই কেষ্টা সেখানে এসে হাজির। কেষ্টা আমাদের উপরের ক্লাশে পড়ে—তার গায়েও বেশ জোর আছে। নবীনচাঁদ তাকে দেখবামাত্র শিকারী বেড়ালের মত ফুলে উঠ্‌ল, কিন্তু মারামারি করতে সাহস পেল না, খানিকক্ষণ কটমট ক'রে তাকিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়ল। আমরা ভাবলাম গোলমাল মিটে গেল।

কিন্তু তার পরদিন ছুটির সময় দেখি নবীন তার দাদা মোহনচাঁদকে নিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে আমাদের দিকে আস্‌ছে। মোহনচাঁদ এণ্টান্স ক্লাসে পড়ে, সে আমাদের চাইতে অনেক বড়—তাকে ওরকম ভাবে আস্‌তে দেখেই আমরা বুঝলাম এবার একটা কাণ্ড হবে। মোহন এসেই বল্ল "কেষ্টা কই"? কেষ্টা দূর থেকে তাকে দেখেই কোথায় সরে পড়েছে, তাই তাকে আর পাওয়া গেল না। তখন নবীনচাঁদ বল্‌ল "ওই দাশুটা সব জানে, ওকে জিজ্ঞেসা কর"। মোহন বল্‌ল "কিহে ছোকরা, তুমি সব জান নাকি?" দাশু বল্‌ল "না, সব আর জানব কোত্থেকে—এইত সবে ফোর্থ্‌ ক্লাসে পড়ি—একটু ইংরিজি জানি, ভূগোল, বাংলা, জিওমেট্রি—" মোহনচাঁদ ধমক দিয়ে বল্‌ল "সেদিন ন'বুকে যে কারা সব ঠেঙিয়েছিল, তুমি তার কিছু জান কি না"? দাশু বল্‌ল "ঠ্যাঙায়নি ত—মেরেছিল; খুব আস্তে মেরেছিল"। মোহন একটু খানি ভেংচিয়ে বল্‌ল "খুব আস্তে মেরেছে, না? কতখানি আস্তে শুনি ত?" দাশু বল্‌ল "সে কিছুই না—ওরকম মার্‌লে একটুও লাগে না"। মোহন আবার ব্যঙ্গ করে বল্‌ল "তাই নাকি? কি রকম মারলে পরে লাগে?" দাশু খানিকটা মাথা চুলকিয়ে তারপর বল্‌ল "ঐ সেবার হেডমাষ্টার মশাই তোমায় যেমন বেত মেরেছিলেন, সেইরকম"। একথায় মোহন ভয়ানক চটে দাশুর কাণ ম'লে দিয়ে চীৎকার করে বল্‌ল, "দেখ্‌ বেয়াদব! ফের জ্যাঠামি

করবি ত চাবকিয়ে লাল ক'রে দেব। তুই সেখানে ছিলি কি না, আর কি রকম কি মেরেছিল সব খুলে বলবি কি না"? জানই ত দাশুর মেজাজ কেমন পাগলাটে গোছের, সে একটুখানি কানে হাত বুলিয়ে তারপর হঠাৎ মোহনচাঁদকে ভীষণ ভাবে আক্রমন ক'রে বস্‌ল। কীল ঘুঁষি চড়, আঁচড় কামড়, সে এম্‌নি চট্‌পট্‌ চালিয়ে গেল যে আমরা সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম। মোহন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেনি যে ফোর্থ ক্লাসের একটা রোগা ছেলে তাকে অমন ভাবে তেড়ে আস্‌তে সাহস পাবে—তাই সে একেবারে থতমত খেয়ে কেমন যেন লড়ুতেই পারল না—দাশু তাকে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে চিৎপাত ক'রে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ল, "এর চাইতেও ঢের আস্তে মেরেছিল"। এণ্ট্রেন্স ক্লাসের কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা যদি মোহনকে সাম্‌লে না ফেলত তাহ'লে সেদিন তার হাত থেকে দাশুকে বাঁচানই মুস্কিল হ'ত।

পরে একদিন কেষ্টাকে জিজ্ঞেস্‌ করা হ'য়েছিল, "হ্যাঁরে ন'বুকে সেদিন তোরা অমন করলি কেন"? কেষ্টা বল্‌ল "ঐ দাশুটাইত শিখিয়েছিল ওরকম করতে। আর বলেছিল 'তা হ'লে একসের জিলিপি পাবি"। আমরা বল্‌লাম "কৈ আমাদের ত ভাগ দিলিনে"? কেষ্টা বল্‌ল "সে কথা আর বলিস্‌ কেন? জিলিপি চাইতে গেলুম, হতভাগা বলে কিনা 'আমার কাছে কেন? ময়রার দোকানে যা, পয়সা ফেলে দে, যত চাস্‌ জিলিপি পাবি'।"

আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যিই পাগল, না কেবল মিচ্‌কেমী করে?

হিংসুটী

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে—বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বল্‌তে গেলেইত মুস্কিল, কারণ ঐ নামে সন্দেশের শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকেন, তাঁরা ত আমার উপর চটে যাবেন।

হিংসুটীর দিদি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্ম্মে, তেমনি লেখা পড়ায়। হিংসুটির বয়স সাত বছর হ'য়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হ'ল না—আর তার দিদি

তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়—সে এখনই "বোধোদয়" আর "ছেলেদের রামায়ণ" প'ড়ে ফেলেছে, ইংরিজি ফার্ষ্টবুক তার কবে শেষ হ'য়ে গেছে। হিংসুটী কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তার দিদিকেও হিংসে কর্‌ত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটী খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যেবার ছবির বই প্রাইজ পেলে, আর হিংসুটী কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখ্‌তে! সে সারাটি দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে ব'সে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বল্‌ল না। তারপর রাত্রি বেলায় দিদির অমন সুন্দর বই খানাকে কালি ঢেলে মলাট ছিঁড়ে কাদায় ফেলে নষ্ট ক'রে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটে মেয়ে!

হিংসুটীর মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু বোনকেই আদর ক'রে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটী খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্‌ল। মামা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন, "কিরে, কি হ'ল? জিভে কামড় লাগ্‌ল নাকি"? হিংসুটীর মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদ্‌ছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বল্লেন, "কি হ'য়েছে বল্‌ না!" তখন হিংসুটী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "দিদির ঐ রসমুণ্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়"। তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুণ্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটী নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্দ্ধেক সে খেতে পার্‌ল না—নষ্ট ক'রে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা নতুন কাপড় আস্‌লে হিংসুটী তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রে তোলে।

একদিন হিংসুটী তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কি! লাল জামা গায়ে, লাল জুতা পায়ে, টুকটুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটী বল্‌ল, "দেখেছ! দিদি কি দুষ্টু! নিশ্চয় মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় ক'রেছে—আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাঁখা হ'য়েছে!" তখন তার ভয়ানক রাগ হ'ল। সে ভাবল "আমিত ছোট বোন, আমারইত পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে"? এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কি সুন্দর পুতুল! কেমন মিট্‌মিটে চোখ, আর ফুট্‌ফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুক্‌টুকে জামা কাপড়! যত সব ভাল ভাল জিনিষ সব কি না দিদি পাবে! হিংসুটীর চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

তাতেও তার রাগ গেল না ; সে একটা ডাণ্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে পুতুলটাকে মারতে

লাগ্‌ল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেল বেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বল্‌লেন, "তোর জন্য কি এনেছি দেখিস্‌নি"? শুনে হিংসুটী দৌড়ে এল "কই মামা? কি এনেছ? দাও না।"

মামা বল্‌লেন, "মার কাছে দেখ্ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।" হিংসুটী উৎসাহে নাচ্‌তে লাগ্‌ল, মাকে বল্‌ল, "কোথায় রেখেছ মা"? মা বল্লেন, "আলমারিতে আছে"। শুনে ভয়ে হিংসুটীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল। সে কাঁদ' কাঁদ' গলায় বল্‌ল, "সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরান—মাথায় কাল কাল কোঁকড়ান চুল ছিল"? মা বল্লেন, "হ্যাঁ—তুই দেখেছিস্ নাকি"?

হিংসুটীর মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এর পরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কি ক'রে কম্‌বে?

শামুক ঝিনুক

আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামটিকে আমরা কঙ্কাল বলি। কঙ্কালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে, এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কঙ্কালটা থাকে শরীরে বাহিরে।

এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছ; কারণ, আমি কোন অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মত নিতান্ত সামান্য জিনিষের মধ্যে যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার লুকান থাকে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎস্যাঁতে জায়গায় ছোট ছোট জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে জীয়ন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারাজন্ম মাটি আঁক্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়াড়, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতরে ঢুকিতে চায়। দু এক জন আছে তাহারা লাফান বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্ত্তা নাই হঠাৎ তড়াক্ করিয়া এক একটা লাফ দেয়। আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলা যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোট বড় নানা রকম মুক্তা জমাইয়া রাখে তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায়, আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।
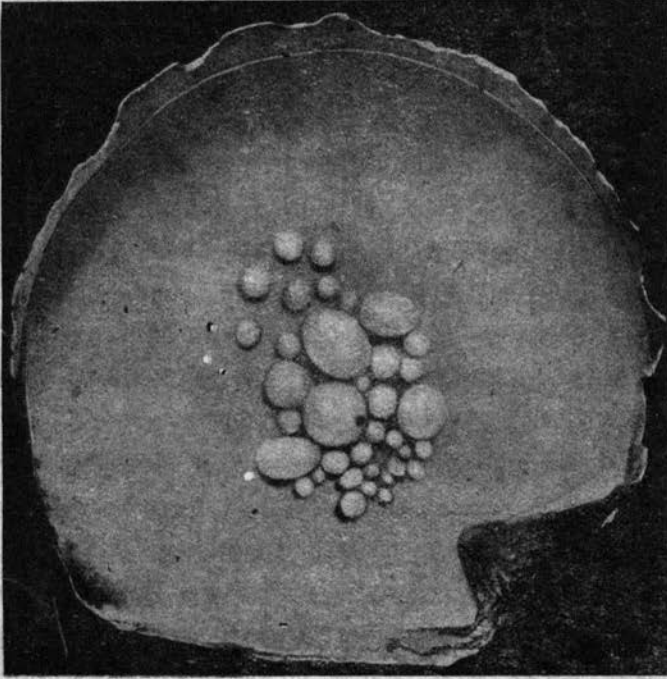
মুক্তাশুক্তি

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয়,

তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায়একটা পুরু চামড়ার মত থাকে; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরী হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিমগুলি দেখিতে বড়ই অদ্ভুত। কতগুলি ছোট ছোট পোঁটলা একসঙ্গে মালার মত বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতগুলি ডিম। এক একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশ' দেড়শ' হইতে দশবিশ হাজার। কিন্তু এ বিষয়ে এক একটা ঝিনুকের ওস্তাদী অনেক বেশী। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ বিশ লাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানা রকম জীব জন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ খোলা জমিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপ ভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড় হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এই রকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে; তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপ ভাবে বাড়িতে পারিলে একটি মাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা সহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

বলিতে গেলে এক সময়ে এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোন জীব জন্তু ছিল না, কেবল নানা রকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত! আজও তাহাদের কঙ্কাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড় বড় স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে, সব চাইতে বড় যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। সেগুলা কতখানি বড়, তাহা পুরাপুরি দেখাইতে গেলে সন্দেশের পৃষ্ঠায় কুলাইবে না—তাই পরপৃষ্ঠায় ছোট করিয়া দেখান হইল। সেই মাপে একটা "সন্দেশ"ও আঁকা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারিবে গেঁড়িটা কতখানি বড়! ইহারা একটি করিয়া লম্বা গোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখীর ডিমের মত শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খজাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড় জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের একএকটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে একটি ছোট খাট ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি? নরম ঘাস, কচিপাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নিরামিষে রুচি নাই তাঁহারা
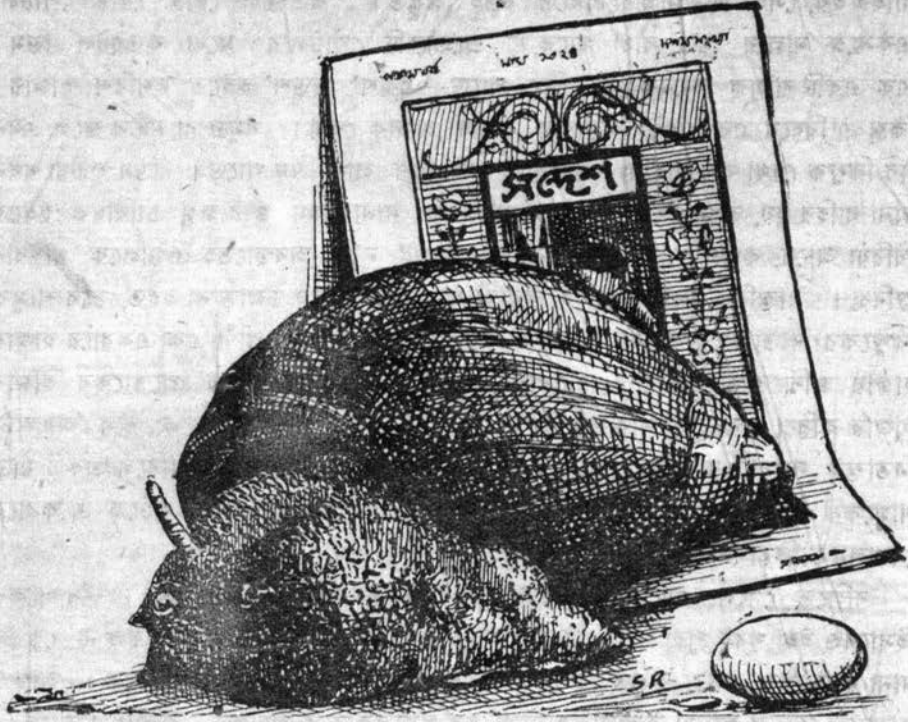
নানারকম পোকামাকড় জলের কীট এই সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এই রকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া, তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলায় দুটি করিয়া পাট থাকে, সেদুটিকে তাহারা ইচ্ছামত কব্জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর একটি তফাৎ এই যে ঝিনুকের দাঁত নাই কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের
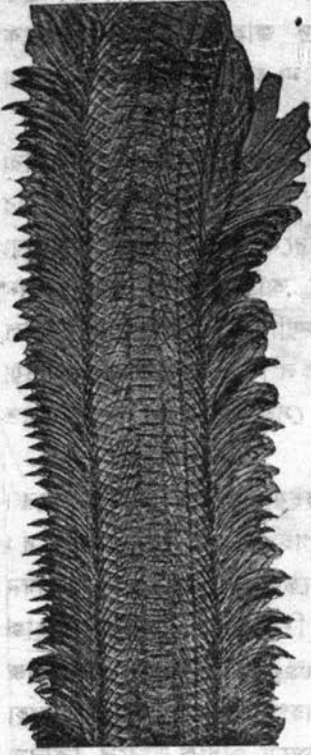
মত কিছু একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজান থাকে, এক একটা শামুকের প্রায় দুই চারশ' বা হাজার-দেড়হাজার দাঁত। অনুবীক্ষণ দিয়া সেই দাঁতাল জিভটিকে কেমন দেখা যায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল। উখার মত ধারাল এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে উপরে আশে পাশে ঘ্যাশ্ ঘ্যাশ্ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিষ সব টুকরা টুকরা হইয়া থ্যাৎলাইয়া কাদার মত নরম হইয়া যায়। ছবিতে যেমন দেখান হইল, সকলের জিভ ঠিক এই রকম নয়। এক একটার জিভের আগা পর্য্যন্ত সাংঘাতিক ধারাল; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুঁটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তারপর, শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে ত শেষ করাই মুস্কিল হইবে। কত হাজার রকমের শঙ্খ, তাদের কত রকম আকার, কত রকম রং। তার এক একটার যে কি আশ্চর্য্য সুন্দর গড়ন শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝান যায়। আগামী মাসে কতগুলি আশ্চর্য্য শঙ্খের রঙিন্ ছবি দেওয়া হইবে, তাহা দেখিলে কতকটা বুঝিতে পারিবে।

জাহাজ ডুবি

সমুদ্রে চলিতে চলিতে প্রতি বৎসরই কত জাহাজ ডুবিয়া মরে। কেহ মরে ঝড় তুফানে, কেহ মরে ঢেউয়ের ঝাপটায়, কেহ মরে পাহাড়ের গুঁতায়, আর কেহ মরে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া—যুদ্ধের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এই রকম কত উপায়ে জাহাজ মরিতেছে তাহার ঠিকানাই নাই। এই সকল জাহাজের মধ্যে কত সময় কত লাখলাখ টাকার জিনিষ থাকে, সেগুলি সমুদ্রের তলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে ইহা কি

মানুষের সহ্য হয় ? বিলাতে বড় বড় ব্যবসাদার কোম্পানি আছে, তাহারা ডোবা জাহাজ হইতে মাল উদ্ধার করে। এই কাজকে Salvage বলে। ইহাতে তাহারা এক এক সময় অনেক টাকা লাভ করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় থাকে না ; কিন্তু জল যদি খুব বেশী না হয়, তবে অনেক সময় একেবারে জাহাজকে-জাহাজ উঠাইয়া ফেলা যায়।

জাহাজ উঠাইবার নানা রকম উপায় আছে। এক উপায়, তাহার সঙ্গে বাতাস-পোরা বড় বড় বাক্স বাঁধিয়া তাহাকে হাল্কা করিয়া ভাসাইয়া তোলা। আর এক উপায় তাহার চারিদিকে দেয়াল ঘিরিয়া সেই দেয়ালের ভিতরকার সমুদ্রকে 'পাম্প্' দিয়া শুকাইয়া ফেলা। রুষজাপান যুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন পোর্ট আর্থার দখল করে তখন সেখানকার বন্দরে রুষেরা কতগুলা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। জাপানীরা দেয়াল তুলিয়া সমস্ত বন্দরের মুখ আঁটিয়া দেয় ; তারপর বড় বড় কল দিয়া বন্দরের জল সেঁচিয়া ফেলিতেই জাহাজগুলা বাহির হইয়া পড়িল। জাপানীয়া সেই জাহাজ আবার মেরামত করাইয়া কাজে লাগাইয়াছে।

একবার স্পেন হইতে কিছু দূরে একটা জাহাজ জখম হইয়া ডুবিতে আরম্ভ করে। জাহাজের কাপ্তান দেখিল স্পেন পর্য্যন্ত পৌছিবার আগেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। জাহাজের নীচেকার খোলে হাজার মণ লবণ বোঝাই রহিয়াছে—সকলে মিলিয়া সারাদিন লবণ ফেলিলেও তাহার কিছুই কম্‌তি হইবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন "জাহাজ ছাড়িতে হইবে, নৌকা নামাও"। এমন সময় এক Salvage Companyর জাহাজ আসিয়া হাজির—তাহারা আসিয়াই ব্যাপার দেখিয়া, জাহাজ ডুবিবার আগেই তাহা কিনিতে চাহিল। লবণ-জাহাজের কাপ্তান বলিল "মাঝসমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে, কিনিয়া লাভ কি" ? Salvage কাপ্তেন বলিল "জাহাজ ডুবিতে দিব না"। শুনিয়া লবণের কাপ্তেন হাসিয়া বলিল "আমি ত জাহাজ ছাড়িয়াই দিব—তুমি কিনিতে চাও আমার আপত্তি কি" ? জাহাজ কিনিয়াই নূতন কাপ্তেন তাহাতে জল বোঝাই করিতে লাগিল—পুরাতন নাবিকেরা বলিল, "আহা কর কি ? একেই জাহাজ ডুবিতেছে আবার জল চাপাইতেছ ? তুমি পাগল নাকি" ? কাপ্তেন কোন কথা না বলিয়া লবণের মধ্যে ক্রমাগতই জল ঢালিতে লাগিল। তার পর সমস্ত লবণ জলে গুলিয়া সেই লবণ-গোলা জলে পাম্প বসাইয়া হুড়্ হুড়্ করিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিল। জাহাজ হাল্কা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। পুরাতন কাপ্তেন ব্যাপার দেখিয়া আহাম্মক বনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

চোর ধরা

আরে, ছি ছি! রাম রাম! ব'লোনা হে ব'লোনা—
দেখেছি যে জুয়াচুরি নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে
ভয়ানক কমে যায় খাবারের ভাগেতে,
রোজ দেখি খেয়ে গেছে জানিনেক কারা সে—
কালকে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌ লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে-গজা গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙনি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ ক্ষেপে গেছি—কত আর পারব?
এত দিন স'য়ে স'য়ে, এইবারে মারব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁসিয়ার পাহারা
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।

রামু হও দামু হও ও পাড়ার ঘোষ বোস্
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্ ফোঁস্!
খাটবে না জারিজুরি আঁটবে না মারপ্যাঁচ,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।
রোজ বলি "সাবধান!" কাণে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝবিত এইবারে আয় না।

নূতন ধাঁধা

ঘৃণিত আকার তার সবে রাখ শুনে
লাঙুল খসিলে দেখি আঙুলেতে গুণে।
মাঝা ছেড়ে চাপে পড়ি চরণের তলে,
ডগা ফেলে ডাঙা হ'য়ে জেগে উঠি জলে।

ভ্রম সংশোধন

প্রথম কবিতাটির লেখকের নাম ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী—ভুলক্রমে "ধীরেন্দ্রনাথ" ছাপা হইয়াছে।

সন্দেশের মূল্য বৃদ্ধি

আগামী বৎসরের সন্দেশের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা স্থলে ১৸৵০ ধরা হইবে। আজকাল কাগজ কালী প্রভৃতি ছাপিবার সকল সরঞ্জামই এমন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, যে কিছু দাম না বাড়াইলে "সন্দেশ"কে সুন্দররূপে চালান সম্ভব হয় না। যেরূপ হইলে সন্দেশের সুনাম রক্ষা হয়, সন্দেশের লেখা ছাপা ও ছবি সেইরূপ করিবার জন্য আগামী বৎসর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।